পরিপূরক সূচীপত্র

গল্পগুচ্ছের অন্য তিন খণ্ডে যে গল্পগুলি আছে

প্রথম খণ্ডে

তৃতীয় খণ্ডে

চতুর্থ খণ্ডে

সূচীপত্র

বিন্যাসক্রমে

সূচীপত্র

বর্ণানুক্রমিক

গল্পগুচ্ছ

দ্বিতীয় খণ্ড

অনধিকার প্রবেশ

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর-এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবীবিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না, ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল, "পারিব", আর-একটি বালক বলিল, "কখনোই পারিবে না"।

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর-একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পত্নীর নিকটে এক দিনের জন্যও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিয়াছিল, কারণ, তর্ক এবং বাক্য সমস্তই তাঁহার পত্নীর অংশে পড়িয়াছিল, তিনি পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন-কি নীরবে, অতি বড়ো প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাসা প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্তমানে তাঁহাদের দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমাসরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোটো কথা বা নাকি কান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লীবাসী ভদ্রপুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি একপ্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বিপদে-সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে সকলের প্রধান-পদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমেরই মতো ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালোবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মতো অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোনো প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়োটির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়-বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় এক দিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নবদম্পতির নব প্রেমোদ্‌গমদৃশ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে, এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জন করিতে আরম্ভ করুক, তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কারণ, পূজক ঠাকুরের আর-একটি পূজার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল; তাহার নাম ছিল নিস্তারিণী। গোপনে ঘৃত দুগ্ধ ছানা ময়দার নৈবেদ্য স্বর্গে নরকে ভাগাভাগি হইয়া যাইত। কিন্তু আজকাল জয়কালীর শাসনে পূজার ষোলো-আনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে, উপদেবতাগণকে অন্যত্র জীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তক্‌তক্ করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। এক পার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্ক পত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্বে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক্ব কুক্কুটমাংস-লোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর-সর্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী, পত্নী, দাসী—ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী, পুত্র, তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন, যে বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভালো করিয়াই জানিত, তথাপি তাহার দুর্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রুতি আছে, বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল, নিম্ন-শাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চ শাখায় দুটি-একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্তি দেখিলেন, সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল, কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেইজন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরানীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে, বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্বার মালা হস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, "ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি।"

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্তী কুটিরের কক্ষ হইতে নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জনে পরিণত হইয়া উঠিল— অবশেষে অনেক ক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর-একটি জীবের ভীত কাতরধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের দূরবর্তী চীৎকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটি তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভূপর্যস্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন!"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন, অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোনোক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন, "নলিন!"

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টকপ্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ, যাহার বিকসিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে— বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল!

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে-উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধ দ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস নে।"

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতিক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ ১৩০১

মেঘ ও রৌদ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বদিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ম্লান রৌদ্র ও খণ্ড মেঘে মিলিয়া পরিপক্কপ্রায় আউশ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তুলি বুলাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তৃত শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়াপ্রলেপে গাঢ় স্নিগ্ধতায় অঙ্কিত হইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশরঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল তখন নিম্নে সংসাররঙ্গভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলিতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা যেখানে একটি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের পট উত্তোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটিমাত্র ঘর পাকা, এবং সেই ঘরের দুই পার্শ্ব দিয়া জীর্ণপ্রায় ইষ্টকের প্রাচীর গুটিকতক মাটির ঘর বেষ্টন করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জানলা দিয়া দেখা যাইতেছে, একটি যুবাপুরুষ খালি গায়ে তক্তপোষে বসিয়া বামহস্তে ক্ষণে ক্ষণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীষ্ম এবং মশক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণহস্তে বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গুটিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গরাদে-দেওয়া জানলার সম্মুখ দিয়া বারম্বার যাতায়াত করিতেছিল। মুখের ভাবে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল, ভিতরে যে মানুষটি তক্তপোষে বসিয়া বই পড়িতেছে তাহার সহিত বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে— এবং কোনোমতে সে তাহার মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইয়া যাইতে চাহে যে 'সম্প্রতি কালোজাম খাইতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহ্যমাত্র করি না'।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ঘরের ভিতরকার অধ্যয়নশীল পুরুষটি চক্ষে কম দেখেন, দূরে হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত সুতরাং অনেক ক্ষণ নিষ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্তে কালোজামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল। অন্ধের নিকটে অভিমানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এতই দুরূহ।

যখন ক্ষণে ক্ষণে দুই-চারিটা কঠিন আঁটি যেন দৈবক্রমে বিক্ষিপ্ত হইয়া কাঠের দরজার উপর ঠক্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত পুরুষটি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগুণ নিবিষ্টভাবে অঞ্চল হইতে দংশনযোগ্য সুপক্ক কালোজাম নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরুষটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ চেষ্টা-সহকারে নিরীক্ষণপূর্বক বালিকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানলার কাছে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে ডাকিল, "গিরিবালা!"

গিরিবালা অবিচলিত ভাবে নিজের অঞ্চলের মধ্যে জাম-পরীক্ষাকার্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মৃদুগমনে আপন-মনে এক-এক পা করিয়া চলিতে লাগিল।

তখন ক্ষীণদৃষ্টি যুবাপুরুষের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কোনো-একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ডবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "কই, আজ আমাকে জাম দিলে না?" গিরিবালা সে কথা কানে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগুলি গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং যুবাপুরুষের দৈনিক বরাদ্দ। কী জানি, সে কথা কিছুতেই আজ গিরিবালার স্মরণ হইল না, তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল যে এগুলি সে একমাত্র নিজের জন্যই আহরণ করিয়াছে। কিন্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া খাইবার কী অর্থ পরিষ্কার বুঝা গেল না। তখন পুরুষটি কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে সহসা অশ্রুজলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চঞ্চল রৌদ্র এবং চঞ্চল মেঘ বৈকালে শান্ত ও শ্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে ; শুভ্র স্ফীত মেঘ আকাশের প্রান্তভাগে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে এবং অপরাহ্নের অবসন্নপ্রায় আলোক গাছের পাতায়, পুষ্করিণীর জলে এবং বর্ষাস্নাত প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানলার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুবা পুরুষটি বসিয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে এবেলা বালিকার অঞ্চলে জাম নাই এবং যুবকের হস্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গুরুতর এবং নিগূঢ় প্রভেদও কিছু কিছু ছিল।

এবেলাও বালিকা কী বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ স্থানে আসিয়া ইতস্তত করিতেছে বলা কঠিন। আর যাহাই আবশ্যক থাক্‌, ঘরের ভিতরকার মানুষটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোনোমতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। বরঞ্চ বোধ হইল সে দেখিতে আসিয়াছে, সকালবেলায় যে জামগুলা ফেলিয়া গেছে বিকালবেলায় তাহার কোনোটার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে কি না।

কিন্তু অঙ্কুর না বাহির হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই ছিল যে, ফলগুলি সম্প্রতি যুবকের সম্মুখের তক্তপোষের উপর রাশীকৃত ছিল ; এবং বালিকা যখন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোনো একটা অনির্দেশ্য কাল্পনিক পদার্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল তখন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে একটি একটি জাম নির্বাচন করিয়া সযত্নে আহার করিতেছিল। অবশেষে যখন দুটো-একটা আঁটি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন-কি, পায়ের উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গিরিবালা বুঝিতে পারিল যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এই কি উচিত। যখন সে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর সমস্ত গর্ব বিসর্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খুঁজিতেছে তখন কি তাহার সেই অত্যন্ত দুরূহ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠুরতা নহে। ধরা দিতে আসিয়াছে, এই কথাটি ধরা পড়িয়া বালিকা যখন ক্রমশ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল তখন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকালবেলাকার মতো এবেলাও বালিকা আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার

বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু কাঁদিল না। বরঞ্চ রক্তবর্ণ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উৎপীড়নকারীর পৃষ্ঠদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমাত্র বাহ্য আকর্ষণে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে লৌহগরাদেবেষ্টিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল। ।

আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেমনি সামান্য, তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আবার আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে, কিন্তু খেলার মতো দেখিতে মাত্র, তেমনি এই দুটি অখ্যাতনামা মনুষ্যের একটি কর্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে। যে বৃদ্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীরমুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে সেই বৃদ্ধই বালিকার এই সকাল-বিকালের তুচ্ছ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখ-দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান বড়োই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। কেবল দর্শকের কাছে নহে, এই ক্ষুদ্র নাট্যের প্রধান পাত্র উক্ত যুবকের নিকটেও। এই বালিকা কেন যে একদিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ বাড়াইয়া দেয়, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক-একদিন যেন তাহার সমস্ত কল্পনা ভাবনা এবং নৈপুণ্য একত্র করিয়া যুবকের সন্তোষ-সাধনে প্রবৃত্ত হয়; আবার এক-একদিন তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি, তাহার সমস্ত কাঠিন্য একত্র সংহত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে। বেদনা দিতে না পারিলে তাহার কাঠিন্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে; কৃতকার্য হইলে সে কাঠিন্য অনুতাপের অশ্রুজলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই তুচ্ছ মেঘরৌদ্র-খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভূষণ আর গিরিবালা।

ইহাতে কাহারো ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠার কোনো বিষয় নাই। কারণ, গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্যবিকশিত এম. এ. বি. এল.। উভয়ে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এক কালে নিজগ্রামের পত্তনিদার ছিলেন। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগনায় তাঁহাদের বাস সেই পরগনারই নায়েবি, সুতরাং তাঁহাকে জন্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভূষণ এম. এ. পাস করিয়া আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোনো কর্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা, সেও

তাহার দ্বারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতায় জনসমুদ্রের মধ্যে আপন-মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পল্লী-গ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্ধার মতো দেখিতে হয়। শশিভূষণের বাপ যখন বিস্তর চেষ্টায় পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকর্মণ্য পুত্রটিকে পল্লীতে তাঁহাদের সামান্য বিষয়রক্ষাকার্যে নিয়োগ করিলেন তখন শশিভূষণকে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে বিস্তর উৎপীড়ন উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরও একটা কারণ ছিল ; শান্তিপ্রিয় শশিভূষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দুঃসহ অহংকার জ্ঞান করিয়া কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর যতই উপদ্রব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোষের উপর কতকগুলি বাঁধানো ইংরাজি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন ; যখন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই তো ছিল তাঁর কাজ— বিষয় কী করিয়া রক্ষা হইত তাহা বিষয়ই জানে।

এবং পূর্বেই আভাসে বলা গিয়াছে, মানুষের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা ইস্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মূঢ় ভগ্নীটিকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিত, পৃথিবীর আকার কিরূপ ; কোনোদিন বা প্রশ্ন করিত, সূর্য বড়ো না পৃথিবী বড়ো—সে যখন ভুল বলিত তখন তাহার প্রতি বিপুল অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রম সংশোধন করিত। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত তবে তাহার ভাইরা তাহাকে দ্বিগুণ উপেক্ষাভরে কহিত, "ইস্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শুনিয়া গিরিবালা সম্পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া যাইত, দ্বিতীয় আর-কোনো প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যক বোধ হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড়ো ইচ্ছা করিত, সেও দাদাদের মতো বই লইয়া পড়ে। কোনো-কোনোদিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোনো-একটা বই খুলিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া পড়ার ভাণ করিত এবং অনর্গল পাতা উল্টাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোটো ছোটো অপরিচিত অক্ষরগুলি কী যেন এক মহারহস্যশালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোনো প্রশ্নের কোনোই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল অশ্ব গর্দভের একটি কথাও কৌতূহলকাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মতো নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালা তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথায় কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্জরী যেমন দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ছিল শশিভূষণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইরূপ ছিল। লোহার গরাদে-দেওয়া রাস্তার ধারের

ছোটো বসিবার ঘরটিতে যুবক একাকী তক্তপোষের উপর পুস্তকে পরিবৃত হইয়া বসিয়া থাকিত। গিরিবালা গরাদে ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া এই নতপৃষ্ঠ পাঠনিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে স্থির করিত, শশিভূষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশি বিদ্বান। তদপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। কথামালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তকগুলি শশিভূষণ যে নিঃশেষপূর্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। এইজন্য, শশিভূষণ যখন পুস্তকের পাত উল্টাইত সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অবধি নির্ণয় করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিস্ময়মগ্ন বালিকাটি ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শশিভূষণ একদিন একটা ঝক্‌ঝকে বাঁধানো বই খুলিয়া বলিল, "গিরিবালা, ছবি দেখবি আয়।" গিরিবালা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সে পুনর্বার ডুরে কাপড় পরিয়া সেই গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইরূপ গম্ভীর মৌন মনোযোগের সহিত শশিভূষণের অধ্যয়নকার্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। শশিভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেণী দুলাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

এইরূপে তাহাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে কখন ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভূষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তক্তপোষের উপর বাঁধানো পুস্তকস্তূপের মধ্যে স্থান পাইল, ঠিক সে তারিখটা নির্ণয় করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গবেষণার আবশ্যক।

শশিভূষণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চা আরম্ভ হইল। শুনিয়া সকলে হাসিবেন, এই মাস্টারটি তাহার ক্ষুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে—অনেক বড়ো বড়ো কাব্য তর্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কী বুঝিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্যহৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে মাঝে এক-একটা অত্যন্ত অসংগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখনো কখনো অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো কিছু বাধা দিত না—বড়ো বড়ো কাব্য সম্বন্ধে এই অতিক্ষুদ্র সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত পল্লীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার একমাত্র সমজদার বন্ধু।

গিরিবালার সহিত শশিভূষণের প্রথম পরিচয় যখন, তখন গিরির বয়স আট ছিল, এখন তাহার বয়স দশ হইয়াছে। এই দুই বৎসরে সে ইংরাজি ও বাংলা বর্ণমালা শিখিয়া দুই-চারিটা সহজ বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। এবং শশিভূষণের পক্ষেও পল্লীগ্রাম এই দুই বৎসর নিতান্ত সঙ্গীবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিন্তু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভূষণের ভালোরূপ বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম.এ. বি.এলের নিকট মকদ্দমা মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত। এম.এ. বি.এল. তাহাতে বড়ো-একটা মনোযোগ করিত না এবং আইনবিদ্যা সম্বন্ধে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমনভাবে বছর দুয়েক কাটিল।

সম্প্রতি একটা অবাধ্য প্রজাকে শাসন করা আবশ্যক হইয়াছে। নায়েব মহাশয় তাহার নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবিতে নালিশ রুজু করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামর্শের জন্য শশিভূষণকে কিছু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শশিভূষণ পরামর্শ দেওয়া দূরে থাক্, শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে হরকুমারকে এমন গুটিদুইচারি কথা বলিলেন যাহা তাঁহার কিছুমাত্র মিষ্ট বোধ হইল না।

এ দিকে আবার প্রজার নামে একটি মকদ্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল, শশিভূষণ উক্ত হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল ; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভূষণ দেখিলেন, তাঁহার খেতের মধ্যে গোরু প্রবেশ করে, তাঁহার কলাইয়ের খোলায় আগুন লাগিয়া যায়, তাঁহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাঁহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উল্‌টিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মকদ্দমা আনিবার উপক্রম করে— এমন-কি সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাঁহাকে মারিবে এবং রাত্রে তাঁহার বসতবাটীতে আগুন লাগাইয়া দিবে, এমন সকল জনশ্রুতিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহপ্রকৃতি শশিভূষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পলাইবার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জয়েন্ট্‌ ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের তাঁবু পড়িল। বরকন্দাজ কন্‌স্টেবল খানসামা কুকুর ঘোড়া সহিস মেথরে সমস্ত গ্রাম চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছেলের দল ব্যাঘ্রের অনুবর্তী শৃগালের পালের ন্যায় সাহেবের আড্ডার নিকটে শঙ্কিত কৌতূহল-সহকারে ঘুরিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য-শিরে খরচ লিখিয়া সাহেবের মুর্গি আণ্ডা ঘৃত দুগ্ধ জোগাইতে লাগিলেন। জয়েন্ট্‌-সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক নায়েব মহাশয় তদপেক্ষা অনেক বেশি অক্ষুণ্ণচিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুকুরের জন্য একেবারে চার সের ঘৃত আদেশ করিয়া বসিল তখন দুর্গ্রহবশত সেটা তাঁহার সহ্য হইল না— মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুত্তা যদিচ দেশি কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হজম করিতে পারে তথাপি এতাধিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেথর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জন্য মাংস কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ইহাই সে নায়েবের নিকট সন্ধান লইতে গিয়াছিল, কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিয়া নায়েব অবজ্ঞাপূর্বক তাহাকে সর্বলোকসমক্ষে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এমন-কি, সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

একে ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সাহেব-লোকের সহজেই অসহ্য বোধ হয়, তাহার উপর তাঁহার মেথরকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে, ইহাতে ধৈর্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চাপরাসিকে আদেশ করিলেন, "বোলাও নায়েবকো।"

নায়েব কম্পান্বিতকলেবরে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্বুর সম্মুখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্বু হইতে মচ্‌মচ্‌ শব্দে বাহির হইয়া আসিয়া নায়েবকে উচ্চকণ্ঠে বিজাতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টুমি কী কারণ-বশটো আমার মেঠরকে ডুর করিয়াছে?"

হরকুমার শশব্যস্ত হইয়া করজোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেথরকে দূর করিতে পারেন এমন স্পর্ধা কখনোই তাঁহার সম্ভবে না; তবে কিনা কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুষ্পদের মঙ্গলার্থে মৃদুভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে পাঠানো হইয়াছে এবং কোথায় পাঠানো হইয়াছে।

হরকুমার তৎক্ষণাৎ যেমন মুখে আসিল নাম করিয়া দিলেন। সেই সেই -নামীয় লোকগণ সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সন্ধান করিতে অতি সত্বর লোক পাঠাইয়া দিয়া সাহেব নায়েবকে তাম্বুতে বসাইয়া রাখিলেন।

দূতগণ অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল, ঘৃত সংগ্রহের জন্য কেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং মেথর যে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সন্দেহ রহিল না। তখন জয়েন্ট্‌-সাহেব ক্রোধে গর্জন করিয়া মেথরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারি ধারে ঘোড়দৌড় করাও।" মেথর আর কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্দিকে লোকারণ্যের মধ্যে সাহেবের আদেশ পালন করিল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, হরকুমার গৃহে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুবৎ পড়িয়া রহিলেন।

জমিদারি কার্য উপলক্ষে নায়েবের শত্রু বিস্তর ছিল; তাহারা এই ঘটনায় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল, কিন্তু কলিকাতায় গমনোদ্যত শশিভূষণ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তাঁহার সর্বাঙ্গের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, "সাহেবের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লড়িব।"

স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের নামে মকদ্দমা আনিতে হইবে শুনিয়া হরকুমার প্রথমটা ভীত হইয়া উঠিলেন; শশিভূষণ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কথাটা চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়াছে এবং শত্রুগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শশিভূষণের শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন, "বাপু, শুনিলাম তুমি অকারণে কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছ, সে তো কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার

মতো একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহস কত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত নির্জনতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন তিনি আজ আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নালিশ শুনিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, "শশীবাবু, এ মকদ্দমাটা গোপনে মিটমাট করিয়া ফেলিলে ভালো হয় না কি।"

শশীবাবু টেবিলের উপরিস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর তাঁহার কুঞ্চিতভ্রূ ক্ষীণ দৃষ্টি অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া কহিলেন, "আমার মক্কেলকে আমি এরূপ পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিটমাট হইবে কী করিয়া।"

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া বুঝিলেন, এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে, কহিলেন, "অল্‌রাইট্‌ বাবু, দেখা যাউক কত দূর কী হয়।"

এই বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব মকদ্দমার দিন ফিরাইয়া দিয়া মফস্বলভ্রমণে বাহির হইলেন।

এ দিকে জয়েন্ট্‌-সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, "তোমার নায়েব আমার ভৃত্যদিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি, তুমি ইহার সমুচিত প্রতিকার করিবে।"

জমিদার শশব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। জমিদার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "সাহেবের মেথর যখন চারি সের ঘি চাহিল তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না। তোমার কি বাপের কড়ি লাগিত।"

হরকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতি হইত না। অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, "আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল।"

জমিদার কহিলেন, "তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল।"

হরকুমার কহিলেন, "ধর্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। ঐ আমাদের গ্রামের শশী, তাহার কোথাও কোনো মকদ্দমা জোটে না, সে ছোঁড়া নিতান্ত জোর করিয়া প্রায় আমার সম্মতি না লইয়াই এই হাঙ্গামা বাধাইয়া বসিয়াছে।"

শুনিয়া জমিদার শশিভূষণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, লোকটা অপদার্থ নব্য উকিল, কোনো ছুতায় একটা হুজুক তুলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত হইবার চেষ্টায় আছে। নায়েবকে হুকুম করিয়া দিলেন, মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া যেন অবিলম্বে ছোটো বড়ো ম্যাজিস্ট্রেট যুগলকে ঠাণ্ডা করা হয়।

নায়েব সাহেবের জন্য কিঞ্চিৎ ফলমূল শীতলভোগ উপহার লইয়া জয়েন্ট্ ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায় গিয়া হাজির হইলেন। সাহেবকে জানাইলেন, সাহেবের নামে মকদ্দমা করা তাঁহার আদৌ স্বভাববিরুদ্ধ; কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজাতশ্মশ্রু অপোগণ্ড অর্বাচীন উকিল তাঁহাকে একপ্রকার না জানাইয়া এইরূপ স্পর্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং নায়েবের প্রতি বড়ো সন্তুষ্ট হইলেন, রাগের মাথায় নায়েববাবুকে 'ডণ্ডাবিঢান' করিয়া তিনি 'ডুঃখিট্' আছেন। সাহেব বাংলা ভাষার পরীক্ষায় সম্প্রতি পুরস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধুভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা-বাপ কখনো বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিয়া থাকেন, কখনো বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সন্তানের বা মা-বাপের দুঃখের কোনো কারণ নাই।

অতঃপর জয়েন্ট-সাহেবের ভৃত্যবর্গকে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিয়া হরকুমার মফস্বলে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার মুখে শশিভূষণের স্পর্ধার কথা শুনিয়া কহিলেন, "আমিও আশ্চর্য হইতেছিলাম যে, নায়েববাবুকে বরাবর ভালো লোক বলিয়াই জানিতাম, তিনি যে সর্বাগ্রে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিটমাট না করিয়া হঠাৎ মকদ্দমা আনিবেন, এ কী অসম্ভব ব্যাপার। এখন সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি।"

অবশেষে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শশী কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছে কি না। নায়েব অম্লানমুখে বলিলেন, হাঁ।

সাহেব তাঁহার সাহেবি বুদ্ধিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এ সমস্তই কন্‌গ্রেসের চাল। একটা পাকচক্র বাধাইয়া অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্মেণ্টের সহিত খিটিমিটি করিবার জন্য কন্‌গ্রেসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেলাগণ লুক্কায়িতভাবে চতুর্দিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই-সকল ক্ষুদ্র কণ্টকগণকে একদমে দলন করিয়া ফেলিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টকে অত্যন্ত দুর্বল গবর্মেণ্ট বলিয়া মনে মনে ধিক্কার দিলেন। কিন্তু কন্‌গ্রেসওয়ালা শশিভূষণের নাম ম্যাজিস্ট্রেটের মনে রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংসারে বড়ো বড়ো ব্যাপারগুলি যখন প্রবলভাবে গজাইয়া উঠিতে থাকে তখন ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলিও ক্ষুধিত ক্ষুদ্র শিকড়জাল লইয়া জগতের উপর আপন দাবি বিস্তার করিতে ছাড়ে না।

শশিভূষণ যখন এই ম্যাজিস্ট্রেটের হাঙ্গামা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত, যখন বিস্তৃত পুঁথিপত্র হইতে আইন উদ্ধার করিতেছেন, মনে মনে বক্তৃতায় শাণ দিতেছেন, কল্পনায় সাক্ষীকে জেরা করিতে বসিয়া গিয়াছেন ও প্রকাশ্য আদালতের লোকারণ্যদৃশ্য এবং যুদ্ধপর্বের ভাবী পর্বাধ্যায়গুলি মনে আনিয়া ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত ও ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র ছাত্রীটি তাহার ছিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা, বাগান হইতে কখনো ফুল, কখনো ফল, মাতৃভাণ্ডার হইতে কোনোদিন

আচার, কোনোদিন নারিকেলের মিষ্টান্ন, কোনোদিন পাতায়-মোড়া কেতকীকেশরসুগন্ধি গৃহনির্মিত খয়ের আনিয়া নিয়মিত সময়ে তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনকতক দেখিল, শশিভূষণ একখানা চিত্রহীন প্রকাণ্ড কঠোরমূর্তি গ্রন্থ খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বোধ হইল না। অন্য সময়ে শশিভূষণ যে-সকল গ্রন্থ পড়িতেন তাহার মধ্য হইতে কোনো না কোনো অংশ গিরিবালাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ঐ স্থূলকায় কালো মলাটের পুস্তক হইতে গিরিবালাকে শুনাইবার যোগ্য কি দুটো কথাও ছিল না। তা না থাক্, তাই বলিয়া ঐ বইখানি কি এতই বড়ো আর গিরিবালা কি এতই ছোটো।

প্রথমটা, গুরুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গিরিবালা সুর করিয়া, বানান করিয়া, বেণী-সমেত দেহের উত্তরার্ধ সবেগে দুলাইতে দুলাইতে উচ্চৈঃস্বরে আপনিই পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ওটাকে একটা কুৎসিত কঠোর নিষ্ঠুর মানুষের মতো করিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বলিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দুর্বোধ পাতা দুষ্ট মানুষের মুখের মতো আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোনো চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইত তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃভাণ্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া পুরস্কার দিতে পারিত। সেই বইখানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেবতার নিকট যে-সকল অসংগত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শুনেন নাই এবং পাঠকদিগকেও শুনাইবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

তখন ব্যথিতহৃদয় বালিকা দুই-একদিন চারুপাঠ হস্তে গুরুগৃহে গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দুই-একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভূষণের গৃহসম্মুখবর্তী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল, শশিভূষণ সেই কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগুলার প্রতি বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন করিয়া গলাইবেন এই লোহাগুলার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে-অনভিজ্ঞ গ্রন্থবিহারী শশিভূষণের ধারণা ছিল যে, পুরাকালে ডিমস্থিনীস সিসিরো বার্ক্ শেরিডন প্রভৃতি বাগ্মীগণ বাক্যবলে যে-সকল অসামান্য কার্য করিয়া গিয়াছেন—যেরূপ শব্দভেদী শর-বর্ষণে অন্যায়কে ছিন্নভিন্ন, অত্যাচারকে লাঞ্ছিত এবং অহংকারকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছেন, আজিকার দোকানদারির দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভুত্বমদগর্বিত উদ্ধত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগৎসমক্ষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিবেন, তিলকুচি গ্রামের জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে দাঁড়াইয়া শশিভূষণ তাহারই চর্চা করিতেছিলেন। আকাশের দেবতারা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন কি তাঁহাদের দেবচক্ষু অশ্রুসিক্ত হইতেছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সুতরাং সেদিন গিরিবালা তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না; সেদিন বালিকার অঞ্চলে জাম ছিল না; পূর্বে একবার জামের আঁটি ধরা পড়িয়া অবধি ঐ ফল সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সংকুচিত ছিল। এমন-কি, শশিভূষণ যদি কোনোদিন নিরীহ ভাবে জিজ্ঞাসা করিত, "গিরি, আজ জাম নেই?" সে সেটাকে গূঢ় উপহাস জ্ঞান করিয়া সঙ্কোচে

"যাঃও" বলিয়া তর্জন করিয়া পলায়নের উপক্রম করিত। জামের আঁটির অভাবে আজ তাহাকে একটা কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। সহসা দূরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "স্বর্ণ ভাই, তুই যাস্‌ নে, আমি এখনি যাচ্ছি।"

পুরুষ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, কথাটা স্বর্ণলতা-নামক কোনো দূরবর্তিনী সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত, কিন্তু পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন দূরে কেহই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট। কিন্তু হায়, অন্ধ পুরুষের প্রতি সে লক্ষ ভ্রষ্ট হইয়া গেল। শশিভূষণ যে শুনিতে পান নাই তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎসুক— এবং সেদিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাঁহার অধ্যবসায় ছিল না, কারণ তিনিও সেদিন কোনো কোনো হৃদয়ের দিকে লক্ষ টিক করিয়া তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষুদ্র হস্তের সামান্য লক্ষ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাঁহার শিক্ষিত হস্তের মহৎ লক্ষ্যও সেইরূপ ব্যর্থ হইয়াছিল, পাঠকেরা সে সংবাদ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন।

জামের আঁটির একটা গুণ এই যে, একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা যায়, চারিটি নিষ্ফল হইলে অন্তত পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিন্তু স্বর্ণ হাজার কাল্পনিক হউক, তাহাকে "এখনি যাচ্ছি" আশা দিয়া অধিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। থাকিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ জন্মিতে পারে। সুতরাং সে উপায়টি যখন নিষ্ফল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, স্বর্ণনাম্নী কোনো দূরস্থিত সহচরীর সঙ্গ লাভ করিবার অভিলাষ আন্তরিক হইলে যেরূপ সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত, গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পৃষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না; যখন নিশ্চয় বুঝিল কেহ আসিতেছে না তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভগ্নাংশটুকু লইয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র আশাটুকু এবং শিথিলপত্র চারু-পাঠখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভূষণ তাহাকে যে বিদ্যাটুকু দিয়াছে সেটুকু যদি সে কোনোমতে ফিরাইয়া দিতে পারিত তবে বোধ হয় পরিত্যাজ্য জামের আঁটির মতো সে-সমস্তই শশিভূষণের দ্বারের সম্মুখে সশব্দে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল, দ্বিতীয়বার শশিভূষণের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই সে সমস্ত পড়াশুনা ভুলিয়া যাইবে, তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনোটিরই উত্তর দিতে পারিবে না! একটি—একটি—একটিরও না! তখন! তখন শশিভূষণ অত্যন্ত জব্দ হইবে।

গিরিবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। পড়া ভুলিয়া গেলে শশিভূষণের যে কিরূপ তীব্র অনুতাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিয়া সে পীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল, এবং কেবলমাত্র শশিভূষণের দোষে বিস্মৃতশিক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষ্যৎ গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি করুণরস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিয়া থাকে। গিরিবালা পথের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া

কাঁদিতে লাগিল; এমন অকারণ কান্না প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে। উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের আইন-সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতাচর্চা কী কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মকদ্দমা অকস্মাৎ মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞ্চে অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। একখানা মলিন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগড়ি পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেবদিগকে নিয়মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভূষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফলিতে আরম্ভ করিল, সে একটি অন্ধকার কোণে নির্বাসিত হইয়া অনাদৃত বিস্মৃত-ভাবে ধূলিস্তরসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বালিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়।

শশিভূষণ যেদিন প্রথম আইনের গ্রন্থ বন্ধ করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন, গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে কয়দিনের ইতিহাস অল্পে অল্পে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল, একদিন উজ্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আর্দ্র বকুলফুল আনিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াও যখন তিনি গ্রন্থ হইতে দৃষ্টি তুলিলেন না তখন তাহার উচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিদ্ধ একটা সূঁচসুতা বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল— মালা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গাঁথিল, অনেক বিলম্বে শেষ হইল, বেলা হইয়া আসিল, গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশি-ভূষণের পড়া শেষ হইল না। গিরিবালা মালাটা তক্তপোষের উপর রাখিয়া ম্লানভাবে চলিয়া গেল। মনে পড়িল, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল; কবে হইতে সে তাঁহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মুখবর্তী পথে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত; অবশেষে কবে হইতে বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে, সেও তো আজ কিছুদিন হইল। গিরিবালার অভিমান তো এতদিন স্থায়ী হয় না। শশিভূষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতবুদ্ধি হতকর্মের মতো দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে তাঁহার পাঠ্যগ্রন্থগুলি নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই-চারি পাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লিখিতে লিখিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিতে পথের দিকে দ্বারের অভিমুখে প্রতীক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং লেখা ভঙ্গ হয়।

শশিভূষণের আশঙ্কা হইল, গিরিবালার অসুখ হইয়া থাকিবে। গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন, সে আশঙ্কা অমূলক। গিরিবালা আজকাল আর ঘর হইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পাত্র স্থির হইয়াছে।

গিরি যেদিন চারুপাঠের ছিন্নখণ্ডে গ্রামের পঙ্কিল পথ বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহার পরদিন প্রত্যুষে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া হরকুমার

ভোরবেলা হইতে বাহিরে বসিয়া গা খুলিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস।" গিরি কহিল, "শশিদাদার বাড়ি।" হরকুমার ধমক দিয়া কহিলেন, "শশিদাদার বাড়ি যেতে হবে না, ঘরে যা!" এই বলিয়া আসন্নশ্বশুরগৃহবাস বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার লজ্জার অভাব সম্বন্ধে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। সেই দিন হইতে তাহার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছে। এবার আর তাহার অভিমান ভঙ্গ করিবার অবসর জুটিল না। আমসত্ত্ব কেয়াখয়ের এবং জারক নেবু ভাণ্ডারের যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া উঠিল এবং শাখাস্খলিত পক্ষীচঞ্চুক্ষত সুপক্ব কালোজামে তরুতল প্রতিদিন সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। হায়, সেই ছিন্নপ্রায় চারুপাঠখানিও আর নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যেদিন সানাই বাজিতেছিল সেদিন অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশীকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, শশী তাঁহাকে নিশ্চয় ঘৃণা করিতেছে। শশীর মুখে চোখে ব্যবহারে তিনি তাহার সহস্র কাল্পনিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকই তাঁহার অপমানবৃত্তান্ত ক্রমশ বিস্মৃত হইতেছে, কেবল শশিভূষণ একাকী সেই দুঃস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে মনে করিয়া তিনি তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে একটুখানি সলজ্জ সংকোচ এবং সেই সঙ্গে প্রবল আক্রোশের সঞ্চার হইত। শশীকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভূষণের মতো লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দুরূহ নহে। নায়েব মহাশয়ের অভিপ্রায় অনতিবিলম্বে সফল হইল। একদিন সকালবেলা পুস্তকের বোঝা এবং গুটিদুইচার টিনের বাক্স সঙ্গে লইয়া শশী নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিত তাঁহার যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারোহ সহকারে ছিন্ন হইতেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দৃঢ়ভাবে তাঁহার হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল তাহা তিনি পূর্বে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। আজ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের বৃক্ষচূড়াগুলি অস্পষ্ট এবং উৎসবের বাদ্যধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অশ্রুবাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল, রক্তোচ্ছ্বাসবেগে কপালের শিরাগুলা টন্ টন্ করিতে লাগিল এবং জগৎসংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়া-নির্মিত মায়ামরীচিকার মতো অত্যন্ত অস্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

প্রতিকূল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেইজন্য স্রোত অনুকূল হইলেও নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল যাহাতে শশিভূষণের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

স্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্যন্ত একটি নূতন স্টিমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে। সেই স্টিমারটি সশব্দে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ঢেউ তুলিয়া উজানে আসিতে-ছিল। জাহাজে নূতন লাইনের অল্পবয়স্ক ম্যানেজার-সাহেব এবং অল্পসংখ্যক যাত্রী

ছিল। যাত্রীদের মধ্যে শশিভূষণের গ্রাম হইতে কেহ কেহ উঠিয়াছিল।

একটি মহাজনের নৌকা কিছু দূর হইতে এই স্টিমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরি-ধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমশ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম পালের উপর দ্বিতীয় পাল এবং দ্বিতীয় পালের উপরে ক্ষুদ্র তৃতীয় পালটা পর্যন্ত তুলিয়া দিল। বাতাসের বেগে সুদীর্ঘ মাস্তুল সম্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীর্ণ তরঙ্গরাশি অট্টকলস্বরে নৌকার দুই পার্শ্বে উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা তখন ছিন্নবল্গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। এক স্থানে স্টিমারের পথ কিঞ্চিৎ বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিপ্ততর পথ অবলম্বন করিয়া নৌকা স্টিমারকে ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজার-সাহেব আগ্রহের ভরে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার পূর্ণতম বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্টিমারকে হাত-দুয়েক ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন সময় সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মুহূর্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, স্টিমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজনন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙালি হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়তো দিশি পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়তো একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলির দ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয়তো এই গর্বিত নৌকাটার বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে গুটিকয়েক ফুটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকালীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাস্যরস আছে; নিশ্চয় জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একটুখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকতা-টুকু করার দরুন সে কোনোরূপ শাস্তির দায়িক নহে—এবং ধারণা ছিল, যাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবত প্রাণসংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দুক তুলিয়া গুলি করিল এবং নৌকা ডুবিয়া গেল তখন শশিভূষণের পান্সি ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপারটি শশিভূষণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নৌকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মাল্লাদিগকে উদ্ধার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া রন্ধনের জন্য মশলা পিষিতেছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। বর্ষার নদী খরবেগে বহিয়া চলিল।

শশিভূষণের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল। আইন অত্যন্ত মন্দগতি—সে একটা বৃহৎ জটিল লৌহযন্ত্রের মতো, তৌল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্বিকারভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানবহৃদয়ের উত্তাপ নাই। কিন্তু ক্ষুধার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও রোষের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভূষণের নিকট সমান অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে যাহা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তে তাহার শাস্তি বিধান না করিলে অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষ যেন অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে দগ্ধ করিতে থাকেন। তখন আইনের কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হৃদয় লজ্জা বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভূষণের নিকট হইতে দূরে লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর কী উপকার হইয়াছিল বলিতে

পারি না কিন্তু সে যাত্রায় নিঃসন্দেহ শশিভূষণের ভারতবর্ষীয় প্লীহা রক্ষা পাইয়াছিল।

মাঝিমাল্লা যাহারা বাঁচিল তাহাদিগকে লইয়া শশী গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। নৌকায় পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উদ্ধারের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং মাঝিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে পুলিসে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বলিল, "নৌকা তো মজিয়াছে, এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না।" প্রথমত, পুলিসকে দর্শনি দিতে হইবে; তাহার পর কাজকর্ম আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে ঘুরিতে হইবে; তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কী বিপাকে পড়িতে হইবে ও কী ফললাভ হইবে তাহা ভগবান জানেন। অবশেষে সে যখন জানিল, শশিভূষণ নিজে উকিল, আদালতখরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকদ্দমায় ভবিষ্যতে খেসারত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল। কিন্তু শশিভূষণের গ্রামের লোক যাহারা স্টিমারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে চাহিল না। তাহারা শশিভূষণকে কহিল, "মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই; আমরা জাহাজের পশ্চাৎ-ভাগে ছিলাম, কলের ঘট্ ঘট্ এবং জলের কল্ কল্ শব্দে সেখান হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।"

দেশের লোককে আন্তরিক ধিক্কার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা চালাইলেন।

সাক্ষীর কোনো আবশ্যক হইল না। ম্যানেজার স্বীকার করিল যে, সে বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। কহিল, আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতেছিল, তাহাদেরই প্রতি লক্ষ করা হইয়াছিল। স্টিমার তখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল এবং সেই মুহূর্তেই নদীর বাঁকের অন্তরালে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক মরিল, কি নৌকাটা ডুবিল। অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে এত শিকারের জিনিস আছে যে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক 'ডার্টি র‍্যাগ' অর্থাৎ মলিন বস্ত্রখণ্ডের উপর সিকিপয়সা দামেরও ছিটাগুলি অপব্যয় করিতে পারে না।

বেকসুর খালাস পাইয়া ম্যানেজার-সাহেব চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ক্লাবে হুইস্‌ট্ খেলিতে গেল, যে লোকটা নৌকার মধ্যে মশলা পিষিতেছিল নয় মাইল তফাতে তাহার মৃতদেহ ডাঙায় আসিয়া লাগিল এবং শশিভূষণ চিত্তদাহ লইয়া আপন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

যেদিন ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন নৌকা সাজাইয়া গিরিবালাকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই তথাপি শশিভূষণ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল, সেখানে না গিয়া কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে কোনোমতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না যে তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৌকা ক্রমশ দূরে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিক্

ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আম্রশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়ানৌকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশুরালয়যাত্রার আলোচনা তুলিল, শশিভূষণ চশমা খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন! "শশীদাদা!"— কোথায় রে কোথায়। কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না—তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ পুনরায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় কোনো কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নাই; সেইজন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তখন পূর্ণবর্ষায় বাংলাদেশের চারি দিকেই ছোটো বড়ো আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা-উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া, তরুলতা তৃণগুল্মে ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশ দিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণের নৌকা সেই-সমস্ত সংকীর্ণ বক্র জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেবকন্যারা যেন বাংলাদেশের তরুমূলবর্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতি-বিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গোরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কিল সংকীর্ণ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণনেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাংলাদেশ আপনার কর্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূকবিষণ্ণমুখে সেইরূপ পীড়িতভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষিরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে; স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সংকুচিত হইয়া কুটির হইতে কুটিরান্তরে গৃহকার্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া, জুতা হস্তে, ছাতি মাথায়, বাহির হইতেছে—অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি যখন কিছুতেই থামে না তখন রুদ্ধ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ পুনশ্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক জায়গায় একটা প্রশস্ত

মোহানার মতো জায়গায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—সে কেবল খানার দোষে নয়, খোঁড়ার পা'টারও পড়িবার দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ সেদিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহানার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল এক পার্শ্বে নৌকা-চলাচলের স্থান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য করিয়া থাকে এবং সেজন্য খাজনাও দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বৎসর এই পথে হঠাৎ জেলার পুলিস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট্‌বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে। তাঁহার বোট আসিতে দেখিয়া জেলেরা পূর্ব হইতে পার্শ্ববর্তী পথ নির্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মনুষ্যরচিত কোনো বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘুরিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে.এবং চেষ্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল।

পুলিস-সাহেব অত্যন্ত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মূর্তি দেখিয়াই জেলে চারটে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মাল্লাদিগকে জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত-আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

জালের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কন্‌স্টেবল পলাতক জেলে চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারিজনকে হাতের কাছে পাইল তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া জোড়-হস্তে কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল। পুলিস-বাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন সময় চশমা-পরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চট্‌ চট্‌ করিতে করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পুলিসের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "সার, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোনো অধিকার নাই।"

পুলিসের বড়ো কর্তা তাঁহাকে হিন্দিভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মুহূর্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপর আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কী হইল তিনি তাহা জানেন না। পুলিসের থানার মধ্যে যখন জাগিয়া উঠিলেন তখন, বলিতে সংকোচ বোধ হয়, যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের বাপ উকিল ব্যারিস্টার লাগাইয়া প্রথমত শশীকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকদ্দমার জোগাড় চলিতে লাগিল।

যে-সকল জেলের জাল নষ্ট হইয়াছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগনার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কখনো কখনো শশীর নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতেও আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশী তাহাদিগকে সাক্ষী মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয় পুলিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে। যাহা লোকসান হইবার তাহা তো হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষীর সপিনা ধরাইয়া এ কী মুশকিল। সকলে বলিল, "ঠাকুর, তুমি তো আমাদিগকে বিষম ফ্যাসাদে ফেলিলে!"

বিস্তর বলা-কহার পর তাহারা সত্যকথা বলিতে স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার যেদিন বেঞ্চে কর্মোপলক্ষে জেলার সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন পুলিস-সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "নায়েববাবু, শুনিতেছি তোমার প্রজারা পুলিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।"

নায়েব সচকিত হইয়া কহিলেন, "হাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়। অপবিত্রজন্তু-জাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা!"

সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত আছেন, মকদ্দমায় শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টিঁকিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, পুলিস-সাহেব তাহাদের জাল কাটিয়া দেন নাই, বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দেশস্থ গুটিচারেক পরিচিত লোক সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা সে সময়ে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরযাত্র উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। শশিভূষণ যে অকারণে অগ্রসর হইয়া পুলিসের পাহারাওয়ালাদের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে, তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে।

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন যে, গালি খাইয়া বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিয়াছেন। কিন্তু জাল কাটিয়া দেওয়া ও জেলেদের প্রতি উপদ্রবই তাহার মূল কারণ।

এরূপ অবস্থায় যে বিচারে শশিভূষণ শাস্তি পাইলেন, তাহাকে অন্যায় বলা যাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছু গুরুতর হইল। তিন-চারিটা অভিযোগ— আঘাত, অনধিকার প্রবেশ, পুলিসের কর্তব্যে ব্যাঘাত ইত্যাদি সব ক'টাই তাঁহার বিরুদ্ধে পুরা প্রমাণ হইল।

শশিভূষণ তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহার প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থগুলি ফেলিয়া পাঁচ বৎসর জেল খাটিতে গেলেন। তাঁহার বাপ আপিল করিতে উদ্যত হইলে শশিভূষণ বারম্বার নিষেধ করিলেন; কহিলেন, "জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে

না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর, যদি সৎসঙ্গের কথা বল তো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত— বাহিরে অনেক বেশি।"

দশম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ জেলে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার আর বড়ো কেহ ছিল না। এক ভাই বহুকাল হইতে সেন্‌ট্রাল প্রভিন্সে কাজ করিতেন, দেশে আসা তাঁহার বড়ো ঘটিয়া উঠিত না, সেইখানেই তিনি বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সপরিবারে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিলেন। দেশে বিষয়সম্পত্তি যাহা ছিল নায়েব হরকুমার তাহার অধিকাংশ নানা কৌশলে আত্মসাৎ করিলেন।

জেলের মধ্যে অধিকাংশ কয়েদিকে যে পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিতে হয় দৈববিপাকে শশিভূষণকে তদপেক্ষা অনেক বেশি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তথাপি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

আবার একদা বর্ষার দিনে জীর্ণ শরীর ও শূন্য হৃদয় লইয়া শশিভূষণ কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন (স্বাধীনতা পাইলেন কিন্তু তাহা ছাড়া কারার বাহিরে তাঁহার আর-কেহ অথবা আর-কিছু ছিল না। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজহীন কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এত বড়ো জগৎসংসার অত্যন্ত ঢিলা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন) এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন ভৃত্য নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম শশিভূষণবাবু?"

তিনি কহিলেন, "হাঁ।"

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলিয়া তাঁহার প্রবেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কোথায় যাইতে হইবে।"

সে কহিল, "আমার প্রভু আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

পথিকদের কৌতূহলদৃষ্টিপাত অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি সেখানে আর অধিক বাদানুবাদ না করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা কিছু ভ্রম আছে। কিন্তু একটা কোনো দিকে তো চলিতে হইবে— নাহয় এমনি করিয়া ভ্রম দিয়াই এই নূতন জীবনের ভূমিকা আরম্ভ হউক।

সেদিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল; পথের প্রান্তবর্তী বর্ষার জল-প্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চঞ্চল ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়া ছিল এবং তাহার অদূরবর্তী মুদির দোকানে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোল করতাল -যোগে গান গাহিতেছিল—

এসো এসো ফিরে এসো— নাথ হে, ফিরে এসো!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
বঁধু হে, ফিরে এসো!

গাড়ি অগ্রসর হইয়া চলিল, গানের পদ ক্রমে দূর হইতে দূরতর হইয়া কানে প্রবেশ করিতে লাগিল—

ওগো নিষ্ঠুর, ফিরে এসো হে!
আমার করুণ কোমল, এসো!
ওগো সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত সুন্দর, ফিরে এসো!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফুটতর হইয়া আসিল, আর বুঝা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শশিভূষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গুন্‌গুন্‌ করিয়া, পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছুতে যেন থামিতে পারিলেন না—

আমার নিতি-সুখ, ফিরে এসো!
আমার চিরদুখ, ফিরে এসো!
আমার সব-সুখ-দুখ-মন্থন-ধন, অন্তরে ফিরে এসো!
আমার চিরবাঞ্ছিত, এসো!
আমার চিতসঞ্চিত, এসো!
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন,
ভুজ -বন্ধনে ফিরে এসো!
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো!
আমার মুখের হাসিতে এসো হে,
আমার চোখের সলিলে এসো!
আমার আদরে, আমার ছলনে,
আমার অভিমানে ফিরে এসো!
আমার সর্বস্মরণে এসো,
আমার সর্বভরমে এসো—
আমার ধরম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এসো!

গাড়ি যখন একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে থামিল তখন শশিভূষণের গান থামিল।

তিনি কোনো প্রশ্ন না করিয়া ভৃত্যের নির্দেশক্রমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে আসিয়া বসিলেন, সে ঘরের চারি দিকেই বড়ো বড়ো কাচের আলমারিতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজানো। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাঁহার পুরাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারামুক্ত হইয়া বাহির হইল। এই সোনার জলে অঙ্কিত, নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগুলি আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুপরিচিত রত্নখচিত সিংহদ্বারের মতো তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইল।

টেবিলের উপরেও কী কতকগুলি ছিল। শশিভূষণ তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন, একখানি বিদীর্ণ স্লেট, তাহার উপরে গুটিকয়েক পুরাতন খাতা, একখানি ছিন্নপ্রায় ধারাপাত, কথামালা এবং একখানি কাশীরামদাসের মহাভারত।

স্লেটের কাঠের ফ্রেমের উপর শশিভূষণের হস্তাক্ষরে কালি দিয়া খুব মোটা করিয়া

লেখা—গিরিবালা দেবী। খাতা ও বইগুলির উপরেও ঐ এক হস্তাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভূষণ কোথায় আসিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে রক্তস্রোত তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন—সেখানে কী চক্ষে পড়িল। সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্য পথ, সেই ডুরে-কাপড়-পরা ছোটো মেয়েটি। এবং সেই আপনার শান্তিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা।

সেদিনকার সেই সুখের জীবন কিছুই অসামান্য বা অত্যধিক নহে ; দিনের পর দিন ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সুখে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাঁহার নিজের অধ্যয়ন-কার্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপনকার্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল ; কিন্তু গ্রামপ্রান্তের সেই নির্জন দিনযাপন, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র সুখ, সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি সমস্তই যেন স্বর্গের মতো দেশকালের বহির্ভূত এবং আয়ত্তের অতীত রূপে কেবল আকাঙ্ক্ষারাজ্যের কল্পনাছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। সেদিনকার সেই-সমস্ত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষাম্লান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মৃদুগুঞ্জিত সেই কীর্তনের গানের সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার সংগীতময় জ্যোতির্ময় অপূর্বরূপ ধারণ করিল। সেই জঙ্গলে বেষ্টিত, কর্দমাক্ত, সংকীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে সেই অনাদৃত ব্যথিত বালিকার অভিমানমলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতাবিরচিত এক অসাধারণ আশ্চর্য অপরূপ অতি-গভীর অতি-বেদনাপরিপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মতো তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহারই সঙ্গে কীর্তনের করুণ সুর বাজিতে লাগিল এবং মনে হইল যেন সেই পল্লী-বালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনির্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভূষণ দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই স্লেট বহি খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেক কাল পরে অনেক দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে মৃদু শব্দে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে রূপার থালায় ফলমূলমিষ্টান্ন রাখিয়া গিরিবালা অদূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি মস্তক তুলিতেই নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন শীর্ণমুখ ম্লানবর্ণ ভগ্নশরীর শশিভূষণের দিকে সকরুণ স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার দুই চক্ষু ঝরিয়া, দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

শশিভূষণ তাহাকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না ; নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্প তাঁহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল, কথা এবং অশ্রু উভয়েই নিরুপায়ভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের দ্বারে বদ্ধ হইয়া রহিল। সেই কীর্তনের দল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল—এসো এসো হে!

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে একটা অনির্দেশ্য অরাজক স্থান আছে যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশকুসুমের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়ুদুর্গবেষ্টিত মহাদেশের নাম 'হইলে-হইতে-পারিত'। যাঁহারা মহৎ কার্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কর্তব্যসাধনে সহায়তা করিতেছেন তাঁহারাও ধন্য; কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টের ভ্রমক্রমে হঠাৎ দুয়ের মাঝখানে পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোনো উপায় নাই। তাঁহারা একটা-কিছু হইলে হইতে পারিতেন কিন্তু সেই কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কিছু-একটা হওয়া সর্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধু সেই মধ্যদেশবিলম্বিত বিধিবিড়ম্বিত যুবক। সকলেরই বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইতে পারিতেন। কিন্তু কোনো কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না এবং কোনো বিষয়ে তিনি কৃতকার্যও হইলেন না, এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বলিল, তিনি পরীক্ষায় ফার্স্ট হইবেন ; তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলে যে কোনো ডিপার্ট্‌মেণ্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন ; তিনি কোনো চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যন্ত সামান্য ; অসাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধুর সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি সুখসম্পদসৌভাগ্য দেশকালাতীত অনসম্ভবতার ভাণ্ডারে নিহিত ছিল, বিধাতা কেবল বাস্তবরাজ্যে তাঁহাকে একটি ধনী শ্বশুর এবং সুশীলা স্ত্রী দান করিয়াছিলেন। স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী।

স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধু পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপে গুণে তিনি আপন যোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামীসৌভাগ্যগর্বের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাঁহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার স্বামীরও কোনো সন্দেহ ছিল না, এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকূল ছিল।

এই স্বামীগর্ব পাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য বিন্ধ্যবাসিনী সর্বদাই সশঙ্কিত ছিলেন। তিনি যদি আপন হৃদয়ের অভ্রভেদী অটল ভক্তিপর্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামীটিকে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহাকে মূঢ় মর্তলোকের সমস্ত কটাক্ষ-পাত হইতে দূরে রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চিন্তচিত্তে পতিপূজায় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়জগতে কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা ভক্তিভাজনকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখা যায় না এবং অনাথবন্ধুকেও পুরুষের আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরল নহে। এইজন্য বিন্ধ্যবাসিনীকে অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে।

অনাথবন্ধু যখন কালেজে পড়িতেন তখন শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। পরীক্ষার

সময় আসিল, পরীক্ষা দিলেন না, এবং তাহার পরবৎসর কালেজ ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনায় সর্বসাধারণের সমক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে মৃদুস্বরে অনাথবন্ধুকে বলিলেন, "পরীক্ষাটা দিলেই ভালো হত।"

অনাথবন্ধু অবজ্ঞাভরে হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা দিলেই কি চতুর্ভুজ হয় না কি। আমাদের কেদারও তো পরীক্ষায় পাস হইয়াছে!"

বিন্ধ্যবাসিনী সান্ত্বনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক গো-গর্দভ যে পরীক্ষায় পাস করিতেছে সে পরীক্ষা দিয়া অনাথবন্ধুর গৌরব কী আর বাড়িবে।

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বাল্যসখী বিন্দিকে আনন্দ-সহকারে খবর দিতে আসিল যে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইতেছে। শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী অকারণে মনে করিল, কমলার এই আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ নহে, ইহার মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিঞ্চিৎ গূঢ় শ্লেষ আছে। এইজন্য সখীর উল্লাসে উল্লাস প্রকাশ না করিয়া বরং গায়ে পড়িয়া কিঞ্চিৎ ঝগড়ার সুরে শুনাইয়া দিল যে, এল.এ. পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে; এমন-কি বিলাতের কোনো কালেজে বি.এ.র নীচে পরীক্ষাই নাই। বলা বাহুল্য, এ-সমস্ত সংবাদ এবং যুক্তি বিন্ধ্য স্বামীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা সুখসংবাদ দিতে আসিয়া সহসা পরমপ্রিয়তমা প্রাণসখীর নিকট হইতে এরূপ আঘাত পাইয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কিন্তু, সেও নাকি স্ত্রীজাতীয় মনুষ্য, এইজন্য মুহূর্তকালের মধ্যেই বিন্ধ্যবাসিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল এবং ভ্রাতার অপমানে তৎক্ষণাৎ তাহারও রসনাগ্রে একবিন্দু তীব্র বিষ সঞ্চারিত হইল; সে বলিল, "আমরা তো ভাই, বিলাতও যাই নাই, সাহেব স্বামীকেও বিবাহ করি নাই, অত খবর কোথায় পাইব। মূর্খ মেয়েমানুষ মোটামুটি এই বুঝি যে, বাঙালির ছেলেকে কালেজে এল.এ. দিতে হয়; তাও তো ভাই, সকলে পারে না।" অত্যন্ত নিরীহ সুমিষ্ট এবং বন্ধুভাবে এই কথাগুলি বলিয়া কমলা চলিয়া আসিল, কলহ-বিমুখ বিন্ধ্য নিরুত্তরে সহ্য করিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

অল্পকালের মধ্যে আর-একটি ঘটনা ঘটিল। একটি দূরস্থ ধনী কুটুম্ব কিয়ৎ-কালের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদুপলক্ষে তাহার পিতা রাজকুমারবাবুর বাড়িতে বিশেষ একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাইবাবু বাহিরের যে বড়ো বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নব-অভ্যাগতদের বিশেষ সমাদরের জন্য সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে মামাবাবুর ঘরে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় লইতে অনুরোধ করা হইল।

এই ঘটনায় অনাথবন্ধুর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রথমত, স্ত্রীর নিকটে গিয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া শ্বশুরের উপর প্রতিশোধ তুলিলেন। তাহার পরে অনাহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রবল উপায়ে অভিমান প্রকাশের উপক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী নিরতিশয় লজ্জিত হইল। তাহার মনে যে একটি সহজ আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল তাহা হইতেই সে বুঝিল, এরূপ স্থলে সর্ব-সমক্ষে অভিমান প্রকাশ করার মতো লজ্জাকর আত্মাবমাননা আর কিছুই নাই। হাতে পায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া বহু কষ্টে সে তাহার স্বামীকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিল।

বিন্ধ্য অবিবেচক ছিল না, এইজন্য সে তাহার পিতামাতার প্রতি কোনো দোষারোপ

করিল না ; সে বুঝিল, ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু, এ কথাও তাহার মনে হইল যে, তাহার স্বামী শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কুটুম্বের আদর হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল, "আমাকে তোমাদের ঘরে লইয়া চলো ; আমি আর এখানে থাকিব না।"

অনাথবন্ধুর মনে অহংকার যথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। তাঁহার নিজ গৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। তখন তাঁহার স্ত্রী কিছু দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, "তুমি যদি না যাও তো আমি একলাই যাইব।"

অনাথবন্ধু মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে কলিকাতার বাহিরে দূর ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহাদের মৃত্তিকানির্মিত খোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমারবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী কন্যাকে আরও কিছুকাল পিতৃগৃহে থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন ; কন্যা নীরবে নতশিরে গম্ভীরমুখে বসিয়া মৌনভাবে জানাইয়া দিল, না, সে হইতে পারিবে না।

তাহার সহসা এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতামাতার সন্দেহ হইল যে, অজ্ঞাতসারে বোধ করি কোনোরূপে তাহাকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমারবাবু ব্যথিতচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাদের কোনো অজ্ঞানকৃত আচরণে তোমার মনে কি ব্যথা লাগিয়াছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী তাহার পিতার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, "এক মুহূর্তের জন্যও নহে। তোমাদের এখানে বড়ো সুখে বড়ো আদরে আমার দিন গিয়াছে।" বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল।

বাপ মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত স্নেহে যত আদরেই মানুষ কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রুপূর্ণনেত্রে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আপন আজন্মকালের স্নেহমণ্ডিত পিতৃগৃহ এবং পরিজন ও সঙ্গিনী -গণকে ছাড়িয়া বিন্ধ্যবাসিনী পাল্কিতে আরোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ধনীগৃহে এবং পল্লীগ্রামের গৃহস্থঘরে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু, বিন্ধ্যবাসিনী এক দিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফুল্লচিত্তে গৃহকার্যে শাশুড়ির সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজ ব্যয়ে কন্যার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীগৃহে পৌঁছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার শ্বশুরঘরের দারিদ্র্য দেখিয়া বড়োমানুষের ঘরের দাসী প্রতি মুহূর্তে মনে মনে নাসাগ্র আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে, এ আশঙ্কাও তাহার অসহ্য বোধ হইল।

শাশুড়ি স্নেহবশত বিন্ধ্যকে শ্রমসাধ্য কার্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বিন্ধ্য নিরলস-অশ্রান্ত-ভাবে প্রসন্নমুখে সকল কার্যে যোগ দিয়া শাশুড়ির হৃদয়

অধিকার করিয়া লইল, এবং পল্লীরমণীগণ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু, ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইল না। কারণ, বিশ্বনিয়ম নীতিবোধ-প্রথমভাগের ন্যায় সাধুভাষায় রচিত সরল উপদেশাবলী নহে। নিষ্ঠুর বিদ্রূপপ্রিয় শয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভালো কাজে সকল সময়ে উপস্থিত-মত বিশুদ্ধ ভালো ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধুর দুইটি ছোটো এবং একটি বড়ো ভাই ছিল। বড়ো ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গুটিপঞ্চাশেক টাকা উপার্জন করিতেন, তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিত এবং ছোটো দুটি ভাইয়ের বিদ্যাশিক্ষা হইত।

বলা বাহুল্য, আজকালকার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন অসম্ভব, কিন্তু বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী শ্যামাশংকরীর গরিমাবৃদ্ধির পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল। স্বামী সম্বৎসরকাল কাজ করিতেন, এইজন্য স্ত্রী সম্বৎসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাজকর্ম কিছুই করিতেন না অথচ এমন ভাবে চলিতেন, যেন তিনি কেবলমাত্র তাঁহার উপার্জনক্ষম স্বামীটির স্ত্রী হইয়াই সমস্ত সংসারটাকে পরম বাধিত করিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী যখন শ্বশুরবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় অহর্নিশি ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইল তখন শ্যামাশংকরীর সংকীর্ণ অন্তঃকরণটুকু কে যেন কষিয়া আঁটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শক্ত। বোধ করি বড়োবউ মনে করিলেন, মেজোবউ বড়ো ঘরের মেয়ে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্য ঘরকন্নার নীচ কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, উহাতে কেবল তাঁহাকে লোকের চক্ষে অপদস্থ করা হইতেছে। যে কারণেই হউক, মাসিক পঞ্চাশ টাকার স্ত্রী কিছুতেই ধনীবংশের কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নম্রতার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এ দিকে অনাথবন্ধু পল্লীতে আসিয়া লাইব্রেরি স্থাপন করিলেন; দশবিশজন স্কুলের ছাত্র জড়ো করিয়া সভাপতি হইয়া খবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এমন-কি, কোনো কোনো ইংরাজি সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া গ্রামের লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু, দরিদ্র সংসারে এক পয়সা আনিলেন না, বরঞ্চ বাজে খরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোনো চাকরি লইবার জন্য বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহাকে সর্বদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তিনি কান দিলেন না। স্ত্রীকে বলিলেন, তাঁহার উপযুক্ত চাকরি আছে বটে, কিন্তু পক্ষপাতী ইংরাজ গবর্মেণ্ট সে-সকল পদে বড়ো বড়ো ইংরাজকে নিযুক্ত করে, বাঙালি হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোনো আশা নাই।

শ্যামাশংকরী তাঁহার দেবর এবং মেঝো জা'র প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্বদাই বাক্যবিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্বভরে নিজেদের দারিদ্র্য আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা গরিব মানুষ, বড়ো মানুষের মেয়ে এবং বড়ো মানুষের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া। সেখানে তো বেশ ছিলেন, কোনো দুঃখ ছিল না— এখানে ডালভাত খাইয়া এত কষ্ট কি সহ্য হইবে।"

শাশুড়ি বড়োবউকে ভয় করিতেন, তিনি দুর্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোনো কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজোবউও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডালভাত

এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্যঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বড়ো ভাই ছুটিতে কিছু দিনের জন্য ঘরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপূর্ণ ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতি রাত্রেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন অনাথবন্ধুকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, "তোমার একটা চাকরির চেষ্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কী করিয়া।"

অনাথবন্ধু পদাহত সর্পের ন্যায় গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মুষ্টি অত্যন্ত অখাদ্য মোটা ভাতের 'পর এত খোঁটা সহ্য হয় না। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইয়ের অন্ন এবং ভাজের গালিতে কনিষ্ঠের পারিবারিক অধিকার আছে, কিন্তু শ্বশুরের আশ্রয়ে বড়ো লজ্জা। বিন্ধ্যবাসিনী শ্বশুরবাড়িতে দীনহীনের মতো নত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্যাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমন সময় গ্রামের এন্‌ট্রেন্‌স্‌স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল। অনাথবন্ধুর দাদা এবং বিন্ধ্যবাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কাজটি গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের ভাই এবং একমাত্র ধর্মপত্নী যে তাঁহাকে এমন একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কাজের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার মনে দুর্জয় অভিমানের সঞ্চার হইল এবং সংসারের সমস্ত কাজকর্মের প্রতি পূর্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৈরাগ্য জন্মিয়া গেল।

তখন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া, মিনতি করিয়া, তাঁহাকে অনেক করিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। সকলেই মনে করিলেন, ইহাকে আর কোনো কথা বলিয়া কাজ নাই, এ এখন কোনো প্রকারে ঘরে টিঁকিয়া গেলেই ঘরের সৌভাগ্য।

ছুটি অন্তে দাদা কর্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন; শ্যামাশংকরী রুদ্ধ আক্রোশে মুখখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদর্শনচক্র নির্মাণ করিয়া রহিলেন। অনাথবন্ধু বিন্ধ্যবাসিনীকে আসিয়া কহিলেন, "আজকাল বিলাতে না গেলে কোনো ভদ্র চাকরি পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিতেছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোনো ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করো।"

এক তো বিলাত যাইবার কথা শুনিয়া বিন্ধ্যর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; তাহার পরে পিতার কাছে কী করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে যাইবে, তাহা সে মনে করিতে পারিল না এবং মনে করিতে গিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

শ্বশুরের কাছে নিজমুখে টাকা চাহিতেও অনাথবন্ধুর অহংকারে বাধা দিল, অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিয়া না আনিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগারাগি করিলেন এবং মর্মপীড়িত বিন্ধ্যবাসিনীকে বিস্তর অশ্রুপাত করিতে হইল।

এমন করিয়া কিছুদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কষ্টে কাটিয়া গেল; অবশেষে শরৎকালে পূজা নিকটবর্তী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমারবাবু বহু সমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর পরে কন্যা স্বামীসহ পুনরায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুটুম্বের যে

আদর তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল, জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আদর পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও অনেক কাল পরে মাথার অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া অহর্নিশি স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষষ্ঠী। কাল সপ্তমীপূজা আরম্ভ হইবে। ব্যস্ততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দূর এবং নিকট -সম্পর্কীয় আত্মীয়পরিজনে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাত্রে বড়ো শ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী শয়ন করিল। পূর্বে যে ঘরে শয়ন করিত এ সে ঘর নহে ; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথবন্ধু কখন শয়ন করিতে আসিলেন তাহা বিন্ধ্য জানিতেও পারিল না। সে তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

খুব ভোরের বেলা হইতে সানাই বাজিতে লাগিল। কিন্তু, ক্লান্তদেহ বিন্ধ্যবাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কমল এবং ভুবন দুই সখী বিন্ধ্যর শয়নদ্বারে আড়ি পাতিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া অবশেষে পরিহাসপূর্বক বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল ; তখন বিন্ধ্য তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার স্বামী কখন উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল, তাহার মাতার লোহার সিন্দুক খোলা এবং তাহার বাপের যে ক্যাশবাক্সটি থাকিত সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় মায়ের চাবির গোচ্ছা হারাইয়া গিয়া বাড়িতে খুব একটা গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোনো-একটি চোর এই কাজ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ আশঙ্কা হইল, পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনোরূপ আঘাত করিয়া থাকে। বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার নীচে খুঁজিতে গিয়া দেখিল, খাটের পায়ের কাছে তাহার মায়ের চাবির গোচ্ছার নীচে একটি চিঠি চাপা রহিয়াছে।

চিঠি তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা। খুলিয়া পড়িয়া জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোনো-এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে, এক্ষণে সেখানকার খরচপত্র চালাইবার জন্য কোনো উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গত রাত্রে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করিয়া, বারান্দাসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া অন্দরের বাগানে নামিয়া, প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অদ্যই প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

পত্রখানা পাঠ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই খাটের খুরা ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের অভ্যন্তরে কর্ণকুহরের মধ্যে নিস্তব্ধ মৃত্যুরজনীর ঝিল্লিধ্বনির মতো একটা শব্দ হইতে লাগিল। তাহারই উপরে প্রাঙ্গণ হইতে, প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে এবং দূর অট্টালিকা হইতে, বহুতর সানাই বহুতর সুরে তান ধরিল। সমস্ত বঙ্গদেশ তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শরতের উৎসবহাস্যরঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এত বেলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ভুবন ও কমল উচ্চহাস্যে উপহাস করিতে করিতে গুম্‌ গুম্‌ শব্দে কিল মারিতে লাগিল। তাহাতেও কোনো সাড়া না পাইয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া ঊর্ধ্বকণ্ঠে "বিন্দি" "বিন্দি" করিয়া ডাকিতে লাগিল।

বিন্ধ্যবাসিনী ভগ্নরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "যাচ্ছি ; তোরা এখন যা।"

তাহারা সখীর পীড়া আশঙ্কা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন, "বিন্দু, কী হয়েছে মা, এখনও দ্বার বন্ধ কেন!"

বিন্ধ্য উচ্ছ্বসিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল, "একবার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।"

মা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমারবাবুকে সঙ্গে করিয়া দ্বারে আসিলেন। বিন্ধ্য দ্বার খুলিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তখন বিন্ধ্য ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা! আমাকে মাপ করো, আমি তোমার সিন্ধুক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।"

তাঁহারা অবাক হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্ধ্য বলিল, তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কাছে চাহিস নাই কেন।"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিল, "পাছে বিলাত যাইতে তোমরা বাধা দেও।"

রাজকুমারবাবু অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুর্দিক হইতে বিচিত্র সুরে আনন্দের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

যে বিন্ধ্য বাপের কাছে কখনো অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর লেশমাত্র অসম্মান পরমাত্মীয়ের নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত, আজ একেবারে উৎসবের জনতার মধ্যে তাহার পত্নী-অভিমান, তাহার দুহিতৃসম্ভ্রম, তাহার আত্মমর্যাদা চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধূলির মতো লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পূর্ব হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যন্ত্রপূর্বক চাবি চুরি করিয়া, স্ত্রীর সাহায্যে রাতারাতি অর্থ-অপহরণ-পূর্বক অনাথবন্ধু বিলাতে পলায়ন করিয়াছে, এ কথা লইয়া আত্মীয়-কুটুম্বপরিপূর্ণ বাড়িতে একটা ঢী ঢী পড়িয়া গেল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভুবন কমল এবং আরও অনেক স্বজন প্রতিবেশী দাসদাসী সমস্ত শুনিয়াছিল। রুদ্ধদ্বার জামাতৃগৃহে উৎকণ্ঠিত কর্তাগৃহিণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কৌতূহলে এবং আশঙ্কায় ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছিল।

বিন্ধ্যবাসিনী কাহাকেও মুখ দেখাইল না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দুঃখ অনুভব করিল না। ষড়যন্ত্রকারিণীর দুষ্টবুদ্ধিতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল, বিন্ধ্যর চরিত্র এতদিন অবসরা-ভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দ গৃহে পূজার উৎসব কোনো প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশুড়ির সহিত পতিবিরহবিধুরা বধূর ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল। উভয়ে পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে সুগভীর সহিষ্ণুতার সহিত সংসারের সমস্ত তুচ্ছতম কার্যগুলি পর্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শাশুড়ি যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দূরে চলিয়া গেল। বিন্ধ্য মনে মনে অনুভব করিল, 'শাশুড়ি দরিদ্র আমিও দরিদ্র, আমরা এক দুঃখবন্ধনে বদ্ধ। পিতামাতা ঐশ্বর্যশালী, তাঁহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দূরে।' একে দরিদ্র বলিয়া বিন্ধ্য তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক দূরবর্তী, তাহাতে আবার চুরি স্বীকার করিয়া সে আরও অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। স্নেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থক্যভার বহন করিতে পারে কি না কে জানে।

অনাথবন্ধু বিলাত গিয়া প্রথম প্রথম স্ত্রীকে রীতিমত চিঠিপত্র লিখিতেন। কিন্তু, ক্রমেই চিঠি বিরল হইয়া আসিল এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিত-ভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহকার্যরতা স্ত্রীর অপেক্ষা বিদ্যা-বুদ্ধি রূপগুণ সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর অনেক ইংরাজকন্যা অনাথবন্ধুকে সুযোগ্য সুবুদ্ধি এবং সুরূপ বলিয়া সমাদর করিত। এমন অবস্থায় অনাথবন্ধু আপনার একবস্ত্রপরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী অগৌরবর্ণা স্ত্রীকে কোনো অংশেই আপনার সম-যোগ্য জ্ঞান করিবেন না, ইহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু তথাপি, যখন অর্থের অনটন হইল তখন এই নিরুপায় বাঙালির মেয়েকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাঁহার সংকোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙালির মেয়েই দুই হাতে কেবল দুইগাছি কাঁচের চুড়ি রাখিয়া গায়ের সমস্ত গহনা বেচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই বলিয়া তাহার সমস্ত বহুমূল্য গহনাগুলি পিতৃগৃহে ছিল। স্বামীর কুটুম্বভবনে নিমন্ত্রণে যাইবার ছল করিয়া নানা উপলক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী একে একে সকল গহনাই আনাইয়া লইল। অবশেষে হাতের বালা, রুপার চুড়ি, বেনারসি শাড়ি এবং শাল পর্যন্ত বিক্রয় শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অনুনয়পূর্বক মাথার দিব্য দিয়া অশ্রুজলে পত্রের প্রত্যেক অক্ষরপংক্তি বিকৃত করিয়া স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল।

স্বামী চুল খাটো করিয়া, দাড়ি কামাইয়া, কোট্‌প্যান্ট্‌লুন্‌ পরিয়া, ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং হোটেলে আশ্রয় লইলেন। পিতৃগৃহে বাস করা অসম্ভব—প্রথমত উপযুক্ত স্থান নাই, দ্বিতীয়ত পল্লীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ জাতি নষ্ট হইলে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে। শ্বশুরগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দু, তাঁহারাও জাতিচ্যুতকে আশ্রয় দিতে পারেন না।

অর্থাভাবে অতি শীঘ্রই হোটেল হইতে বাসায় নামিতে হইল। সে বাসায় তিনি স্ত্রীকে আনিতে প্রস্তুত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্ত্রী এবং মাতার সহিত কেবল দিন-দুই-তিন দিনের বেলায় দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

দুইটি শোকার্তা রমণীর কেবল এক সান্ত্বনা ছিল যে, অনাথবন্ধু স্বদেশে

আত্মীয়বর্গের নিকটবর্তী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধুর অসামান্য ব্যারিস্টারি কীর্তিতে তাহাদের মনে গর্বের সীমা রহিল না। বিন্ধ্যবাসিনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য স্ত্রী বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, পুনশ্চ অযোগ্য বলিয়াই স্বামীর অহংকার অধিক করিয়া অনুভব করিল। সে দুঃখে পীড়িত এবং গর্বে বিস্ফারিত হইল। ম্লেচ্ছ আচার সে ঘৃণা করে, তবু স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, 'আজকাল ঢের লোক তো সাহেব হয়, কিন্তু এমন তো কাহাকেও মানায় না—একেবারে ঠিক যেন বিলাতি সাহেব! বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো নাই!'

বাসাখরচ যখন অচল হইয়া আসিল—যখন অনাথবন্ধু মনের ক্ষোভে স্থির করিলেন, অভিশপ্ত ভারতবর্ষে গুণের সমাদর নাই এবং তাঁহার স্বব্যবসায়ীগণ ঈর্ষা-বশত তাঁহার উন্নতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে—যখন তাঁহার খানার ডিশে আমিষ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দগ্ধ কুক্কুটের সম্মানকর স্থান ভর্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভূষার চিক্কণতা এবং ক্ষৌরমসৃণ মুখের গর্বোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিল—যখন সুতীব্র নিখাদে-বাঁধা জীবনতন্ত্রী ক্রমশ সকরুণ কড়িমধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল—এমন সময় রাজকুমারবাবুর পরিবারে এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধুর সংকটসংকুল জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনয়ন করিল। একদা গঙ্গাতীরবর্তী মাতুলালয় হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার সময় রাজকুমারবাবুর একমাত্র পুত্র হরকুমার স্টিমারের সংঘাতে স্ত্রী এবং বালক পুত্র -সহ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নিদারুণ শোকের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে পর রাজকুমারবাবু অনাথবন্ধুকে গিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই।"

অনাথবন্ধু উৎসাহসহকারে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, যে-সকল বার্-লাইব্রেরি-বিহারী স্বদেশীয় ব্যারিস্টারগণ তাঁহাকে ঈর্ষা করে এবং তাঁহার অসামান্য ধীশক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রকাশ করে না, এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

রাজকুমারবাবু পণ্ডিতদিগের বিধান লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, অনাথবন্ধু যদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে যদিচ উক্ত নিষিদ্ধ চতুষ্পদ তাঁহার প্রিয় খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত, তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। প্রিয়বন্ধুদের নিকট কহিলেন, "সমাজ যখন স্বেচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা শুনিতে চাহে তখন একটা মুখের কথায় তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। যে রসনা গোরু খাইয়াছে সে রসনাকে গোময় এবং মিথ্যা কথা -নামক দুটো কদর্য পদার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আমাদের আধুনিক সমাজের নিয়ম ; আমি সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহি না।"

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিবার একটা শুভদিন নির্দিষ্ট হইল। ইতিমধ্যে অনাথবন্ধু কেবল যে ধুতিচাদর পরিলেন তাহা নহে, তর্ক এবং উপদেশের দ্বারা বিলাতি-সমাজের গালে কালি এবং হিন্দুসমাজের গালে চুন লেপন করিতে লাগিলেন।

যে শুনিল সকলেই খুশি হইয়া উঠিল।

আনন্দে গর্বে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রীতিসুধাসিক্ত কোমল হৃদয়টি সর্বত্র উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, 'বিলাত হইতে যিনিই আসেন একেবারে আস্ত বিলাতি সাহেব হইয়া আসেন, দেখিয়া বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো থাকে না। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে অবিকৃতভাবে ফিরিয়াছেন, বরঞ্চ তাঁহার হিন্দুধর্মে ভক্তি পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।'

যথানির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে রাজকুমারবাবুর ঘর ভরিয়া গেল। অর্থব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত হইয়াছিল।

অন্তঃপুরেও সমারোহের সীমা ছিল না। নিমন্ত্রিত পরিজনবর্গের পরিবেশন ও পরিচর্যায় সমস্ত প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল এবং কর্মরাশির মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী প্রফুল্লমুখে শারদরৌদ্ররঞ্জিত প্রভাত-বায়ুবাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মতো আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমস্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক তাহার স্বামী। আজ যেন সমস্ত বঙ্গভূমি একটিমাত্র রঙ্গভূমি হইয়াছে এবং যবনিকা-উদ্ঘাটন-পূর্বক একমাত্র অনাথবন্ধুকে বিস্মিত বিশ্বদর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত যে অপরাধস্বীকার তাহা নহে, এ যেন অনুগ্রহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরবচ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর প্রেমপ্রমুদিত মুখের উপরে অপরূপ মহিমাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এতদিনকার তুচ্ছ জীবনের সমস্ত দুঃখ এবং ক্ষুদ্র অপমান দূর হইয়া সে আজ তাহার পরিপূর্ণ পিতৃগৃহে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সমক্ষে উন্নতমস্তকে গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। স্বামীর মহত্ত্ব আজ অযোগ্য স্ত্রীকে বিশ্বসংসারের নিকট সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবন্ধু জাতে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আত্মীয় ও ব্রাহ্মণ-গণ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তৃপ্তিপূর্বক আহার শেষ করিয়াছেন।

আত্মীয়েরা জামাতাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা সুস্থচিত্তে তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে প্রসন্নহাস্যমুখে আলস্যমন্থরগমনে ভূমি-লুণ্ঠমান চাদরে অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন।

আহারান্তে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণার আয়োজন হইতেছে এবং ইত্যবসরে তাঁহারা সভাস্থলে বসিয়া তুমুল কলহ-সহকারে পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতেছেন। কর্তা রাজকুমারবাবু ক্ষণকাল বিশ্রাম উপলক্ষে সেই কোলাহলাকুল পণ্ডিতসভায় বসিয়া স্মৃতির তর্ক শুনিতেছেন, এমন সময় দ্বারবান গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ড্ দিয়া খবর দিল, "এক সাহেবলোগ্‌কা মেম আয়া।"

রাজকুমারবাবু চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে— মিসেস্ অনাথবন্ধু সরকার। অর্থাৎ, অনাথবন্ধু সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমারবাবু অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিলাত হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগতা আরক্ত-কপোলা আতাম্রকুন্তলা আনীললোচনা দুগ্ধফেনশুভ্রা হরিণলঘুগামিনী ইংরাজমহিলা

স্বয়ং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক থামিয়া সভাস্থল শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথবন্ধু রঙ্গভূমিতে আসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মুহূর্তের মধ্যেই ইংরাজমহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সেদিন সভাস্থলে সংহিতার তর্ক আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

অগ্রহায়ণ ১৩০১

বিচারক

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেও তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্‌কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। তত দিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর বাঁধা একপ্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভালো-মন্দ, অনেক সুখদুঃখ, জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তখন নূতন প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরও প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবনলাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জরাবিহীন অন্তর-প্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্রমে মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া— যাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোকতাপ বিচ্ছেদের মধ্যে যে-কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া— সুনিশ্চিত সুপরীক্ষিত চির-পরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া, তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয়, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয়— তখনও যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই— সংসারে তাহার মতো শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই— তিন বৎসরের শিশু পুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই— যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার ও মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই— যখন তাহার মনে পড়িল, আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য-সহকারে নূতন হৃদয়-হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার

করিতে হইবে— তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারম্বার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল— সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মতো পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া "ক্ষীরো" "ক্ষীরো" শব্দে দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটা হস্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল; রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভগ্নকাতর কণ্ঠে "মা" "মা" করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রোরুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্‌-বেগে ছুটিয়া নিকটবর্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিস্‌ট্রেট তাহাকে সেসনে চালান করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জজ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাট্যুটারি সিভিলিয়ান। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকিলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। এক দিকে তিনি হিন্দুমহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপর দিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেন্ড্‌ ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি, মুণ্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষুরধারে গুম্ফশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চশমায়, গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবি ধরনের কেশবিন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর নূতনসংস্করণ কার্তিকটির মতো ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্যমাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরও দুটো-একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে একঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশী বলিয়া এক বিধবা কন্যা

ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনেরোয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপর উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন-অন্তরালে হেমশশী সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল, সেই দূরত্বের বিচ্ছেদ-বশত সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্তী পরমরহস্যময় প্রমোদভবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎ-যন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন—সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত, সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মতো সহজ, সম্মুখবর্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবর্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষত, তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবনসমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহার হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্মকোষের চতুর্দিকে রক্তপদ্মের কোমল পাপড়ি-গুলির মতো স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোটো ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল-সকাল খাইয়া ইস্কুলে যাইত, আবার ইস্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট-ইস্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাস্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জন ঘরে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোক-চলাচল দেখিত; ফেরিওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত, তাহাই শুনিত; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন এবং ফেরিওয়ালারা যে জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে—উহারা যেন এই লোক-চলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতা মাত্র।

আর, সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটি-বেশ-ধারী গর্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মতো মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশসুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকলপ্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত, মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্তকীর নূপুরনিক্কণ এবং বামাকণ্ঠের সংগীতধ্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃদ্‌পিণ্ড পিঞ্জরের পক্ষীর মতো বক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভর্ৎসনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত

কক্ষটি হেমশশীকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূরে বাতায়নের আলোক ছায়া ও সংগীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপুত্তলিকাকে সেই মায়াপুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত, এবং আপন জীবন-যৌবন সুখ-দুঃখ ইহকাল-পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মতো পুড়াইয়া সেই নির্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না, তাহার সম্মুখবর্তী ঐ হর্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি, গ্লানি, পঙ্কিলতা, বীভৎস ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে, বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন তাহাকে 'বিনোদচন্দ্র'-নামক মিথ্যা স্বাক্ষরে বারম্বার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশঙ্ক উৎকণ্ঠিত অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ -পূর্ণ উত্তর পাইল, এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে উল্লাসে-সংকোচে সন্দেহে-সম্ভ্রমে আশায়-আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, তাহার পরে প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎসংসার বিধবার চারি দিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মতো কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং অবশেষে কখন একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, সে-সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্র-ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল, তখন সে লজ্জায় ধিক্কারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল; বলিল, "ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এসো।" মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মুহূর্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে, তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশীর মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না; মনে পড়িল, তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইস্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালোবাসিত; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের

সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পান সাজা, চুল বাঁধা, পিতার আহার-স্থলে পাখা করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা—এ-সমস্তই তাহার কাছে পরম শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মতো বোধ হইতে লাগিল ; বুঝিতে পারিল না, এ-সব থাকিতে সংসারে আর কোন্ সুখের আবশ্যক আছে!

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের, তাহা ইতিপূর্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসংকোচ নিত্যকর্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশীর এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোন্‌খানে গিয়া প্রভাত হইবে এবং সে নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটোখাটো ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে, তখন সেখানে সহসা কী লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—কী লাঞ্ছনা, কী হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল ; সকরুণ অনুনয়-সহকারে বলিতে লাগিল, "এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই, এখনো জাগে নাই ; এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।" কিন্তু, তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না; এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহু-দিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর-একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণ রথে চড়িয়া আর-এক পথে প্রস্থান করিলেন—রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতমোহনের পূর্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে একঘেয়ে হইয়া উঠে এইজন্য অন্যগুলি বলিলাম না।

এখন সে-সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে, এমন কোনো লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহ্নিকতর্পণ করেন এবং সর্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোটো ছোটো ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য চন্দ্র মরুদ্‌গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, এক কালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই-এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতেই মনোমত তরিতরকারি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে! মৃত্যু সন্নিকট, তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ৎসনা ও উপদেশ দ্বারা এখনো ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণস্বরে করজোড়ে কহিল, "ওগো জজ্‌বাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।"

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকানো ছিল—দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিবে, তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না; গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব!

প্রহরীকে কহিলেন, "কই, আংটি দেখি।"—প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির এক দিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপর দিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে— বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর-একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর-একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পৌষ ১৩০১

নিশীথে

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল। এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্‌বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণবাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে—তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।"

আমি কিঞ্চিৎ সসংকোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণাচরণবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের-কাগজ-পাতা প্যাক্‌বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণবাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া, জ্বরবিকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তার জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল; সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই।

সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতি দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আঃ করো কী। লোকে বলিবে কী। অমন করিয়া দিনরাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না।"

যেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইরূপ ভাণ করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা-উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না, এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল জুঁই গোলাপ গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত, কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পান্সির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন "ঘরে বন্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে ; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।"

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি-একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে

ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারি দিক শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে এক পার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটা উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছু ক্ষণ এইরূপে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল; আমি বলিয়া উঠিলাম, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।"

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল, এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, "কোনো কালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ম হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সেগুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর-দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎস্না-রাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে।

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, "একবার বায়ুপরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।" আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্ ভন্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্‌ণ হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর-কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।"

এটা যেন কেবল একটা সুবুদ্ধি এবং সদ্‌বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম, "যতদিন এই দেহে জীবন আছে—"

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "নাও নাও! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!"

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, "এ জীবনে আর কাহাকেও ভালো-বাসিতে পারিব না।"

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশা-হীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ, চিররুগ্‌ণকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম-যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়া-ছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন; সেইজন্য যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু, বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম—মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন আমি হারান ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি, কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো ; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারানবাবুকে বলিতেছেন, "ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।"

ডাক্তার বলিলেন, "ছি, এমন কথা বলিবেন না।"

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।"

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণবাবু অনেক ক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমাকে এক্‌গ্লাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাক্তারবাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্য দিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টি বদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম ; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিম্বা হয়তো বড়ো কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর

অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছু ক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে।"—তাঁহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ও কে। ও কে গো।"

আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "আমি চিনি না।" বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্তেই বলিলাম, "ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা।"

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আসুন।" আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "এই নীল শিশিটা মালিস করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।"

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইঁহাকে সেবা করিবে কে।"

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরানো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো যত্ন করে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।"

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, ইনি এই বদ্ধ ঘরে অনেক ক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?"

ডাক্তারবাবু আমাকে কহিলেন, "আসুন-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।"

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

"তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে।"

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেক ক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিস করিলে হয় না?"

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন।"

আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, "হাঁ।"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প্ আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্ধমূর্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারম্বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।"

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

দক্ষিণাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, "উঃ, বড়ো গরম!" বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন জাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব।

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুর বর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল-অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়ি-পরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।"

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর-একদিন আর-কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন।"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, "শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?"

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?"

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখির ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তরদেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারি দিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো সুখে ছিলাম। চারি দিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার অনেক দিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খ'ড়ে ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশনিজীবভাবে সুদীর্ঘ শীত-নিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহু দূরে চলিয়া গেলাম। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুইজনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্‌বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়। এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মতো হইয়াছে— পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেই-খানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম— মনোরমা কী ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, "ও কে। ও কে। ও কে।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে— চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাৎ এত রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুইজনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে

বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটিমাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে। ও কে। ও কে গো।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটি হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল; ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল; এত ক্ষীণ শব্দ কখনও শুনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।" সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।"

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, "একটু জল খান।"

এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্ দপ্ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, "ডাক্তার! ডাক্তার!"

মাঘ ১৩০১

আপদ

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ এবং বিদ্যুতের ঝিক্‌মিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মতো দিগ্‌বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এ পারে ও পারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড়ো বড়ো গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝট্‌পট্‌ করিয়া হাহুতাশসহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রী-পুরুষে কথাবার্তা চলিতেছিল।

শরৎবাবু বলিতেছিলেন, "আর কিছুদিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব।"

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, "আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোনো ক্ষতি হইবে না।"

বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দুরূহ নয়, তথাপি বাদপ্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরৎ কহিলেন, "ডাক্তার বলিতেছে, আর কিছুদিন থাকিয়া গেলে ভালো হয়।"

কিরণ কহিলেন, "তোমার ডাক্তার তো সব জানে!"

শরৎ কহিলেন, "জান তো, এই সময়ে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভালো হয়।"

কিরণ কহিলেন, "এখানে এখন বুঝি কোথাও কাহারও কোনো ব্যামো হয় না!"

পূর্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালোবাসে, এমন-কি, শাশুড়ি পর্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল, এবং ডাক্তার যখন বায়ুপরিবর্তনের প্রস্তাব করিল তখন গৃহ এবং কাজকর্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ি কোনো আপত্তি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই, বায়ুপরিবর্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থুল করিয়া তোলা নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোনো দেশ আছে কি যেখানে অদৃষ্টের লিপি সফল হয় না—তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে-সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাঁহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয়ব্যক্তির বিপদে মানুষের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগমুক্ত

হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকরুণ কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্পসহ মনে উদয় হয়, আহা, বড়ো রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সঙ্গপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভালো লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই; কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্ণ শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্যপালন করো—ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুদ্ধগৃহে স্বামীস্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয়পক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল তখন দুর্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোনো অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কী একটা নিবেদন করিল।

শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকাডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণবালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান-অভিমান দূর হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শুষ্ক বস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন এবং শীঘ্র একবাটি দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনও উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিলেন, সে যাত্রার দলের ছোকরা, তাহার নাম নীলকান্ত। তাহারা নিকটবর্তী সিংহবাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহূত হইয়াছিল; ইতিমধ্যে নৌকাডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কী গতি হইল কে জানে; সে ভালো সাঁতার জানিত, কোনোমতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত, এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরৎ মনে করিলেন, হইল ভালো, কিরণ একটা নূতন কাজ হাতে পাইলেন, এখন কিছুকাল এইভাবে কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণবালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশায় শাশুড়িও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশয় ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনীপরিবারের হাতে বদলি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাঁহার মাতার মত-পরিবর্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন, আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়গুড়িতে ফড়্ ফড়্ শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার শখের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নববন্ধুসঞ্চয়চেষ্টায় পল্লীতে পর্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য

কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনি স্পর্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহূত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্মল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমনসংবাদ স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তশিশু-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কাঁচ আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড়ো বেশি আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নূতন ধুতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন-তখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার স্নেহ এবং কৌতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলো চুল চিরিয়া-চিরিয়া ঘষিয়া-ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত— এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাঁহার সহিত একাসনে দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পাইত না। শাশুড়ি এক-একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন, কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কানমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনা-জনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর জলস্থলবিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চৌদ্দ-পনেরো হয় তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে, যদি সতেরো-আঠারো হয় তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকালপক্ব, নয় সে অকাল-অপক্ব।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা দময়ন্তী সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যক-মত বিধাতার বরে খানিক দূর পর্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটোই দেখিত, আপনাকে সে ছোটোই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এই-সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণপ্রভাবে সতেরো বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ব সতেরোর অপেক্ষা অতি-পরিপক্ব চোদ্দর মতো দেখাইত। গোঁফের রেখা না উঠাতে এই ভ্রম আরও দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হউক, বা বয়সানুচিত ভাষা-প্রয়োগ-বশতই হউক, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশি পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দুইটি চক্ষুর মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবত কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের 'তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্বতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎবাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়াছিল এখানে আসিয়া সেটা কখন এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো-আঠারো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রীবেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়োই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয়, এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন-কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সংকল্প করিল। কিন্তু বউঠাকরুনের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না, এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনো কোনো কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিত; জল ছল্ ছল্ করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখি কিচ্‌মিচ্ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কী ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর-একটা কথায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত না, অথচ 'বই পড়িতেছি' মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগৌরব উপস্থিত হইত। সামনে দিয়া যখন একটা নৌকা যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া পড়ার ভাণ করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মতো যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক্ বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত

ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে
এমন নৃশংস কেন হলি রে—
বল্ কী জন্যে, এ অরণ্যে,
রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত; তখন চারি দিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কী মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃমাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত

অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া রাজপুত্র রাজকন্যা এবং সাত-রাজার-ধন মানিকের কথা শোনে তখন সেই ক্ষীণদীপালোকিত জীর্ণ গৃহ-কোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত— জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখির ডাক এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদলকোমল রক্তিম চরণযুগল কী-এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আবার এক সময় এই গীতমরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগক্রমে শরৎ আসিয়া তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় কষাইয়া দিতেন, এবং বালক-ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা-কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুশি হইলেন, তাঁহার হাতে আর-একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিঁদুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনও তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনও ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পুরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্ত দিন তর্জন ধাবন হাস্য, এমন-কি, মাঝে মাঝে কলহ ক্রন্দন সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কী ভূতে পাইল কে জানে। সে কী উপলক্ষ করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশি কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমন-কি, পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখাচ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভালো খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালোবাসেন। ভালো খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্তের ছিল, সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃ পুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এইজন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণবালকের তৃপ্তি-পূর্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশত নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত ; পূর্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না, সে সর্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলসুদ্ধ খাইয়া তবে উঠিত। কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে

ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত, তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত ; বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত "আমার ক্ষুধা নাই"। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুতপ্তচিত্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন এবং খাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে-অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে "আমার ক্ষুধা নাই"। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না ; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে ; কিন্তু কী তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবি, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে। যখন কেহই আসে না, তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমলকরস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল, সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্বদাই লাগায় ; যেদিন কিরণ কোনো কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সেদিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত একমনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, "আর-জন্মে আমি যেন সতীশ হই এবং সতীশ যেন আমি হয়।" সে জানিত, ব্রাহ্মণের একান্ত মনের অভিশাপ কখনও নিষ্ফল হয় না, এইজন্য সে মনে মনে সতীশকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে গিয়া নিজে দগ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বউঠাকুরানীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যমিশ্রিত পরিহাসকলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টত সতীশের কোনোরূপ শত্রুতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমত তাহার ছোটোখাটো অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত ; সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত, সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ শখের চিকনের-কাজ-করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে ; ভাবিল, হাওয়ায় উড়িয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন্ দিক হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন ; নীলকান্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর আবার কী হল রে।" নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, "সেই গানটা গা-না।" "সে আমি ভুলে গেছি" বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল ; সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোনো কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে, সে প্রশ্নমাত্র কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে শাশুড়ি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণ তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দুই দিন আগে ব্রাহ্মণবালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে

স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কয়দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিল; যাহাকে চিরকাল কাছে রাখা যাইবে না তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভালো হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল; সে অত বড়ো ছেলের কান্না দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে মোলো! কথা নাই, বার্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!"

কিরণ এই কঠোর উক্তির জন্য সতীশকে ভর্ৎসনা করিলেন। সতীশ কহিল, "তুমি বোঝ না বউদিদি, তুমি সকলকেই বড়ো বেশি বিশ্বাস করো; কোথাকার কে তার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মূষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়াকান্না জুড়িয়াছে—ও বেশ জানে যে, দুফোঁটা চোখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।"

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাল্পনিক মূর্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিঁধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি শৌখিন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসানো এবং মাঝে একটা জর্মন রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চুপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে; সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল, প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল দিয়া অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহংসের চঞ্চু-অগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন, "ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হলি রে" এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকের বাগ্‌যুদ্ধ চলিত।

স্বদেশযাত্রার আগের দিন সকালবেলায় সে জিনিসটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর অন্বেষণে উড়িয়াছে।"

কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না—গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘুর্‌ ঘুর্‌ করিতে দেখিয়াছে, এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার দোয়াত চুরি করে কোথায় রেখেছিস, এনে দে।"

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে যখন তাহার নামে দোয়াত-চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ আগুনের মতো জ্বলিতে লাগিল; তাহার বুকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল;

সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রুদ্ধ বিড়ালশাবকের মতো সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্টস্বরে বলিলেন, "নীলু যদি সেই দোয়াতটা নিয়ে থাকিস আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বলবে না।"

নীলকান্তের চোখ ফাটিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "নীলকান্ত কখনোই চুরি করে নি।"

শরৎ এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয় নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করে নি।"

কিরণ সবলে বলিলেন, "কখনোই না।"

শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া শওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, "না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।"

সতীশ কহিলেন, "উহার ঘর এবং বাক্স খুঁজিয়া দেখা উচিত।"

কিরণ বলিলেন, "তাহা যদি কর তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দোষীর প্রতি কোনোরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর অশ্রুজলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভালো দুইজোড়া ফরাসডাঙার ধুতিচাদর, দুইটি জামা, একজোড়া নূতন জুতা এবং একখানি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহার-গুলি আস্তে আস্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত।

আঁচল হইতে চাবির গোচ্ছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খুলিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগুলি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাটাই, কঞ্চি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক, ভাঙা প্লাসের তলা প্রভৃতি নানাজাতীয় পদার্থ স্তূপাকারে রক্ষিত।

কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভালো করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিস ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশ্যে বাক্সটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাটাই লাঠিম ছুরি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল ; তাহার পরে খানকয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুযত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্য হইয়া আরক্তিমমুখে অনেক ক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্তই দেখিল, মনে করিল কিরণ স্বয়ং চোরের মতো তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে কেবল

সামান্য চোরের মতো লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাসাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিসটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্তের দুর্বলতাবশত ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সের মধ্যে পুরিয়াছে, সে-সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে। সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কী। কেমন করিয়া বলিবে সে কী। সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে ; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সের ভিতরে রাখিলেন। চোরের মতো তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপরে বালকের লাটাই লাঠি লাঠিম ঝিনুক কাঁচের টুকরা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন এবং সর্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণবালকের কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই ; পুলিস বলিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন শরৎ বলিলেন, "এইবার নীলকান্তের বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।"

কিরণ জেদ করিয়া বলিলেন, "সে কিছুতেই হইবে না।" বলিয়া বাক্সটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াতটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরৎ সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন ; বাগান এক দিনে শূন্য হইয়া গেল ; কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, খুঁজিয়া খুঁজিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ফাল্গুন ১৩০১

দিদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পল্লীবাসিনী কোনো-এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুষ্কৃতিসকল সবিস্তারে বর্ণনপূর্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল, এমন স্বামীর মুখে আগুন।

শুনিয়া জয়গোপালবাবুর স্ত্রী শশী অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিল— স্বামী-জাতির মুখে চুরুটের আগুন ছাড়া অন্য কোনোপ্রকার আগুন কোনো অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রীজাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সংকোচ প্রকাশ করাতে কঠিনহৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল, এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাত-জন্ম বিধবা হওয়া ভালো। এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশী মনে মনে কহিল, 'স্বামীর এমন কোনো অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।' এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার আঘ্রাণ অনুভব করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে নির্জন চিন্তায় পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্রে অবস্থান করিয়া, নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে। কোনো পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোলো বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশীর মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁস ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল ; ঢিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্ টন্ করিতে লাগিল।

তাই আজ এত দিন পরে এত বয়সে, ছেলের মা হইয়া, শশী বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জন ঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিতযৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই তীরে বহু দূরে অনেক সোনার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল— কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল, 'এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল

হইতে দিব না।' কতদিন কতবার তুচ্ছ তর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে; আজ অনুতপ্তচিত্তে একান্তমনে সংকল্প করিল, আর কখনোই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্রহৃদয়ে স্বামীর ভালোমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে— কারণ, স্বামী সর্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেক দিন পর্যন্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেইজন্য জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকরি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতান্ত অকালে, প্রায় বৃদ্ধবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসংগত অন্যায় আচরণে শশী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়াছিল; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশাভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবর্তী স্থানে চাকরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, কিন্তু সর্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোনো উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না; শশীকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুটিয়া বলিবার জো নাই তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশি হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তন্যপান করিতে ও চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড়ো ভগিনীটি— দুধ গরম, ভাত ঠাণ্ডা, ছেলের স্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্প দিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্বে জননী তাঁহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হুহুংকারশব্দপূর্বক সে যখন তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে তাহার মুখ চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মুষ্টি-মধ্যে তাহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্যোদয় হইবার পূর্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমলস্পর্শে তাহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত— যখন ক্রমে সে তাহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধ স্থানে গমনপূর্বক তাহার প্রতি বিধিমত উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল— তখন শশী

আর থাকিতে পারিল না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া, তাহার প্রতি তাহার আধিপত্য ঢের বেশি হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল তখন কালীপ্রসন্নের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্বে কালীপ্রসন্ন নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয়রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না। কারণ, মন জিনিসটা সজীব পদার্থ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্তন।

শশীর পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাসবশত যে-এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন পূর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, 'যেমন দিনই আসুক, যত দিনই যাক, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনোই ম্লান হইতে দিব না।'

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যরূপ। পূর্বে যখন উভয়ে অবিচ্ছেদে একত্র ছিল, যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্যসত্য হইয়াছিল— তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এইজন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাসবিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। পূর্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্ত ভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর অবস্থা-উন্নতি-চেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার পূর্বজীবন বস্তুহীন ছায়ার মতো দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব স্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু শ্যালকটি একটা নূতন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে।

এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশুস্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত, কিন্তু ঠিক কৃতকার্য হইত কি না বলিতে পারি না।

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত— নীলমণি প্রাণপণে শশীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোনোপ্রকার কুটুম্বিতার খাতির মানিত না। শশীর ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটির যতপ্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে, সবগুলি জয়গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালও সেজন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই বুঝিতে পারিত না, এই কৃশকায় বৃহৎমস্তক গম্ভীরমুখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কী আছে যেজন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালোবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্‌ করিয়া বোঝে। শশী অবিলম্বেই বুঝিল, জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত— স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত, এইজন্য শশী তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া, সমস্ত প্রাণ দিয়া, বুক দিয়া, তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত— বিশেষত, নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণাপ্রকাশ-পূর্বক জর্জরচিত্তে গর্জন করিয়া উঠিত, তখন শশী যেন অপরাধিনীর মতো সংকুচিত শশব্যস্ত হইয়া পড়িত; তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া একান্ত সানুনয় স্নেহের স্বরে "সোনা আমার, ধন আমার, মানিক আমার" বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। পূর্বে এরূপ স্থলে শশী নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্তন হইল। এখন সর্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায় শশীর বক্ষে শেলের মতো বাজিত; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্ট দিয়া, খেলেনা দিয়া, আদর করিয়া, চুমো খাইয়া, শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনাবিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলত দেখা গেল, শশী নীলমণিকে যতই ভালোবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়, আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে শশী তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জয়গোপাল লোকটা কখনও তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনোরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশী নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে; কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল।

এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দুঃসহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত, বিধাতা যেন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড়ো বুদ্‌বুদ্‌ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত, ছেলেটি এইরূপ বুদ্‌বুদের মতোই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেক দিন পর্যন্ত সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষণ্ন গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বৎসরে পা দিল।

কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশী ভাইফোঁটা দিতেছেন, এমন সময়ে পূর্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশীর সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোনো ফল নাই।

শুনিয়া শশী বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শুনিতে পাইল, তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া, নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া, তাহার স্বামীর পিসতুতো ভাইয়ের নামে বেনামি করিয়া কিনিতেছে।

শুনিয়া শশী অভিশাপ দিল, যাহারা এত বড়ো মিথ্যাকথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল, "আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জো নাই। উপেন আমার আপন পিসতুতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম—সে কখন গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিলপুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে, আমি জানিতেও পারি নাই।"

শশী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নালিশ করিবে না?"

জয়গোপাল কহিল, "ভাইয়ের নামে নালিশ করি কী করিয়া। এবং নালিশ করিয়াও তো কোনো ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।"

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশীর পরম কর্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সুখের সংসার, এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত, হঠাৎ দেখিল, সে একটা নিষ্ঠুর ফাঁদ—তাহাদের দুটি

ভাই-বোনকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কূলকিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় এবং বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যদি উপায় জানিত তবে লাটসাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন-কি, মহারানীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারানী কথনোই নীলমণির বার্ষিক সাত শত আটান্ন টাকা মুনাফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইরূপে শশী যখন একেবারে মহারানীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিসতুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায় চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপ-সহকারে মূর্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশী ভালো ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল কহিল, "কেন, মতিলাল মন্দ ডাক্তার কি।"

শশী তখন তাহার পায়ে পড়িল, মাথার দিব্য দিল; জয়গোপাল বলিল, "আচ্ছা, শহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতেছি।"

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া, বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে, এমন-কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল, শহরে ডাক্তারবাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ইহাও বলিল, "মকদ্দমা-উপলক্ষে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে; আমি মতিলালকে বলিয়া গেলাম, সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।"

রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশী কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একেবারে শহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতেই আছেন, শহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্র-স্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীন বিধবার তত্ত্বাবধানে শশীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল।

স্ত্রী কহিল, "আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না; তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও; উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই, আমি উহাকে রক্ষা করিব।"

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, "তবে এইখানেই থাকো, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।"

শশী তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "ঘর তোমার কি? আমার ভাইয়ের তো ঘর।"

জয়গোপাল কহিল, "আচ্ছা, সে দেখা যাইবে।"

পাড়ার লোকে এই ঘটনায় কিছু দিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল।

প্রতিবেশিনী তারা কহিল, "স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বসিয়া কর্-না বাপু; ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কী। হাজার হউক, স্বামী তো বটে।"

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া, গহনাপত্র বেচিয়া শশী তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড়ো জোত ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানারূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে, সেই জোতটা জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের, তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি করুণস্বরে বলিতে লাগিল, "দিদি, বাড়ি চলো।" সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে। তাই বারম্বার বলিল, "দিদি, আমাদের সেই ঘরে চলো না দিদি!" শুনিয়া দিদি কেবলই কাঁদিতে লাগিল—"আমাদের ঘর আর কোথায়।"

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোনো ফল নাই, তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিয়া শশী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিণীবাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল।

ডেপুটিবাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয়-সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, ইহাতে শশীর প্রতি তিনি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালক-সহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী-স্ত্রীতে দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর পুনশ্চ এই দ্বিতীয়বার মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড়ো আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শীতকালে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব মফস্বল-পর্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শিকার-সন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্যশ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্তনপূর্বক নখী দন্তী শৃঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু, সুগম্ভীর-প্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতূহলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পাঠশালায় পড়?"

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ পুস্তক পড়িয়া থাক।"

নীলমণি পুস্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যান্টলুন পাগড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিস্ট্রেটকে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যর্থী চাপরাসি কনস্টেবলে চারি দিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাঁবুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্প্‌ টেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল এবং মনে করিতেছিল, 'এই সময়ে চক্রবর্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় তো বেশ হয়।'

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা করো।"

সাহেব তাঁহার সেই পূর্বপরিচিত বৃহৎমস্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রস্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, "আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।"

স্ত্রীলোকটি কহিল, "আমার যাহা বলিবার আছে আমি এইখানেই বলিব।" জয়গোপাল বিবর্ণমুখে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারি দিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উঁচাইবা মাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশী তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিস্ট্রেট রক্তবর্ণমুখে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "চুপ রও" এবং বেত্রাগ্র দ্বারা তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশীর প্রতি গর্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশীর কথা শেষ হইলে ম্যাজিস্ট্রেট জয়গোপালকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "বাছা, এ মকর্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এ সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার।"

শশী কহিল, "সাহেব, যত দিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায় তত দিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।"

সাহেব কহিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে।"

শশী কহিল, "আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোনো ভাবনা নাই।"

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায়-মাদুলি-পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙালির ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশী বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, "বাবা, তোমার কোনো ভয় নেই—এসো।"

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে শশী কহিল, "লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই—আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে।"

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া, কোনোমতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে "দিদি গো দিদি" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল—শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণহস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণহৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

কিন্তু, এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে "চুপ চুপ" করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশী ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল, আবার দেখা হইবে। সে কথা কোন্‌খানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

চৈত্র ১৩০১

মানভঞ্জন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকায় সর্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করে। শয়নকক্ষের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপফুলের গাছ— ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা— বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইঁট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ -বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাঁধানো এন্‌গ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে ; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে তাহা দেয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্যে ন্যূন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, 'ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারি দিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।'

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছ্বাসে আপনি আদ্যোপান্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে— তাহার বসনে ভূষণে, গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুরনিক্কণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্র ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খলভাবে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্বাঙ্গের এই উচ্ছলিত মদির রসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙিন বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাতের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোন্‌-এক অশ্রুত অব্যক্ত সংগীতের তালে তালে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গীতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহার যেন বিশেষ কী-এক আনন্দ আছে; সে যেন আপন সৌন্দর্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্বাঙ্গের উত্তপ্ত রক্তস্রোতে অপূর্ব পুলক-সহকারে বিচিত্র আঘাত প্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণবাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়— অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে, তাহার অঞ্চল বিস্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার সুললিত বাহুর ভঙ্গীটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখির মতো অনন্ত আকাশে মেঘরাজ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় ; চরণাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জগৎটা একবার চট্‌ করিয়া দেখিয়া লয়— আবার ঘুরিয়া আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা ঝিন্‌ ঝিন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠে। হয়তো আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে; চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল

বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দদন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে. চুল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়—তখন সে আলস্যভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পত্রান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মতো বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনিগৃহে তাহার কোনো কাজকর্মও নাই—সে কেবল নির্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে, কিন্তু স্বামী তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরঞ্চ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইস্কুল পালাইয়া, তাহার সুপ্ত অভিভাবকদিগকে বঞ্চনা করিয়া, নির্জন মধ্যাহ্নে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও শৌখিন চিঠির কাগজে স্ত্রীর সহিত চিঠিপত্র-লেখালেখি করিত। ইস্কুলের বিশেষ বন্ধুদিগকে সেই-সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব অনুভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে স্ত্রীর সহিত মান-অভিমানেরও অসম্ভাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে—কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিত্বের একটা উত্তেজনা আছে ; মানুষের কাছে মানুষের নেশাটা অত্যন্ত বেশি। অসংখ্য মনুষ্যজীবন এবং সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে-একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল—একটি ছোটো বৈঠকখানার ছোটো কর্তাটিরও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অল্পতর পরিমাণে সেই এক-জাতীয়। সামান্য ইয়ার্কি-বন্ধনে আপনার চারি দিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ারমণ্ডলী সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায় ; সেজন্য অনেক লোক বিষয়-নাশ, ঋণ, কলঙ্ক, সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্তি, নব নব গৌরবলাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ। সেই গর্বে, সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমস্ত সুখ দুঃখ কর্তব্যের প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রিদিন আবর্তের মতো পাক খাইয়া-খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ দিকে জগজ্জয়ী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপুরের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়নগৃহের শূন্য সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত, বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন—সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জগৎখানি দেখা যাইতেছে সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে—অথচ বিশ্ব-সংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি সুরসিকা দাসী আছে, তাহার নাম সুধো, অর্থাৎ সুধামুখী ; সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রভুপত্নীর রূপের ব্যাখ্যা করিত ; এবং অরসিকের হস্তে এমন রূপ নিষ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালার যখন-তখন এই সুধোকে নহিলে চলিত না। উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া সে নিজের মুখের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শুনিত ; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত এবং পরমপুলকিতচিত্তে সুধোকে মিথ্যাবাদিনী চাটুভাষিণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না—সুধো তখন শত শত শপথ-সহকারে নিজের মতের অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন হইত না।

সুধো গিরিবালাকে গান শুনাইত—'দাসখত দিলাম লিখে শ্রীচরণে' ; এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলক্তাঙ্কিত অনিন্দ্যসুন্দর চরণপল্লবের স্তব শুনিতে পাইত এবং একটি পদলুণ্ঠিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদিত হইত। কিন্তু হায়, দুটি শ্রীচরণ মলের শব্দে শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝংকৃত করিয়া বেড়ায়, তবু কোনো স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখত লিখিয়া দিয়া যায় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে তাহার নাম লবঙ্গ—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে স্টেজের উপর চমৎকার মূর্ছা যাইতে পারে—সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনির স্বরে হাঁপাইয়া-হাঁপাইয়া টানিয়া-টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে "প্রাণনাথ" "প্রাণেশ্বর" করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে তখন পাৎলা ধুতির উপর ওয়েস্ট্‌কোট-পরা, ফুল্‌মোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী "এক্সেলেন্ট্‌" "এক্সেলেন্ট্‌" করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবঙ্গের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপূর্বে অনেকবার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনও তাহার স্বামী সম্পূর্ণরূপে পলাতক হয় নাই। তখন সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অসূয়া অনুভব করিত। আর কোনো নারীর এমন কোনো মনোরঞ্জিনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সাসূয় কৌতূহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না।

অবশেষে সে একদিন টাকা দিয়া সুধোকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল ; সুধো আসিয়া নাসা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রামনাম উচ্চারণ-পূর্বক অভিনেত্রীদিগের ললাটদেশে সম্মার্জনীর ব্যবস্থা করিল—এবং তাহাদের কদর্য মূর্তি ও কৃত্রিম ভঙ্গীতে যে-সমস্ত পুরুষের অভিরুচি জন্মে, তাহাদের সম্বন্ধেও সেই একই রূপ বিধান স্থির করিল। শুনিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিন্ন করিয়া গেল তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুঁইয়া বারম্বার কহিল, বস্ত্রখণ্ডাবৃত দগ্ধকাষ্ঠের মতো তাহার নীরস এবং কুৎসিত চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণী শক্তির কোনো কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশি। তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে-এক মৃদু কম্পন

উপস্থিত হইয়াছিল সেই কল্পনাবেগে এই আলোকময় লোকময় বাদ্যসংগীতমুখরিত দৃশ্যপটশোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীরবেষ্টিত নির্জন নিরানন্দ অন্তঃপুর হইতে এ কোন্-এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল! সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেদিন 'মানভঞ্জন' অপেরা অভিনয় হইতেছে। কখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চঞ্চল দর্শকগণ মুহূর্তে স্থির নিস্তব্ধ হইয়া বসিল, রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবর্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল সুসজ্জিত নটী ব্রজাঙ্গনা সাজিয়া সংগীতসহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া-থাকিয়া ধ্বনিত কম্পিত হইয়া উঠিল— তখন গিরিবালার তরুণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সংগীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল— মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোনো বাধামাত্র নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্বরে কানে কানে বলে, "বউঠাকরুন, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চলো। দাদাবাবু জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না।" গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত্র ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হইল। রাধার দুর্জয় মান হইয়াছে; সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না; কত অনুনয়বিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি, কিছুতেই কিছু হয় না। তখন গর্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখনও এমন করিয়া সাধে নাই; সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব মোহে স্থির করিল যে এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সৌন্দর্যের যে কেমন দোর্দণ্ড-প্রতাপ তাহা সে কানে শুনিয়াছে, অনুমান করিয়াছে মাত্র— আজ দীপের আলোকে, গানের সুরে, সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে যবনিকাপতন হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল; গিরিবালা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে এ কথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল, অভিনয় বুঝি ফুরাইবে না। যবনিকা আবার উঠিবে; রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, ইহা ছাড়া আর কোনো বিষয় উপস্থিত নাই। সুধো কহিল, "বউঠাকরুন, করো কী, ওঠো, এখনই সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।"

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্ মিট্ করিতেছে— ঘরে একটি লোক নাই শব্দ নাই— গৃহপ্রান্তে নির্জন শয্যার উপরে একটি পুরাতন মশারি বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্যময় আলোকময় সংগীতময় রাজ্য— যেখানে সে আপনার সমস্ত মহিমা বিকীর্ণ

করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে, যেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে।

এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে, তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল— এখন সে নটনটীদের মুখের রঙচঙ, সৌন্দর্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল, কিন্তু তবু তাহার নেশা ছুটিল না। রণসংগীত শুনিলে যোদ্ধার হৃদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ-যে সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা স্বর্ণলেখায় অঙ্কিত, চিত্রপটে সজ্জিত, কাব্য এবং সংগীতের ইন্দ্রজালে মায়ামণ্ডিত, অসংখ্য মুগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত, নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্বরহস্যপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোক-মালায় সর্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত— বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়া-সিংহাসন আর কোথায় আছে।

প্রথমে যেদিন সে তাহার স্বামীকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যখন গোপীনাথ কোনো নটীর অভিনয়ে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জর্জরিতচিত্তে মনে করিল, যদি কখনও এমন দিন আসে যে তাহার স্বামী তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মতো তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণনখরের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে, তবেই তাহার এই ব্যর্থ রূপ ব্যর্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শুভদিন আসিল কই। আজকাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দুর্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে ধূলিধ্বজের মতো একটা দল পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বাসন্তী রঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণবাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাদের উপর বসিয়া ছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নূতন নূতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত। হীরামুক্তার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উন্মাদনা সঞ্চার করিত, ঝল্‌মল্‌ করিয়া রুনুঝুনু বাজিয়া তাহার চারি দিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চুনি ও মুক্তার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোল কোমল রক্তোৎপল-পদপল্লবে হাত বুলাইতেছিল এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, "আহা বউঠাকরুন, আমি যদি পুরুষমানুষ হইতাম তাহা হইলে এই পা দুখানি বুকে লইয়া মরিতাম।" গিরিবালা সগর্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, "বোধ করি বুকে না লইয়াই মরিতে হইত— তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম। আর বকিস নে। তুই সেই গানটা গা।"

সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—

দাসখত দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক বৃন্দাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর-সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া, উড়ানি উড়াইয়া, হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল— সুধো অনেকখানি জিভ কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল, তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মতো গুরুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না, শিখিপুচ্ছচূড়া পায়ের কাছে লুটাইল না, কেহ রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না "কেন পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদনশশী"। সংগীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "একবার চাবিটা দাও দেখি।"

এমন জ্যোৎস্নায়, এমন বসন্তে, এত দিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিথ্যা কথা! অভিনয়মঞ্চেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে— এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায় সেই লোকটি বসন্তনিশীথে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্ত্রীকে বলে, 'ওগো, একবার চাবিটা দাও দেখি'! তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি, তাহাতে কোনো মোহ নাই, মাধুর্য নাই— তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

এমন সময়ে দক্ষিনে বাতাস জগতের সমস্ত অপমানিত কবিত্বের মর্মান্তিক দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো হুহু করিয়া বহিয়া গেল— টব-ভরা ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল, গিরিবালার চূর্ণ অলক চোখে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বাসন্তী রঙের সুগন্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে-সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "চাবি দিব এখন, তুমি ঘরে চলো।" আজ সে কাঁদিবে কাঁদাইবে, তাহার সমস্ত নির্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, "আমি বেশি দেরি করিতে পারিব না— তুমি চাবি দাও।"

গিরিবালা কহিল, "আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্ত দিব— কিন্তু আজ রাত্রে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।"

গোপীনাথ বলিল, "সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।"

গিরিবালা বলিল, "তবে আমি চাবি দিব না।"

গোপী বলিল, "দিবে না বই-কি! কেমন না দাও দেখিব।" —বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল, চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙিয়া খুলিল ; তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কৌটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে— চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া, গদি উঠাইয়া, আলমারি ভাঙিয়া, নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল।

গিরিবালা প্রস্তরমূর্তির মতো শক্ত হইয়া দরজা ধরিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে আসিয়া বলিল, "চাবি দাও বলিতেছি, নহিলে ভালো হইবে না।"

গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার

হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্বত্র যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শুনা যাইত, তবে সেই চৈত্রমাসের সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্তস্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে!

অথচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব, এত অপমান, গিরিবালা সুধোর কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল রূপযৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া, সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না—পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোনো সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোনো সান্ত্বনা নাই।

গিরিবালা বলিল, "আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।" তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দূরে। সকলেই নিষেধ করিল—কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী নিষেধও শুনিল না, কাহাকে সঙ্গেও লইল না। এ দিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কত দিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গান্ধর্ব থিয়েটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে 'মনোরমা' নাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বাহবা দিত এবং স্টেজের উপর তোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখনও নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিঞ্চিৎ মত্তাবস্থায় গ্রীন্‌রুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কী-এক সামান্য কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোনো নটীকে গুরুতর প্রহার করিল। তাহার চীৎকারে এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল।

সেদিন অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে পুলিসের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইল। থিয়েটারওয়ালারা পূজার এক মাস পূর্ব হইতে নূতন নাটক 'মনোরমা'র অভিনয় খুব আড়ম্বর-সহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা শহরটাকে কাগজে মুড়িয়া ফেলিয়াছে; রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত নামাবলি পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অন্তর্ধান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অকূল পাথারে পড়িয়া গেল। কিছুদিন লবঙ্গের জন্য

অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নূতন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল— তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিদ্বেষে এবং কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরম্ভভাগে মনোরমা দীনহীনবেশে দাসীর মতো তাহার শ্বশুরবাড়িতে থাকে—প্রচ্ছন্ন বিনম্র সংকুচিত-ভাবে সে আপনার কাজকর্ম করে— তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থলোভে কোনো-এক লক্ষপতির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তখন দেখিতে পাইল— এও সেই মনোরমা, কেবল সেই দাসীবেশ নাই— আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে, তাহার নিরুপম সৌন্দর্য আভরণে ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়া দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশুকালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গৃহে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সন্ধান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহার স্বামীর সহিত পুনরায় নূতন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসরঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝল্‌মল্‌ করিয়া, রক্তাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্বচনীয় গর্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্রপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল— যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্‌বেলিত হইয়া প্রশংসার করতালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল— তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া "গিরিবালা" "গিরিবালা" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া স্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল— বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভঙ্গে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকগণ ইংরাজিতে বাংলায় "দূর করে দাও" "বের করে দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মতো ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, "আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব।"

পুলিস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কলিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

বৈশাখ ১৩০২

ঠাকুরদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নয়নজোড়ের জমিদারেরা এক কালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড়ো সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজা-রায়বাহাদুর খেতাব অর্জন করিতে অনেক খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাগ-সুপারিশের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখনও সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাবুরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোনো উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্যকিরণের অনুকরণে তাঁহারা সাচচা রুপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন, সেকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহুবর্তিকাবিশিষ্ট প্রদীপের মতো নিজের তৈল নিজে অল্প কালের ধুমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায়চৌধুরী সেই প্রখ্যাতযশ নয়নজোড়ের একটি নির্বাপিত বাবু। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল; ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাবুয়না গোটাকতক অসাধারণ শ্রাদ্ধশান্তিতে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয়-আশয় ঋণের দায়ে বিক্রয় হইল; যে অল্প অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পূর্বপুরুষের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেইজন্য নয়নজোড় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসবাবু কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন— পুত্রটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জন করিয়াছিলেন; তিনি কখনও হাঁটুর নিম্নে কাপড় পরিতেন না, কড়াক্রান্তির হিসাব রাখিতেন, এবং বাবু উপাধি -লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সেজন্য আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখাপড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান -রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি— শূন্যভাণ্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জ্বল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগজ আমার নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি সেই কারণেই কৈলাসবাবু তাঁহাদের পূর্বগৌরবের ফেল্‌-করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচৌড়া চেক চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাস-

বাবু বুঝি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম, অবজ্ঞার যোগ্য কে। যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অশ্রান্ত এবং সতর্ক বুদ্ধি-কৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া, সমস্ত অনুকূল অবসরগুলিকে আপনার আয়ত্তগত করিয়া একটি একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুচ্চ পিরামিড একাকী স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়।

তখন বয়স অল্প ছিল, সেইজন্য এইরূপ তর্ক করিতাম, রাগ করিতাম। এখন বয়স বেশি হইয়াছে; এখন মনে করি, ক্ষতি কী। আমার তো বিপুল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব। যাহার কিছু নাই, সে যদি অহংকার করিয়া সুখী হয়, তাহাতে আমার তো সিকি পয়সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সান্ত্বনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে, আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাসবাবুর উপর রাগ করিত না। কারণ এত বড়ো নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়াকর্মে সুখে দুঃখে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকেই দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিমুখে প্রিয়সম্ভাষণ করিতেন—যেখানে যাহার যে-কেহ আছে সকলেরই কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম লাভ করিত। এইজন্য কাহারও সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তরমালার সৃষ্টি হইত—"ভালো তো? শশী ভালো আছে? আমাদের বড়োবাবু ভালো আছেন? মধুর ছেলেটির জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম, সে এখন ভালো আছে তো? হরিচরণবাবুকে অনেককাল দেখি নি, তাঁর অসুখবিসুখ কিছু হয় নি? তোমাদের রাখালের খবর কী। বাড়ির এঁয়ারা সকলে ভালো আছেন?" ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড়চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মের্‌জাইটি চাদরটি জামাটি, এমন-কি বিছানায় পাতিবার একটি পুরাতন র‍্যাপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরঞ্চ, সমস্ত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া, ঝাড়িয়া, দড়িতে খাটাইয়া, ভাঁজ করিয়া, আলনায় তুলিয়া, পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখনই তাহাকে দেখা যাইত তখনই মনে হইত যেন তিনি সুসজ্জিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অল্পস্বল্প সামান্য আস্‌বাবেও তাঁহার ঘরদ্বার সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরও অনেক আছে।

ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতি পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আস্তিন বহু যত্নে ও পরিশ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড়ো বড়ো জমিদারি ও বহুমূল্যের বিষয়-সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোনার রেকাবি, একটি রুপার আলবোলা, একটি বহুমূল্য শাল ও সেকেলে জামাজোড়া ও পাগড়ি দারিদ্র্যের গ্রাস হইতে বহু চেষ্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোনো-একটা উপলক্ষ উপস্থিত হইলে এইগুলি বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জগদ্‌বিখ্যাত বাবুদের গৌরব রক্ষা হইত।

এ দিকে কৈলাসবাবু মাটির মানুষ হইলেও কথায় যে অহংকার করিতেন সেটা যেন পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্যবোধে করিতেন; সকল লোকেই তাহাতে প্রশ্রয় দিত

এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুরদামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্বদা বিস্তর লোকসমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাবস্থায় পাছে তাঁহার তামাকের খরচটা গুরুতর হইয়া উঠে এইজন্য প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই-এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, "ঠাকুরদামশায়, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখো দেখি, ভালো গয়ার তামাক পাওয়া গেছে।"

ঠাকুরদামশায় দুই-এক টান টানিয়া বলিতেন, "বেশ ভাই, বেশ তামাক!" অমনি সেই উপলক্ষে ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা ভরির তামাকের গল্প পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, সে তামাক কাহারও আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না।

সকলেই জানিত যে যদি কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চয় চাবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে, পুরাতন ভৃত্য গণেশ বেটা কোথায় যে কী রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইবে। এইজন্যই সকলেই এক বাক্যে বলিত, "ঠাকুরদামশায়, কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভালো।"

শুনিয়া ঠাকুরদা দ্বিরুক্তি না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, "সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বলো দেখি ভাই।"

অমনি সকলে বলিত, "সে একটা দিন ঠিক ক'রে দেখা যাবে।"

ঠাকুরদামশায় বলিতেন, "সেই ভালো, একটু বৃষ্টি পড়ুক, ঠাণ্ডা হোক, নইলে এ গরমে গুরুভোজনটা কিছু নয়।"

যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুরদাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত না; বরঞ্চ কথা উঠিলে সকলে বলিত, "এই বৃষ্টিবাদলটা না ছাড়লে সুবিধে হচ্ছে না।"

ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভালো দেখাইতেছে না এবং কষ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত, অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুক্ত বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ ছিল না—এমন-কি, আজ ছয়-সাত বৎসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মতো একটা বড়ো বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইল না—অবশেষে ঠাকুরদামশায় বলিতেন, "তা হোক ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সুখ। নয়নজোড়ে বড়ো বাড়ি তো পড়েই আছে, কিন্তু সেখানে কি মন টেঁকে।"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুরদাও জানিতেন যে, সকলে তাঁহার অবস্থা জানে এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব নয়নজোড়কে বর্তমান বলিয়া ভাণ করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন মনে মনে বুঝিতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দবশত।

কিন্তু আমার বিষম বিরক্তি বোধ হইত। অল্প বয়সে পরের নিরীহ গর্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গুরুতর অপরাধের তুলনায় নির্বুদ্ধিতাই সর্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাসবাবু ঠিক নির্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজোড়ের গৌরবপ্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সকলে তাঁহাকে ভালোবাসিয়া এবং আমোদ

করিয়া তাঁহার কোনো অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত, তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বপ্নেও সন্দেহ করিতেন না যে, অন্য কেহ এ-সকল কথা লেশমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক-এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃদ্ধ যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, সেই দুর্গটি দুই তোপে সর্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখিকে সুবিধামত ডালের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারির ইচ্ছা করে তাহাকে গুলি বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোন্মুখ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে—যে জিনিসটা প্রতি মুহূর্তে পড়ি-পড়ি করিতেছে, অথচ কোনো একটা-কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা-সাধন এবং দর্শকের মনে তৃপ্তিলাভ হয়। কৈলাসবাবুর মিথ্যাগুলি এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্বল, তাহা ঠিক সত্য-বন্দুকের লক্ষ্যের সামনে এমনি বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মুহূর্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত—কেবল নিতান্ত আলস্যবশত এবং সর্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে বোধ করি, কৈলাসবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক বিদ্বেষের আর-একটি গূঢ় কারণ ছিল। তাহা একটু বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়োমানুষের ছেলে হইয়াও যথাকালে এম. এ. পাস করিয়াছি, যৌবন সত্ত্বেও কোনোপ্রকার কুসংসর্গ কুৎসিত আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকদের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোনোপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজমুখে সুশ্রী বলিলে অহংকার হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাংলাদেশে ঘটকালির হাটে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশি তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাটে আমার সেই দাম আমি পুরা আদায় করিয়া লইব, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরম রূপবতী একমাত্র বিদুষী কন্যা আমার কল্পনায় আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিক্তি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যতা ওজন করিয়া লইতেছিলাম, কোনোটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয় নাই। অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে,

কী জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল—
অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।

কিন্তু বর্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দুর্লভ পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রস্তগণ প্রতিনিয়ত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার পূজা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক বা না হউক, এই পূজা আমার মন্দ লাগিত না। ভালো ছেলে বলিয়া কন্যার পিতৃগণের এই পূজা আমার উচিত প্রাপ্য স্থির করিয়াছিলাম। শাস্ত্রে পড়া যায়, দেবতা বর দিন আর না দিন, যথাবিধি পূজা না পাইলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। নিয়মিত পূজা পাইয়া আমারও মনে সেইরূপ অত্যুচ্চ দেবভাব জন্মিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুরদামশায়ের একটি পৌত্রী ছিল। তাহাকে অনেক বার দেখিয়াছি কিন্তু কখনও রূপবতী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কৈলাসবাবু লোক-মারফত অথবা স্বয়ং পৌত্রীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ আমি ভালো ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শুনিতে পাইলাম, আমার কোনো বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নজোড়ের বাবুরা কখনও কোনো বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকটে প্রার্থনা করে নাই— কন্যা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শুনিয়া আমার বড়ো রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল— কেবল ভালো ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়া ছিলাম।

যেমন বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে রাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃদ্ধকে শুদ্ধমাত্র নিপীড়ন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইত না— কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কৌতুকাবহ প্ল্যান মাথায় উদয় হইল যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিথ্যা কথার সৃজন করিত। পাড়ার একজন পেন্‌সন্‌ভোগী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় বলিতেন, “ঠাকুরদা, ছোটোলাটের সঙ্গে যখনই দেখা হয় তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের খবর না নিয়ে ছাড়েন না— সাহেব বলেন, বাংলাদেশে বর্ধমানের রাজা এবং নয়নজোড়ের বাবু এই দুটি মাত্র যথার্থ বনেদি বংশ আছে।”

ঠাকুরদা ভারি খুশি হইতেন, এবং ভূতপূর্ব ডেপুটিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন, “ছোটোলাট-সাহেব ভালো আছেন? তাঁর মেমসাহেব ভালো আছেন? তাঁর পুত্রকন্যারা সকলেই ভালো আছেন?” সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপূর্ব ডেপুটি নিশ্চয়ই জানিতেন, নয়নজোড়ের বিখ্যাত চৌঘুড়ি প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোটোলাট এবং বড়োলাট বদল হইয়া যাইবে।

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাসবাবুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপিচুপি বলিলাম, “ঠাকুরদা, কাল লেপ্টেনেন্ট্‌ গবর্নরের লেভিতে গিয়েছিলুম। তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের কথা পাড়াতে আমি বললুম, নয়নজোড়ের কৈলাসবাবু কলকাতাতেই আছেন; শুনে, ছোটোলাট এতদিন দেখা করতে আসেন নি বলে ভারি দুঃখিত হলেন—

বলে দিলেন, আজই দুপুরবেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।"

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত এবং আর কাহারও সম্বন্ধে হইলে কৈলাসবাবুও এ কথায় হাস্য করিতেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় বলিয়া এ সংবাদ তাঁহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বোধ হইল না। শুনিয়া যেমন খুশি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসাইতে হইবে, কী করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন—কী উপায়ে নয়নজোড়ের গৌরব রক্ষিত হইবে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কী করিয়া সেও এক সমস্যা।

আমি বলিলাম, "সেজন্য ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে একজন করিয়া দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটোলাট-সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ উপস্থিত না থাকে।"

মধ্যাহ্নে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রামগ্ন, তখন কৈলাসবাবুর বাসার সম্মুখে এক জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

তকমা-পরা চাপরাসি তাঁহাকে খবর দিল, "ছোটোলাট-সাহেব আয়া।" ঠাকুরদা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শুভ্র জামাজোড়া এবং পাগড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গণেশটিকেও তাঁহার নিজের ধুতি চাদর জামা পরাইয়া ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটোলাটের আগমন-সংবাদ শুনিয়াই হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কাঁপিতে-কাঁপিতে ছুটিয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং সন্নতদেহে বারম্বার সেলাম করিতে করিতে ইংরাজবেশধারী আমার এক প্রিয় বয়স্যকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকির উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটোলাটকে বসাইয়া উর্দুভাষায় এক অতিবিনীত সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন, এবং নজরের স্বরূপে স্বর্ণরেকাবিতে তাঁহাদের বহুকষ্টরক্ষিত কুলক্রমাগত এক আসরফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভৃত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আতরদান লইয়া উপস্থিত ছিল।

কৈলাসবাবু বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নজোড়ের বাড়িতে হুজুর-বাহাদুরের পদধূলি পড়িলে তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন—কলিকাতায় তিনি প্রবাসী—এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সর্ব বিষয়েই অক্ষম—ইত্যাদি।

আমার বন্ধু দীর্ঘ হ্যাট-সমেত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরাজি কায়দা-অনুসারে এরূপ স্থলে মাথায় টুপি না থাকিবার কথা, কিন্তু আমার বন্ধু ধরা পড়িবার ভয়ে যথাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টায় টুপি খোলেন নাই। কৈলাসবাবু এবং তাঁহার গর্বান্ধ প্রাচীন ভৃত্যটি ছাড়া আর সকলেই মুহূর্তের মধ্যে বাঙালির এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশ মিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন এবং পূর্বশিক্ষা-মত চাপরাসিগণ সোনার রেকাবিসুদ্ধ আসরফির মালা, চৌকি হইতে সেই শাল, এবং ভৃত্যের হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল—কৈলাসবাবু বুঝিলেন, ইহাই ছোটোলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুদ্ধ হাস্যাবেগে আমার পঞ্জর

বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্তী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম—এবং সেখানে হাসির উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ দেখি, একটি বালিকা তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িয়া দাঁড়াইল, এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রোষের গর্জন আনিয়া, আমার মুখের উপর সজল বিপুল কৃষ্ণচক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কহিল, "আমার দাদামশায় তোমাদের কী করেছেন—কেন তোমরা তাঁকে ঠকাতে এসেছ—কেন এসেছ তোমরা"—অবশেষে আর কোনো কথা জুটিল না, বাক্‌রুদ্ধ হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ! আমি যে কাজটি করিয়াছি তাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথায় আসে নাই—হঠাৎ দেখিলাম অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিয়াছি; হঠাৎ আমার কৃতকার্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, লজ্জায় এবং অনুতাপে পদাহত কুক্কুরের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কী দোষ করিয়াছিল। তাহার নিরীহ অহংকার তো কখনও কোনো প্রাণীকে আঘাত করে নাই। আমার অহংকার কেন এমন হিংস্রমূর্তি ধারণ করিল।

তাহা ছাড়া আর-একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমকে কোনো অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্নদৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্য-পদার্থের মতো দেখিতাম— ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম, এই গৃহকোণে ঐ বালিকামূর্তির অন্তরালে একটি মানবহৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখদুঃখ অনুরাগবিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ এক দিকে অজ্ঞেয় অতীত আর-এক দিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ নামক দুই অনন্ত রহস্যরাজ্যের দিকে পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক-চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য।

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রত্যুষে বৃদ্ধের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপিচুপি ঠাকুরদার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হস্তে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্তত করিতেছি, এমন সময় অদূরবর্তী ঘরে বৃদ্ধের সহিত বালিকার কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। বালিকা সুমিষ্ট সস্নেহ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "দাদামশায়, কাল লাট-সাহেব তোমাকে কী বললেন।" ঠাকুরদা অত্যন্ত হর্ষিতচিত্তে লাট-সাহেবের মুখে প্রাচীন নয়নজোড়-বংশের বিস্তর কাল্পনিক গুণানুবাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শুনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সকরুণ ছলনায় আমার দুই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম—অবশেষে ঠাকুরদা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারণার

রুমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম।

বর্তমান কালের প্রথানুসারে অন্য দিন বৃদ্ধকে দেখিয়া কোনোপ্রকার অভিবাদন করিতাম না— আজ তাঁহাকে প্রণাম কবিলাম। বৃদ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোটোলাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি পুলকিত হইয়া শতমুখে ছোটোলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে লাগিলেন— আমিও কোনো প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শুনিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকৌতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলজ্জমুখে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নজোড়ের বাবুদের সহিত আমাদের বংশমর্যাদার তুলনাই হইতে পারে না, তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ আমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন, “আমি গরিব— আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না ভাই— আমার কুসুম অনেক পুণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে।”

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম, তাঁহার মহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে তিনি গরিব, স্বীকার করিলেন যে আমাকে লাভ করিয়া নয়নজোড়-বংশের গৌরবহানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সৎপাত্র জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

প্রতিহিংসা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুকুন্দবাবুদের ভূতপূর্ব দেওয়ানের পৌত্রী, বর্তমান ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী অশুভক্ষণে বাবুদের বাড়িতে তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপূর্বকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।

এক্ষণে মুকুন্দবাবুও ভূতপূর্ব, তাঁহার দেওয়ান গৌরীকান্তও ভূতপূর্ব; কালের আহ্বান অনুসারে উভয়ের কেহই স্বস্থানে সশরীরে বর্তমান নাই। কিন্তু যখন ছিলেন তখন উভয়ের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের যখন কোনো জীবনোপায় ছিল না, তখন মুকুন্দলাল কেবলমাত্র মুখ দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয়সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মুকুন্দলাল ভুল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বল্মীক রচনা করে, স্বর্গকামী যেমন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, গৌরীকান্ত তেমনি করিয়া অশ্রান্ত যত্নে তিলে তিলে দিনে দিনে মুকুন্দলালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি কৌশলে আশ্চর্য সুলভ মূল্যে তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মুকুন্দলালের সম্পত্তিভুক্ত করিলেন, তখন হইতে মুকুন্দবাবুরা গণ্যমান্য জমিদার-শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যেরও উন্নতি হইল; অল্পে অল্পে তাঁহার কোঠাবাড়ি জোতজমা এবং পূজার্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এক কালে সামান্য তহশিলদার-শ্রেণীর ছিলেন, তিনিও সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভূতপূর্ব কালের ইতিহাস। বর্তমান কালে মুকুন্দবাবুর একটি পোষ্যপুত্র আছেন, তাঁহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গৌরীকান্তের সুশিক্ষিত নাতজামাই অম্বিকাচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার পুত্র রামকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না—সেইজন্য বার্ধক্যবশত নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন তখন পুত্রকে লঙ্ঘন করিয়া নাতজামাই অম্বিকাকে আপন কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্ম বেশ চলিতেছে; পূর্বের আমলে যেমন ছিল এখনও সকলই প্রায় তেমনি আছে, কেবল একটা বিষয়ে একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে—এখন প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কেবল কাজকর্মের সম্পর্ক, হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। পূর্বকালে টাকা সস্তা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছু সুলভ ছিল, এখন সর্বসম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে; নিতান্ত আত্মীয়ের ভাগেই টানাটানি পড়িয়াছে, তা বাহিরের লোকে পাইবে কোথা হইতে।

ইতিমধ্যে বাবুদের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে দেওয়ানজির পৌত্রী ইন্দ্রাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা। এখানে কতকগুলো বিচিত্রচরিত্র মানুষ একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ-বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র

অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃজিত হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই।

এই বউভাতের নিমন্ত্রণস্থলে, এই আনন্দকার্যের মধ্যে দুটি দুই রকমের মানুষের দেখা হইল, এবং দেখিতে-দেখিতে সংসারের অশ্রান্ত জালবুনানির মধ্যে একটা নূতন বর্ণের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা নূতন রকমের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলম্বে মনিববাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের স্ত্রী নয়নতারা যখন বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকর্মের ব্যস্ততা, শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুই-চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারও সন্তোষজনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ যদিও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। সে কারণটি এই—মুকুন্দবাবুরা প্রভু, ধনী বটেন, কিন্তু কুলমর্যাদায় গৌরীকান্ত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেষ্ঠতা ভুলিতে পারে না। সেইজন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয় এই ভয়ে সে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না।

একবার মুকুন্দ এবং গৌরীকান্ত বর্তমানেও কুলাভিমান লইয়া ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর বিপ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণী দেখিতে বড়ো সুন্দর। আমাদের ভাষায় সুন্দরীর সহিত স্থির-সৌদামিনীর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলেই খাটে না কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্যপাশে অতি অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিদ্ধ।

এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া মুকুন্দবাবু তাঁহার পোষ্যপুত্রের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গৌরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তিতে গৌরীকান্ত কাহারও নিকটে ন্যূন ছিলেন না; তিনি প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার যতই উন্নতি হউক এবং কর্তা তাঁহার প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহার যতই প্রশ্রয় দিন, তিনি কখনও ভ্রমেও, স্বপ্নেও প্রভুর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভুর সম্মুখে, এমন-কি, প্রভুর প্রসঙ্গে তিনি যেন সম্রত হইয়া পড়িতেন—কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। প্রভুভক্তির দেনা তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতেন, কুলমর্যাদার পাওনা তিনি ছাড়িবেন কেন! মুকুন্দলালের পুত্রের সহিত তিনি তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভৃত্যের এই কুলগর্ব মুকুন্দলালের ভালো লাগে নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবের দ্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে। গৌরীকান্ত যখন কথাটা সে ভাবে লইলেন না তখন মুকুন্দলাল কিছুদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকষ্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর এই বিমুখভাব গৌরীকান্তের বক্ষে মৃত্যুশেলের ন্যায় বাজিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পৌত্রীর সহিত এক পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাকে

ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদগর্বিত পিতামহের পৌত্রী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভুগৃহে গিয়া আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভুপত্নী নয়নতারার অন্তঃকরণে সুমধুর প্রীতিরস উদ্‌বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহুল্য। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগুলি স্পর্ধা নয়নতারার বিদ্বেষকষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিব-বাড়িতে এত ঐশ্বর্যের আড়ম্বর করিয়া প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কী আবশ্যক ছিল।

দ্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রূপের গর্ব। ইন্দ্রাণীর রূপটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তির এত অধিক রূপ থাকা অনাবশ্যক এবং অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু তাহার গর্বটা সম্পূর্ণ নয়নতারার কল্পনা। রূপের জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না, এইজন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীয়, ইন্দ্রাণীর দাম্ভিকতা, চলিত ভাষায় যাহাকে বলে দেমাক। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ছিল। অত্যন্ত প্রিয় পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সে কাহারও সহিত মাখামাখি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গায়ে পড়িয়া একটা সোরগোল করা, অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া, সেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না।

এইরূপ নানাপ্রকার অমূলক ও সমূলক কারণে নয়নতারা ক্রমশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক সূত্র ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে "আমাদের ম্যানেজারের স্ত্রী" "আমাদের দেওয়ানের নাতনি" বলিয়া বারম্বার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় মুখরা দাসীকে শিখাইয়া দিল— সে ইন্দ্রাণীর গায়ের উপর পড়িয়া সখীভাবে তাহার গহনাগুলি হাত দিয়া নাড়িয়া-নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল— কণ্ঠী এবং বাজুবন্দের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, এ কি গিল্‌টি-করা।"

ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীরমুখে কহিল, "না, এ পিতলের।"

নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কী করছ, এই খাবারগুলো হাটখোলার পালকিতে তুলে দিয়ে এসো-না।" অদূরে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রাণী কেবল মুহূর্তকালের জন্য তাহার বিপুলপক্ষ্মচ্ছায়াগভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া নয়নতারার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই নীরবে মিষ্টান্নপূর্ণ সরা খুরি তুলিয়া লইয়া হাটখোলার পালকির উদ্দেশে নীচে চলিল।

যিনি এই মিষ্টান্ন উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কেন ভাই কষ্ট করছ, দাও-না, ঐ দাসীর হাতে দাও।"

ইন্দ্রাণী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিল, "এতে আর কষ্ট কিসের।"

অপরা কহিলেন, "তবে ভাই, আমার হাতে দাও।"

ইন্দ্রাণী কহিল, "না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

বলিয়া, অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চ স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন, তেমনি অটল স্নিগ্ধভাবে ইন্দ্রাণী পালকিতে মিষ্টান্ন রাখিয়া

আসিল—এবং সেই দুই-মিনিট-কালের সংস্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনীগৃহ-বধূ এই স্বল্পভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মতো প্রাণের সখীত্ব স্থাপনের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে নয়নতারা স্ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনোটাকেই গায়ে বিঁধিতে দিল না— সকলগুলিই তাহার অকলঙ্ক সমুজ্জ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙিয়া-ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। তাহার গম্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার আক্রোশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিতে পারিয়া এক সময় অলক্ষে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাহারা শান্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়; অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞা-ভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনোদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দূরসম্পর্কের নিঃস্ব পিসতুতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়; সেই বামাচরণ এখন বিনোদের সেরেস্তায় একজন সামান্য কর্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনও মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য গৌরীকান্তকে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে ক্ষুদ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্‌ভতায় গৌরীকান্তের অন্তঃপুরে সকলেই আশ্চর্য এবং কৌতুকান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার সেই অকালপক্বতার নিকট মুখচোরা লাজুক ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গৌরীকান্ত এই মেয়েটির অনর্গল কথায়-বার্তায় এবং চেহারায় বড়োই খুশি হইয়াছিলেন, কিন্তু কুলের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকায় বামাচরণের সহিত ইহার বিবাহপ্রস্তাবে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারার বিবাহ হয়।

এই-সকল কথা মনে করিয়া ইন্দ্রাণী কোনো সান্ত্বনা পাইল না, বরং অপমান আরও বেশি করিয়া বাজিতে লাগিল। মহাভারতে-বর্ণিত শুক্রাচার্যদুহিতা দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার কথা মনে পড়িল। দেবযানী যেমন তাহার প্রভুকন্যা শর্মিষ্ঠার দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী যদি তেমনি করিতে পারিত তবেই যথোপযুক্ত বিধান হইত। এক সময় ছিল, যখন দৈত্যদের নিকট দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ন্যায় মুকুন্দবাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গৌরীকান্ত একান্ত আবশ্যক ছিলেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে মুকুন্দবাবুকে হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন— কিন্তু তিনিই মুকুন্দলালের বিষয়সম্পত্তিকে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আজ আর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রভুদের কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাড়ি

পরগনা তাহার পিতামহ অনায়াসে নিজের জন্যই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন—ইহা যে একপ্রকার দান করা সে কথা কি আজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে। 'আমাদেরই দত্ত ধনমানের গর্বে তোমরা আমাদিগকে আজ অপমান করিবার অধিকার পাইয়াছ' ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, তাহার স্বামী প্রভুগৃহের নিমন্ত্রণ ও তাহার পরে জমিদারি কাছারির সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া তাঁহার শয়নকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভৃতে খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, স্বামী-স্ত্রীর স্বভাব প্রায়ই একরূপ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাৎ কোনো কোনো স্থলে স্বামী-স্ত্রীর স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সমুচিত এবং সংগত বলিয়া বোধ হয় যে আমরা আশা করি, এই নিয়ম বুঝি অধিকাংশ স্থলেই খাটে। যাহা হউক, বর্তমান ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের সহিত ইন্দ্রাণীর দুই-একটা বিষয়ে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা যায়। অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক লোক নহেন। তিনি বাহিরে যান কেবলমাত্র কাজ করিতে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে পুরামাত্রায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাত্মীয়তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাঁহার কর্তব্য কর্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার ইন্দ্রাণী, ইহাতেই তাঁহার সমস্ত জীবন পর্যাপ্ত।

ভূষণের ছটা বিস্তার করিয়া যখন সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিল তখন অম্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কী-একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কী হয়েছে।"

ইন্দ্রাণী তাঁহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কী আর হবে। সম্প্রতি আমার স্বামীরত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।"

অম্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "সে তো আমার অগোচর নেই। তৎপূর্বে?"

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা খুলিতে খুলিতে বলিল, "তৎপূর্বে স্বামিনীর কাছ থেকে সমাদর লাভ হয়েছে।"

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমাদরটা কী রকমের।"

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ থেকে যে রকমের পাই ঠিক সে রকমের নয়।"

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর কাছে এ-সকল অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবে না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপূর্বে কখনও রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত, স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির সমুদয় স্বাভাবিক বন্ধন মোচন করিয়া ফেলিত—সেখানে লেশমাত্র আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অম্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "এখনই আমি কাজে ইস্তফা দিব।" তৎক্ষণাৎ তিনি বিনোদবাবুকে এক কড়া চিঠি

লিখিতে উদ্যত হইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চৌকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদুর-পাতা মেজের উপর স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহু রাখিয়া বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।"

অম্বিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।"

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়মৃণালে একটিমাত্র পদ্মের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তর হইতে সে যেমন স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিত্তসঞ্চিত অনেকগুলি ভাব সে অলক্ষে গ্রহণ করিয়াছিল। মুকুন্দলালের পরিবারের প্রতি গৌরীকান্তের যে-একটি অচল নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অর্পণ করা যে তাহাদের কর্তব্য, এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতি করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ের দৃঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টচিত্তে বিনোদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী যদিও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদবিহারীর কাজ ছাড়িয়া দিবে, এ তাহার কিছুতেই মনে লইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে কহিল, "বিনোদবাবুর তো কোনো দোষ নেই, তিনি এর কিছুই জানেন না— তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ ক'রে তুমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে কেন।"

শুনিয়া অম্বিকাবাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন ; নিজের সংকল্প তাঁহার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে। কিন্তু মনিব হোন আর যিনিই হোন, ওদের ওখানে আর কখনও তোমাকে পাঠাচ্ছি নে।"

এই অল্প একটু ঝড়েই সেদিনকার মতো মেঘ কাটিয়া গেল, গৃহ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, এবং স্বামীর বিশেষ আদরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিস্মৃত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিনোদবিহারী অম্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারির কাজ কিছুই দেখিতেন না। নিতান্তনির্ভর ও অতিনিশ্চয়তা -বশত কোনো কোনো স্বামী ঘরের স্ত্রীকে যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারির প্রতিও বিনোদের কতকটা সেই ভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারির আয় এতই নিশ্চিত এতই বাঁধা যে তাহাকে আয় বলিয়া বোধ হয় না— তাহা অভ্যস্ত, এবং তাহার কোনো আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ সুড়ঙ্গপথ অবলম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কুবেরের ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেইজন্য নানা লোকের পরামর্শে তিনি গোপনে নানাপ্রকার আজগবি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনও স্থির হইত, দেশের সমস্ত বাবলা গাছ জমা লইয়া গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করাইবেন; কখনও পরামর্শ হইত, সুন্দরবনের সমস্ত মধুচক্র তিনি আহরণ করিবেন; কখনও লোক পাঠাইয়া

পশ্চিম-প্রদেশের বনগুলি বন্দোবস্ত করিয়া হরীতকীর ব্যবসায় একচেটে করিবার আয়োজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা বুঝিতেন যে, অন্য লোক শুনিলে হাসিবে, সেইজন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষত অম্বিকাচরণকে তিনি একটু বিশেষ লজ্জা করিতেন; অম্বিকা পাছে মনে করেন, তিনি টাকাগুলো নষ্ট করিতে বসিয়াছেন, সেজন্য মনে মনে সংকুচিত ছিলেন। অম্বিকার নিকট তিনি এমন ভাবে থাকিতেন যেন অম্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কিছু বেতন পাইতেন।

নিমন্ত্রণের পরদিন হইতে নয়নতারা তাঁহার স্বামীর কানে মন্ত্র দিতে লাগিলেন— "তুমি তো নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অম্বিকা হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তুমি শিরোধার্য করিয়া লও; এ দিকে ভিতরে ভিতরে কী সর্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্ত্রী যা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল, এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনও চক্ষেও দেখি নাই। এ-সব গয়না সে পায় কোথা হইতে এবং এত দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জোরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনার বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজমুখে তাহার দাসীকে কী-সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দুর্বল প্রকৃতির লোক—এক দিকে সে পরের প্রতি নির্ভর না করিয়াও থাকিতে পারে না, অপর দিকে যে তাহার কানে যেরূপ সন্দেহ তুলিয়া দেয় সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মুহূর্তকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষত কাজ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনায় সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল—অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাস্তা সে জানে না। স্পষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই—মহা মুশকিল হইল।

অম্বিকাচরণের একাধিপত্যে কর্মচারীগণ সকলেই ঈর্ষান্বিত ছিল। বিশেষত গৌরীকান্ত তাঁহার যে দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় বামাচরণকে কাজ দিয়াছিলেন অম্বিকার প্রতি বিদ্বেষ তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অনুসারে সে নিজেকে অম্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অম্বিকা তাহার আত্মীয় হইয়াও কেবলমাত্র ঈর্ষাবশতই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তাহার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা আপনি জোগায় এই তাহার মত। বিশেষত ম্যানেজারের কাজকে সে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিত; বলিত, সেকালে রথের উপর যেমন ধ্বজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেইরূপ—ঘোড়া বেটা খাটিয়া মরে আর ধ্বজামহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেবল দর্পভরে দুলিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপূর্বে কাজকর্মের কোনো খোঁজখবর লইত না—কেবল যখন ব্যাবসা উপলক্ষে হঠাৎ অনেক টাকার প্রয়োজন হইত তখন গোপনে খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে। খাজাঞ্চি টাকার পরিমাণ বলিলে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া ফেলিত—যেন তাহা পরের টাকা। খাজাঞ্চি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত, তাহার পরে কিছুকাল ধরিয়া অম্বিকাবাবুর নিকট বিনোদ কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোনোমতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই আরাম বোধ করিত।

অম্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ, জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া, তহবিলে প্রায় আমানতি সদর-খাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতি খরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় ব্যয় হইয়া গেলে বড়োই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইত যে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার অবসর পাওয়া যাইত না ; পত্র লিখিলেও কোনো ফল হইত না—কারণ, লোকটার কেবল চক্ষুলজ্জা ছিল, আর কোনো লজ্জা ছিল না, এইজন্য সে কেবল সাক্ষাৎকারকে ডরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল তখন অম্বিকাচরণ বিরক্ত হইয়া লোহার সিন্দুকের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দুর্বলপ্রকৃতি যে, প্রভু হইয়াও স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোনোপ্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অম্বিকাচরণের বৃথা চেষ্টা। অলক্ষ্মী যাহার সহায় লোহার সিন্দুকের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে-সকল কথা পরে হইবে।

অম্বিকাচরণের কড়া নিয়মে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল তখন সে কিছু খুশি হইল। গোপনে একে একে নিম্নতন কর্মচারীদিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গৌরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপূর্বক পার্শ্ববর্তী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কখনও সে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং মকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপসের চেষ্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল, অম্বিকাচরণ নিশ্চয় অপর পক্ষ হইতে ঘুষ লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপস করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই—যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘুষ না লইয়া থাকিতে পারে ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইরূপে গোপনে নানা মুখ হইতে ফুৎকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহশিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপায় অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষুলজ্জা ; দ্বিতীয়ত আশঙ্কা, পাছে সমস্ত-অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তাহার কোনো অনিষ্ট করে।

অবশেষে নয়নতারা স্বামীর এই কাপুরুষতায় জ্বলিয়া পুড়িয়া বিনোদের অজ্ঞাতসারে একদিন অম্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন, "তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাও।"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে সে কথা অম্বিকা পূর্বেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন, সেজন্য নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য হন নাই ; তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান।"

বিনোদ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, কখনোই না।"

অম্বিকাচরণ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর কি আপনার কোনো

সন্দেহের কারণ ঘটেছে।"

বিনোদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কিছুমাত্র না।"

অম্বিকাচরণ নয়নতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিয়া আপিসে চলিয়া আসিলেন, বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছু দিন গেল।

এমন সময় অম্বিকাচরণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন। শক্ত ব্যামো নহে কিন্তু দুর্বলতাবশত অনেক দিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দেয় এবং অন্যান্য কাজের বড়ো ভিড়। সেইজন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ হঠাৎ আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই, এবং সকলেই বলিতে লাগিল, "আপনি বাড়ি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।"

অম্বিকাচরণ নিজের দুর্বলতার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া, ডেস্কে গিয়া বসিলেন। আমলারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অম্বিকাচরণ ডেস্ক্‌ খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কী" ; সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে কি ভূতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল, "আরে মশায়, আপনারা ন্যাকামি রেখে দিন। সকলেই জানেন, ওর কাগজপত্র বাবু নিজে তলব ক'রে নিয়ে গেছেন।"

অম্বিকা রুদ্ধ রোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন।"

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল, "সে আমরা কেমন ক'রে বলব।"

বিনোদ অম্বিকাচরণের অনুপস্থিতিসুযোগে বামাচরণের মন্ত্রণাক্রমে নূতন চাবি তৈয়ার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাইভেট ডেস্ক্‌ খুলিয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না— অম্বিকা অপমানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অম্বিকাচরণ ডেস্কে চাবি লাগাইয়া কম্পিতদেহে বিনোদের সন্ধানে গেলেন— বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে। সেখান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ দুর্বল-দেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্থিরসৌদামিনী আজ স্থির রহিল না— তাহার বক্ষ ফুলিতে লাগিল, বিস্ফারিত মেঘকৃষ্ণ চক্ষুপ্রান্ত হইতে উন্মুক্ত বজ্রশিখা সুতীব্র উগ্র জ্বালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই পুরস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল— তিনি যেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বিনোদ ছেলেমানুষ, দুর্বলস্বভাব, পাঁচ জনের কথা শুনে তার মন বিগড়ে গেছে।"

তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত চাপিয়া ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দুই চক্ষুর রোষদীপ্তি ম্লান করিয়া দিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় হইতে, সমস্ত অপমান হইতে দুই বাহুপাশে টানিয়া লইয়া

সে যেন তাহার হৃদয়দেবতাকে আপন হৃদয়মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়।

স্থির হইল অম্বিকাচরণ এখনই কাজ ছাড়িয়া দিবেন— আজ আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু এই তুচ্ছ প্রতিশোধে ইন্দ্রাণীর মন কিছুই সান্ত্বনা মানিল না। যখন সন্দিগ্ধ প্রভু নিজেই অম্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত, তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কী শাসন হইল। কাজে জবাব দিবার সংকল্প করিয়াই অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম সকল আরামবিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জ্বলিতে লাগিল।

পরিশিষ্ট

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, বাবুদের বাড়ির খাজাঞ্চি আসিয়াছে। অম্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক চক্ষুলজ্জাবশত খাজাঞ্চির মুখ দিয়া তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেইজন্য নিজেই একখানি ইস্তফাপত্র লিখিয়া খাজাঞ্চির হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাঞ্চি তৎসম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না করিয়া কহিল, "সর্বনাশ হইয়াছে।"

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।"

তদুত্তরে শুনিলেন, যখন হইতে অম্বিকাচরণের সতর্কতাবশত খাজাঞ্চিখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর আর-একটা ব্যাবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ চড়িয়া যাইতেছিল— ততই নূতন নূতন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ ঋণে নিমগ্ন হইয়াছে। অম্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই সুযোগে তহবিল হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাঁকাগাড়ি পরগনা অনেক কাল হইতে পার্শ্ববর্তী জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ; সে এ পর্যন্ত টাকার জন্য কোনোপ্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা সুদ জমিতে দিয়াছে, এখন সময় বুঝিয়া হঠাৎ ডিক্রি করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই তো বিপদ।

শুনিয়া অম্বিকাচরণ কিছু ক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আজ কিছুই ভেবে উঠতে পারছি নে— কাল এর পরামর্শ করা যাবে।"

খাজাঞ্চি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অম্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত্র চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপুরে আসিয়া অম্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইয়া কহিলেন, "বিনোদের এ অবস্থায় তো আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারি নে।"

ইন্দ্রাণী অনেক ক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো স্থির হইয়া রহিল। অবশেষে অন্তরের সমস্ত বিরোধদ্বন্দ্ব সবলে দমন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "না, এখন ছাড়তে পার না।"

তাহার পর 'কোথায় টাকা' 'কোথায় টাকা' করিয়া সন্ধান পড়িয়া গেল— যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপুর হইতে গহনাগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য অম্বিকা বিনোদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপূর্বে ব্যাবসা উপলক্ষে বিনোদ সে চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কখনও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া, অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগুলি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না ; তিনি মনে করিলেন, তাঁহার চারি দিক হইতে সকলই খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এখন এই গহনাগুলি তাঁহার একমাত্র শেষ অবলম্বনস্থল—এবং ইহা তিনি অন্তিম আগ্রহ-সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

যখন কোথা হইতেও কোনো টাকা পাওয়া গেল না তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-ভ্রূকুটির উপরে একটা তীব্র আনন্দের জ্যোতি পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার যাহা কর্তব্য তাহা তো করিয়াছ, এখন তুমি ক্ষান্ত হও ; যাহা হইবার তা হউক।"

স্বামীর অবমাননায় উদ্দীপ্ত, সতীর রোষানল এখনও নির্বাপিত হয় নাই দেখিয়া অম্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যায় বিনোদ তাঁহার উপরে এমন একান্ত নির্ভর করিয়াছে যে, তাহার প্রতি তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইয়াছে—এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার নিজের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিল, "ইহাতে আর তুমি হাত দিতে পারিবে না।"

অম্বিকাচরণ বড়ো ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আস্তে আস্তে বুঝাইবার যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাঁহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অম্বিকা কিছু বিমর্ষ হইয়া, গম্ভীর হইয়া, নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালায় স্তূপাকার করিল এবং সেই গুরুভার থালাটি বহু কষ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমাত্র স্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মাবধি বৎসরে বৎসরে অনেক বহুমূল্য অলংকার উপহার পাইয়া আসিয়াছে ; মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সন্তানহীন রমণীর ভাণ্ডারে অলংকাররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই সমস্ত স্বর্ণমাণিক্য স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, "আমার এই গহনাগুলি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উদ্ধার করিয়া আমি পুনর্বার তাঁহার প্রভুবংশকে দান করিব।"

এই বলিয়া সে সজল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মস্তক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলশুভ্রকেশধারী, সরলসুন্দরমুখচ্ছবি, শান্তস্নেহহাস্যময়, ধীপ্রদীপ্ত উজ্জ্বল-গৌরকান্তি বৃদ্ধ পিতামহ এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত আছেন, এবং তাহার নত মস্তকে শীতল স্নেহহস্ত রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্বাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগনা পুনশ্চ ক্রয় হইয়া গেলে, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিল ; আর তাহার মনে কোনো অপমান-বেদনা রহিল না।

আষাঢ় ১৩০২

ক্ষুধিত পাষাণ

আমি এবং আমার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথা-বার্তা শুনিয়া আরও ধাঁধা লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন-সকল অশ্রুতপূর্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ানরা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন-সকল গোপন মৎলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ-সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নব-পরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন : There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকম-সকম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষে কখনও বিজ্ঞান বলে, কখনও বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনও পার্সি বয়েত আওড়াইতে থাকে ; বিজ্ঞান বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনোরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন-কি, আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীর সহিত কোনো-এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু-একটা যোগ আছে— কোনো-একটা অপূর্ব ম্যাগনেটিজ্‌ম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন। আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছু খুশি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা-কী ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।—

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্পবয়স্ক ও মজবুত লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাশুল-আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড়ো রমণীয়। নির্জন পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপভ্রংশ) উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড় শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত-

প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে— নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধি জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া, কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া, সেতার কোলে, দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না— এখন ইহা আমাদের মতো নির্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ইচ্ছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন, কিন্তু কখনও এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না।" আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, "তথাস্তু।" এ বাড়ির এমন বদনাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া, অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া, রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহখানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানোও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল— কিন্তু আমি যেদিন সচেতনভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম ; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরামকেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তা নদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে ; ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল, তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়াযবনিকা পড়িয়া গেল— এখানে পর্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্যাস্তের সময় আলো-আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম— কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই, একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল—যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোনো মূর্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শতধারার মতো সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে এবং সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে একপ্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভয়ের কি আনন্দের কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল, ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না; মনে হইল, ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে—কিন্তু একান্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল, আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে, ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি—সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমোট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বলো আর সত্যই বলো, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে-এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড়ো আশঙ্কা হইল যে, হঠাৎ বুঝি নির্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন। আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্বনাশিনী এইবার বুঝি আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম, ভালো করিয়া আহার করিতে হইবে; শূন্য উদরেই সকল প্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুরঘৃতপক্ক মসলা-সুগন্ধি রীতি-মত মোগলাই খানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলা-টুপি পরিয়া, নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড়্ গড়্ শব্দে আপন তদন্তকার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট্ লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল, সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট্ অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতিবৃহৎ। তিন সারি বড়ো বড়ো থামের উপর কারুকার্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুলশূন্যতাভরে অহর্নিশি গম্ গম্ করিতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনও প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল, ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল— যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারি দিকের দরজা জানলা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম— ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখনও বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিকদোলকগুলির ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর-সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি— অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, 'অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চার শো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই, এ-সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে, আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনই আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প্ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি 'অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমুকনাথ বটে'; ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোনো মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি ও কবিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু এ

কথা নিশ্চয় সত্য যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চার শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্বক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপ্ত ক্যাম্প্‌টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত অরালী পর্বতের ঊর্ধ্বদেশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটি যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতিতুচ্ছ ক্যাম্প্‌খাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল-কালেক্টরকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল— ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম— ঘরে যে কোনো শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোনো যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসংকুচিত ম্লান-ভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না। তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চুপিচুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময়, প্রকাণ্ড-শূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনি -ময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না, তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত এবং সে-সকল ঘরে আমি কখনও যাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অদৃশ্য আহ্বানরূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেত-প্রস্তররচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগ্‌দাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো-এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দার সম্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে

আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া, দুই পা ছড়াইয়া দিয়া, বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না— কেবল জাফ্‌রান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটি-পরা দুইখানি সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল, নাশপাতি, নারাঙ্গি এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম্র আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম, অমনি সে চমকিয়া উঠিল— তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজেয় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্প্‌-খাটের উপরে ঘর্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি— ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচাঁদ জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে— এবং আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে প্রত্যুষের জনশূন্য পথে "তফাত যাও" "তফাত যাও" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের এক রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল— কিন্তু এখনও এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্তক্লান্তদেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম— আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং আঁট প্যাণ্ট্‌লুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া— ঢিলা পায়জামা, ফুল-কাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া বহু যত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহু-কুণ্ডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড়ো কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোনো-এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কী-যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ

দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্তের মধ্যে, এই ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ, ক্বচিৎ সুরভিজলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফ্‌রান রঙের পায়জামা, এবং দুটি শুভ্ররক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটি পরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্বক শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরানীর ছায়া আসিয়া পড়িল— পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু-তারকায় সুগভীর আবেগ-তীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুত বেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া— মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত ; আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম— আমার চারি দিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই অরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারম্বার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্ণে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম— কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না— কিন্তু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা দুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় শুস্তা নদীর বালি এবং অরালী পর্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ

খাটো কোর্তা এবং সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে— যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও— কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।'

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন্ বেদুয়িন দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সারঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার। দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেনশা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাব্‌শি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে!

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে; চাপরাসি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেইদিনই আমার জিনিসপত্র তুলিয়া আপিসঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম— মনে হইতে লাগিল, এখনই কোথায় যাইবার আছে— তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামতও আমার কাছে বেশি-কিছু বোধ হইল না—

যাহা-কিছু বর্তমান, যাহা-কিছু আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন অর্থহীন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্‌ চড়িয়া ছুটিলাম। দেখিলাম, টম্‌টম্‌ ঠিক গোধূলিমুহূর্তে আপনিই সেই পাষাণ-প্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জনা চাহিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্যমনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি ; বলি, 'হে বহ্নি, যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে। এবার তাহাকে মার্জনা করো, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, ভস্মসাৎ করিয়া ফেলো।'

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সেদিন অরালী পর্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল। জল স্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল ; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড়ো বড়ো শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিসঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম— একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়বদ্ধমুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনও সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও ফুলিয়া-ফুলিয়া ফাটিয়া-ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না, ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই ; কাহাকে সান্ত্বনা করিব। এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার। এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে।

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায় সব ঝুট হ্যায়।"

দেখিলাম, ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এই ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথা-নিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়তো ওই মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল,

এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ-রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহের আলি, ক্যা ঝুট হ্যায় রে?"

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারম্বার বলিতে লাগিল, "তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, "ইহার অর্থ কী আমায় খুলিয়া বলো।"

বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই : এক-সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত— সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই।"

বৃদ্ধ কহিল, "একটিমাত্র উপায় আছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি— কিন্তু তৎপূর্বে ওই গুলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয়বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনও ঘটে নাই।"

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল, গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্স্ট্ ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া স্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়াই 'হ্যালো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেন্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল ; গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

শ্রাবণ ১৩০২

অতিথি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণবালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমরা যাচ্ছ কোথায়।" প্রশ্নকর্তার বয়স পনেরো-ষোলোর অধিক হইবে না।

মতিবাবু উত্তর করিলেন, "কাঁঠালে।"

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁয়ে নাবিয়ে দিতে পার?"

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমার নাম তারাপদ।"

গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধুতি। অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত; কোনো শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে পূর্বজন্মে তাপস-বালক ছিল এবং নির্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালবাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, "বাবা, তুমি স্নান করে এসো, এইখানেই আহারাদি হবে।"

তারাপদ বলিল, "রসুন।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলালবাবুর চাকরটা ছিল হিন্দুস্থানী, মাছ-কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পটুতা ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্পকালের মধ্যেই সুসম্পন্ন করিল এবং দুই-একটা তরকারিও অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বোঁচকা খুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল; একটি ছোটো কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জিত পইতার গোছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকায় মতিবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাবুর স্ত্রী এবং তাঁহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়া ছিলেন। মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—মনে মনে কহিলেন, 'আহা, কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।'

যথাসময়ে মতিবাবু এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পড়িল। ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে; অন্নপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন, সে লজ্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল, তখন সে কোনো অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে অথচ এমন সহজে করে যে,

তাহাতে কোনোপ্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশমাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পরে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত-আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মা নাই?"

তারাপদ কহিল, "আছেন।"

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না?"

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন ভালোবাসবেন না।"

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে?"

তারাপদ কহিল, "তাঁর আরও চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।"

অন্নপূর্ণা বালকের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "ওমা, সে কী কথা। পাঁচটি আঙুল আছে ব'লে কি একটি আঙুল ত্যাগ করা যায়।"

তারাপদর বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল; মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন-কি, গুরুমহাশয়ও তাহাকে মারিত না—মারিলেও বালকের আত্মীয় পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনোই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুণ প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল, আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতরচিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদিতে লাগিল; তাহার বড়ো ভাই পুরুষ-অভিভাবকের কঠিন কর্তব্য পালন উপলক্ষে তাহাকে মৃদু রকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনুতপ্তচিত্তে বিস্তর প্রশ্রয় এবং পুরস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন-কি স্নেহবন্ধনও তাহার সহিল না; তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে। সে যখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্ দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীর তীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি-উপরি দুই-তিনবার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথমে সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্র-নির্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন-কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষত পুরমহিলাবর্গ যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনও সংগীতসভায় সে যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্ক-ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলই তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষপিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিম্‌ন্যাস্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ়মাসের অবসান পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই-তিন দল যাত্রা, পাঁচালি, কবি, নর্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোটো ছোটো নদী উপনদী দিয়া এক মেলা-অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিম্‌ন্যাস্টিকের দল এই পর্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানির সহিত মিলিয়া মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহলবশত এই জিম্‌ন্যাস্টিকের আশ্চর্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভালো বাঁশি বাজাইতে শিখিয়াছিল— জিম্‌ন্যাস্টিকের সময় তাহাকে দ্রুত তালে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সুরের বাঁশি বাজাইতে হইত— এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শুনিয়াছিল, নন্দীগ্রামের জমিদারবাবুরা মহাসমারোহে এক শখের যাত্রা খুলিতেছেন— শুনিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি-প্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারে অনেক কুৎসিত কথা সে সর্বদা শুনিয়াছে এবং

অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোনোপ্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই। সে এই সংসারে পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহলবশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এইজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলালবাবু তাহাকে বিনা প্রশ্নে, বিনা সন্দেহে, পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অন্নপূর্ণা পরম স্নেহে এই ব্রাহ্মণবালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীয়পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণ লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্‌বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরের অর্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী, এবং তাহার ঊর্ধ্বে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোনো-এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যোজাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো নির্বাক নীলাকাশের মুগ্ধ-দৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের খেত, গাঢ় শ্যামল আমনধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সংকীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারি দিকে সচলতা সজীবতা মুখরতা, এই ঊর্ধ্ব-অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল; অথচ সে এই চঞ্চল মানবকটিকে এক মুহূর্তের জন্যও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদীতীরে বাছুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাটুঘোড়া সম্মুখের দুই দড়ি-বাঁধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ্‌ করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষ জলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাঁধা মেছুনিরা চুপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ-সমস্তই সে চিরনূতন অশ্রান্ত কৌতূহলের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশ দাঁড়ি-মাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে

প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক, তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল— যখন যে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে তুমি কী খাও।"

তারাপদ কহিল, "যা পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।"

এই সুন্দর ব্রাহ্মণবালকটির আতিথ্যগ্রহণে ঔদাসীন্য অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড়ো ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোনো সন্ধান পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল, কিন্তু দুধ খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলালবাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; সে সংক্ষেপে বলিল, "আমার ভালো লাগে না।"

নদীর উপর দুই-তিনদিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া, বাজার-করা হইতে নৌকা-চালনা পর্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা ও তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোনো দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদর সকৌতূহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে-কোনো কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে ; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ— ভূত-ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই— সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।

এ দিকে অনেকদিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোনোপ্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পাঁচালি, কথকতা. কীর্তনগান, যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলালবাবু চিরপ্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রী-কন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন; কুশলবের কথার সূচনা হইতেছে, এমন সময়ে তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "বই রাখুন। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শুনে যান।"

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল; দাঁড়ি-মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল; হাস্য করুণা এবং সংগীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল— দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে-সকল নৌকা চলিতেছিল, তাহাদের আরোহীগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন।

সজলনয়না অন্নপূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করেন। মতিলালবাবু ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ছেলেটিকে যদি কোনোমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়।' কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশীর অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুশশী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিতৃমাতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড় পরা, চুল বাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল, কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন তাহার মায়ের ভয় হইত, পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ একবার চুলবাঁধাটা তাহার মনের মতো না হইল, তবে সেদিন যতবার চুল খুলিয়া যতরকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহা কান্নাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার এক-এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোনো আপত্তি থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বাধ্য হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীব্র বিদ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্বতোভাবে উদ্‌বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বোধ হয় না, দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদর বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্যসকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদর যে কোনো গুণ আছে ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল, তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যেদিন কুশলবের গান করিল সেদিন অন্নপূর্ণা মনে করিলেন, 'সংগীতে বনের পশু বশ হয়, আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে।' তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু, কেমন লাগল।" সে কোনো উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গিটিকে ভাষায় তর্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়, কিছুমাত্র ভালো লাগে নাই এবং কোনোকালে ভালো লাগিবে না।

চারুর মনে ঈর্ষার উদয় হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল-সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অন্নপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতিবাবু ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত; তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্যরসে

উচ্ছ্বলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষ-সরোদনে বলিত, "মা, তোমরা কী গোল করছ, আমার ঘুম হচ্ছে না।" পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সংগীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত।

এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া, বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। কেবল তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনুদেহখানি নানা সন্তরণভঙ্গিতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না; সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা একমনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নন্দীগ্রাম কখন ছাড়াইয়া গেল তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকাখানা কখনও পাল তুলিয়া, কখনও গুণ টানিয়া, নানা নদীর শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; নৌকারোহীদের দিনগুলিও এই-সকল নদী-উপনদীর মতো শান্তিময় সৌন্দর্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারও কোনোরূপ তাড়া ছিল না; মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেক ক্ষণ বিলম্ব হইত ; এ দিকে, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লিমন্দ্রিত খদ্যোতখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিনদশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌঁছিল। জমিদারের আগমনে বাড়ি হইতে পালকি এবং টাটুঘোড়ার সমাগম হইল এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক-বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণ্ঠিত কাকসমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই-সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসি বলিয়া দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্য-বন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য সত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয় হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মতো হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোনোপ্রকার বিশেষ সংস্কারের

স্বারা বন্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা, সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে অথচ জ্যাঠাও নহে, রাখালের সঙ্গে সে রাখাল অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে; ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে, "দাদাঠাকুর, একটু বসো তো ভাই, আমি আসছি"— তারাপদ অম্লানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান করিতেও সে মজবুত, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষা সে এখনও জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদর সুদূরে নির্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতদিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল।

বামুনঠাকরুনের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সেই চারুর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যেদিন দেখা করিতে আসিল সেদিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটু মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল তারাপদ-নামক তাহাদের নবার্জিত পরমরত্নটির আহরণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতূহল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুনঠাকরুনকে সে মাসি বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকে, যখন শুনিল তারাপদ কেবল যে বাঁশিতে কীর্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অনুরোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশি বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টক-শাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে, তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বিঁধিতে লাগিল। চারু জানিত, তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ— অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়, ইতরসাধারণে তাহার একটু-আধটু আভাসমাত্র পাইবে অথচ কোনোমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইবে এবং চারুশশীদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য দুর্লভ দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণবালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল। আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে। সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়।

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষশরে জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্বেগ কেন।— বুঝিবে কাহার সাধ্য।

সেইদিনই অপর একটা তুচ্ছ সূত্রে সোনামণির সহিত চারুর মর্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদর ঘরে গিয়া তাহার শখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার

উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নির্দয়ভাবে ভাঙিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশিধ্বংসকার্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয়মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, "চারু, আমার বাঁশিটা ভাঙছ কেন।" চারু রক্তনেত্রে রক্তিমমুখে "বেশ করছি, খুব করছি" বলিয়া আরও বার দুই-চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশিটি তুলিয়া উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখিল, তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চারুশশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কৌতূহলের ক্ষেত্র ছিল মতিলালবাবুর লাইব্রেরিতে ইংরাজি ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভালো করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদর এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাবু বলিলেন, "ইংরিজি শিখবে? তা হলে এ-সমস্ত ছবির মানে বুঝতে পারবে।" তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল, "শিখব।"

মতিবাবু খুব খুশি হইয়া গ্রামের এন্‌ট্রেন্স্‌ স্কুলের হেড্‌মাস্টার রামরতনবাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি-অধ্যাপনকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারাপদ তাহার প্রখর স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নূতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিল না; পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্বে নির্জন নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। পূর্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত—কিন্তু তদুপলক্ষে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জিদ ধরিয়া বসিল, "আমিও ইংরাজি শিখিব।" তাহার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালি কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন—কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য-

অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই স্নেহদুর্বল নিরুপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাস্টারের নিকট তারাপদর সহিত একত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্বর্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন-কি কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নূতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নূতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মুখস্থ করিত, ইহা সেই ঈর্ষাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালী ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন-কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিঁড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাত্ম্য সকৌতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষণ্ণমুখে বসিয়া ছিল; চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুরুঘুরু করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারম্বার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মুশকিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অনুতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোনো উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুকরা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল, "আমি আর কখনও খাতায় কালী মাখাব না।" লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেকপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুকরায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্ত কাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এ দিকে সংকুচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উঁকিঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। সখী চারুশশীর সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত, সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসংকোচে তারাপদর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সস্নেহে বলিত, "কী সোনা, খবর কী। মাসি কেমন আছে।"

সোনামণি কহিত, "অনেকদিন যাও নি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মার

কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।”

এমন সময় হয়তো হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, “অ্যাঁ সোনা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনই বাবাকে গিয়ে বলে দেব।” যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কী অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালোরূপে জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত সৃজন করিত; অবশেষে চারু যখন ঘৃণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শঙ্কিত পরাজিত হইয়া ব্যথিতচিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, “সোনা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন।” চারু সর্পিণীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত, “যাবে বইকি। তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাস্টারমশায়কে বলে দেব না?”

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই-একদিন সন্ধ্যার পর বামুনঠাকরুনের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মার মসলার বাক্সের চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করজোড়ে সানুনয়ে বারম্বার বলিতে লাগিল, “তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে যাও।” তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তারাপদ সংকটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, আর কখনও তাহাকে মুহূর্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায়, কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি-উপরি সে ভালোমানুষি করিতে থাকে, তখনই একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কী উপলক্ষে কোন্ দিক হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবারিবর্ষণ, তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমন করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনও কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ

হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়তদৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এ দিকে চারুর বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই-তিনটি ভালো ভালো সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহবয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন। তারাপদ ছেলেটি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনও হয়। তারাপদর কুলশীল কিছুই জানা নেই। আমার একটিমাত্র মেয়ে, আমি ভালো ঘরে দিতে চাই।"

একদিন রায়ডাঙার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল— কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙার দূতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আর দেখানো হইবে না। তাহারা ভাবিল, মেয়ের বুঝি কোনো-একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভালো; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরন্তপনা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জনীয় বোধ হউক শ্বশুরবাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী-পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বংশ ভালো কিন্তু দরিদ্র। তখন মতিবাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামার মতো তারাপদর পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনও রাগ, কখনও অনুরাগ, কখনও বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্যার নিভৃত শান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজকাল এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণবালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য-সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তির লঘুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষুন্ন

অব্যাহত -ভাবে কালস্রোতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, সে আজকাল এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বপ্নজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক-একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙিন। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ করিয়া সে আর পূর্বের মতো স্বভাবত পরিহাস করিতে পারিত না, দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গূঢ় পরিবর্তন, এই আবদ্ধ আসক্ত ভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মতো মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপত্রের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোটো ছোটো নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল এবং শুষ্ক নদীপথে গোরুর গাড়ি -চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন ক্ষোদিত হইতেছিল— এমন সময় একদিন পিতৃগৃহ-প্রত্যাগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্য-সহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল— উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারম্বার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটিরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল— শুষ্ক নির্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল— বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সংগীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণ জলরথে চড়িয়া এই গ্রামকন্যাকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময়ে কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাত্রার দল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা-অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্সর্টের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে, যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে, পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সংগীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে— উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—

পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা—চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারি কাছারির ঘাটে লাগিল এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ত এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল—কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তি-বিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

ইচ্ছাপূরণ

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেইজন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড় চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন, সেদিন তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেকগুলা কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধুমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কী রে, বিছানায় পড়ে আছিস যে। আজ ইস্কুলে যাবি নে?"

সুশীল বলিল, "আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, 'রোসো, একে আজ জব্দ করতে হবে।' এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজঞ্জুস কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুশকিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্জুস সে যেমন ভালোবাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত। ও দিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন সুশীল বিছানা হইতে ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।"

বাবা বলিলেন, "না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক্।" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্তদিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল যে, 'আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই

করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।’

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, ‘আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম পড়াশুনো কিছু হল না। আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই তা হলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো করে নিই।’

ইচ্ছাঠাকরুন সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, আচ্ছা, ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।” ছেলেকে গিয়া বলিলেন, “কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।” শুনিয়া দুইজনে ভারি খুশি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, খুব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে; মুখের গোঁফদাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধুতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে, হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত নাবিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারি দিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না; যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল, কাপড়চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে, ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে: কাঁচা-পাকা গোঁফে-দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না; মাথায় একমাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে, সামনে চুল নাই— পরিষ্কার টাক তক্ তক্ করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ-ওপাশ করিল; শেষকালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্ছা পাড়িয়া, দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাধুলোগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া, কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেকরকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালির

মতো তর্ তর্ করিয়া চড়িতে পারিত, আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কাঁচ ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়াকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল। চাকরকে বলিল, "ওরে, বাজার থেকে এক টাকার লজঞ্জুস কিনে আন্।"

লজঞ্জুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজঞ্জুস সাজানো দেখিত; দু-চার পয়সা যাহা পাইত, তাহাতেই লজঞ্জুস কিনিয়া খাইত; মনে করিত, যখন বাবার মতো টাকা হইবে, তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজঞ্জুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় একরাশ লজঞ্জুস কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজঞ্জুস কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল, এগুলো আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক; আবার তখনই মনে হইল, না কাজ নাই, এত লজঞ্জুস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।

কাল পর্যন্ত যে-সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে, আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল গোপাল অক্ষয় নিবারণ হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনই বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তদিন শান্ত শিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া, কেবলই বই লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন-কি সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" সুশীল রাগ করিয়া বলিত, "পারবে না বইকি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।"

বাস্তবিক সুশীল এতরকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি-গোলমালে তাহার পড়ার

ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা স্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের এক ঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়া সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল; মাস্টার রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াক্কড় ছিল। কারণ তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন তখন তাঁহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশি খাইলেই অম্বল হইত—সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে; সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্পবয়স হইয়া আজকাল তাঁহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত, পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে, তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলেরও বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমত যাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না। পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই, বাড়ি হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সর্দি হইয়া, কাশি হইয়া, গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া, তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁট, পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতেই দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাসমত, ভুলিয়া তক্তপোষ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলো টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্বের অভ্যাসমত দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ি আন্দিপিসির জলের কলসে হঠাৎ ঠন্ করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত—বুড়ামানুষের এই ছেলেমানুষি দুষ্টামি দেখিয়া, লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সে'ও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মতো বুড়া মনে করিয়া, যেখানে বুড়ামানুষেরা তাসপাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মতো কথা বলিত; শুনিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা, খেলা কর্ গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না" বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, "দাও তো. তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।" শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর একপায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে বেজা, কদিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।" নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত "আর বছর দশেক বাদে আসব এখন।" আবার এক-একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাসমত তাহার ছেলে

সুশীলকে গিয়া মারিত। সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, "পড়াশুনো করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে? একরত্তি ছেলে হয়ে বুড়োমানুষের গায়ে হাত তোল?" অমনি চারি দিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া, কেহ কিল কেহ চড় কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বুড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।"

সুশীলও প্রতিদিন জোড়হাত করিয়া বলে, "হে দেবতা, বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যেরকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন, উঁহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

তখন ইচ্ছাঠাকরুন আসিয়া বলিলেন, "কেমন, তোমাদের শখ মিটিয়াছে?"

তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দোহাই ঠাকরুন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।"

ইচ্ছাঠাকরুন বলিলেন, "আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।"

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুইজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, "সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না?"

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।"

●

আশ্বিন ১৩০২

দুরাশা

দার্জিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিন্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুজ্ঝটিকায় মনে হইতেছে যেন বিধাতা হিমালয় পর্বত-সুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশূন্য ক্যাল্‌কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম— অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভালো লাগে না, শব্দস্পর্শরূপময়ী বিচিত্রা ধরণী-মাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদূরে রমণীকণ্ঠের সকরুণ রোদনগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রোগশোকসংকুল সংসারে রোদনধ্বনিটা কিছুই বিচিত্র নহে, অন্যত্র অন্য সময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে রোদন সমস্ত লুপ্ত জগতের একমাত্র রোদনের মতো আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম গৈরিকবসনাবৃতা নারী, তাহার মস্তকে স্বর্ণকপিশ জটাভার চূড়া-আকারে আবদ্ধ, পথপ্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তাহা সদ্যশোকের বিলাপ নহে, বহুদিনসঞ্চিত নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘান্ধকার নির্জনতার ভারে ভাঙিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গল্পের মতো আরম্ভ হইল; পর্বতশৃঙ্গে সন্ন্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে ইহা যে কখনও চর্মচক্ষে দেখিব এমন আশা কস্মিনকালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি, তোমার কী হইয়াছে।"

প্রথমে উত্তর দিল না, মেঘের মধ্য হইতে সজলদীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম, "আমাকে ভয় করিয়ো না। আমি ভদ্রলোক।"

শুনিয়া সে হাসিয়া খাস হিন্দুস্থানীতে বলিয়া উঠিল, "বহুদিন হইতে ভয়ডরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জাশরমও নাই। বাবুজি, একসময় আমি যে জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই।"

প্রথমটা একটু রাগ হইল; আমার চালচলন সমস্তই সাহেবি। কিন্তু এই হতভাগিনী বিনা দ্বিধায় আমাকে বাবুজি সম্বোধন করে কেন। ভাবিলাম, এইখানেই আমার

উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মতো সশব্দে সবেগে সদর্পে প্রস্থান করি। অবশেষে কৌতূহল জয়লাভ করিল। আমি কিছু উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্রগ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোনো প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী।"

বদ্রাওন কোন্ মুল্লুকে এবং নবাব গোলামকাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কী দুঃখে সন্ন্যাসিনীবেশে দার্জিলিঙে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিন্দুবিসর্গ জানি না এবং বিশ্বাসও করি না, কিন্তু ভাবিলাম রসভঙ্গ করিব না, গল্পটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণাৎ সুগম্ভীর মুখে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ করো, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না পারিবার অনেকগুলি যুক্তিসংগত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্বে কস্মিনকালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াশা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সন্তুষ্টকণ্ঠে দক্ষিণহস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে।"

দেখিলাম, রমণীটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই সিক্ত শৈবালাচ্ছন্ন কঠিনবন্ধুর শিলাখণ্ডতলে আসন গ্রহণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলামকাদের খাঁর পুত্রী নুরউন্নীসা বা মেহেরউন্নীসা বা নুর-উল্‌মুল্‌ক্ আমাকে দার্জিলিঙে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে তাঁহার অনতিদূরবর্তী অনতি-উচ্চ পঙ্কিল আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন। হোটেল হইতে ম্যাকিন্টশ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন সুমহৎ সম্ভাবনা আমার স্বপ্নেরও আগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপকাহিনী সহসা সদ্যসম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মতো শুনিতে হয়, পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জন গিরিকন্দরের নির্ঝরপ্রপাতধ্বনি এবং কালিদাস-রচিত মেঘদূত-কুমারসম্ভবের বিচিত্র সংগীতমর্মর জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে, তথাপি এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বুট এবং ম্যাকিন্টশ পরিয়া ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে কর্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানী রমণীর সহিত একত্র উপবেশন-পূর্বক সম্পূর্ণ আত্মগৌরব অক্ষুন্নভাবে অনুভব করিতে পারে এমন নব্যবঙ্গ অতি অল্পই আছে। কিন্তু সেদিন ঘনঘোর বাষ্পে দশ দিক আবৃত ছিল, সংসারের নিকট চক্ষুলজ্জা রাখিবার কোনো বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অনন্ত মেঘরাজ্যের মধ্যে বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী এবং আমি— এক নববিকশিত বাঙালি সাহেব— দুইজনে দুইখানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুইখণ্ড প্রলয়াবশেষের ন্যায় অবশিষ্ট ছিলাম, এই বিসদৃশ সম্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদৃষ্টের গোচর ছিল, কাহারও দৃষ্টিগোচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ হাল কে করিল।"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন, "কে এ-সমস্ত করায় তা আমি কি জানি! এতবড়ো প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেঘে অন্তরাল করিয়াছে।"

আমি কোনোরূপ দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম; কহিলাম, "তা বটে, অদৃষ্টের রহস্য কে জানে! আমরা তো কীটমাত্র।"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান এবং বেহারাদের সংসর্গে যেটুকু হিন্দি অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাতে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে বসিয়া বদ্রাওনের অথবা অন্য কোনো স্থানের কোনো নবাবপুত্রীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন-ইচ্ছা-বাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার জীবনের আশ্চর্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, যদি ফরমায়েস করেন তো বলি।"

আমি শশব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "বিলক্ষণ! ফরমায়েস কিসের। যদি অনুগ্রহ করেন তো শুনিয়া শ্রবণ সার্থক হইবে।"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এমনিভাবে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিয়াছিলাম, বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবিসাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্বরের মতো সোজা সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষায় সেরূপ সুসম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন সহজ শিষ্টতা আমার কোনোকালে জানা ছিল না; বিবিসাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিল্লির সম্রাটবংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল, পিতা ইতস্তত: করিতেছিলেন, এমন সময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহিলোকের সহিত সরকার-বাহাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।"

স্ত্রীকণ্ঠে, বিশেষ সম্ভ্রান্ত মহিলার মুখে হিন্দুস্থানী কখনও শুনি নাই, শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ ভাষা আমিরের ভাষা— এ যে দিনের ভাষা সে দিন আর নাই, আজ রেলোয়ে-টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাত্যের বিলোপে সমস্তই যেন হ্রস্ব খর্ব নিরলংকার হইয়া গেছে। নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ঘনকুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগলসম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল— শ্বেতপ্রস্তররচিত বড়ো বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালরখচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মস্‌লিনের প্রচুরপ্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরীর জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ— সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।

নবাবপুত্রী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম ছিল কেশরলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকণ্ঠের সমস্ত সংগীত যেন একেবারে এক মুহূর্তে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া-চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দু ছিল। আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম, কেশরলাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে জোড়করে ঊর্ধ্বমুখে নবোদিত সূর্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিক্তবস্ত্রে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সুকণ্ঠে ভৈরোঁরাগে ভজনগান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

আমি মুসলমানবালিকা ছিলাম কিন্তু কখনও স্বধর্মের কথা শুনি নাই এবং স্বধর্মসংগত উপাসনাবিধিও জানিতাম না; তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের পুরুষের মধ্যে ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তঃপুরের প্রমোদভবনেও ধর্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধকরি স্বাভাবিক ধর্মপিপাসা দিয়াছিলেন। অথবা আর-কোনো নিগূঢ় কারণ ছিল কি না বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যহ প্রশান্ত প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে নিস্তরঙ্গ নীল যমুনার নির্জন শ্বেত সোপানতটে কেশরলালের পূজার্চনাদৃশ্যে আমার সদ্যসুপ্তোত্থিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভক্তি-মাধুর্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনু দেহখানি ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত; ব্রাহ্মণের পুণ্যমাহাত্ম্য অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে এই মুসলমানদুহিতার মূঢ় হৃদয়কে বিনম্র করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দু বাঁদি ছিল, সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধূলি লইয়া আসিত, দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্ম-পার্বণ উপলক্ষে এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া বলিতাম, 'তুই কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিবি না?' সে জিভ কাটিয়া বলিত, 'কেশরলালঠাকুর কাহারও অন্নগ্রহণ বা দানপ্রতিগ্রহ করেন না।'

এইরূপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনোরূপ ভক্তিচিহ্ন দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের পূর্বপুরুষের কেহ-একজন একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই পুণ্যরক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম, এবং সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্যসম্বন্ধ কল্পনা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত আশ্চর্য কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত অপূর্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিতাম, শুনিয়া সেই অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দুজগতের এক অপরূপ দৃশ্য আমার মনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইত। মূর্তিপ্রতিমূর্তি, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত

দেবালয়, ধূপধুনার ধূম, অগুরুচন্দনমিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগীসন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্রলীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতি পুরাতন, অতি বিস্তীর্ণ, অতি সুদূর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত, আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দুসংসার আমার বালিকাহৃদয়ের নিকট একটি পরমরমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।

এমন সময় কোম্পানিবাহাদুরের সহিত সিপাহিলোকের লড়াই বাধিল। আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিপ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর-একবার হিন্দুস্থানে হিন্দুমুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।'

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন; তিনি ইংরাজ জাতিকে কোনো-একটি বিশেষ কুটুম্ব-সম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বলিলেন, 'উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাটুকু খোয়াইতে পারিব না, আমি কোম্পানি-বাহাদুরের সহিত লড়িব না।'

যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দুমুসলমানের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মতো সাবধানতায় আমাদের সকলের মনেই ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে ফৌজ লইয়া সশস্ত্র কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে বলিলেন, 'নবাবসাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন, তবে যতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।'

পিতা বলিলেন, 'সে-সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।'

কেশরলাল কহিলেন, 'ধনকোষ হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে হইবে।'

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না; কহিলেন, 'যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।'

আমার সীমন্ত হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যতকিছু ভূষণ ছিল সমস্ত কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দুকের চোঙ এবং পুরাতন তলোয়ারগুলি মাজিয়া ঘষিয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে জিলার কমিশনার-সাহেব লালকুর্তি গোরা লইয়া আকাশে ধুলা উড়াইয়া আমাদের কেল্লার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহ-সংবাদ দিয়াছিলেন।

বদ্রাওনের ফৌজের উপর কেশরলালের এমন একটি অলৌকিক আধিপত্য ছিল যে, তাঁহার কথায় তাহারা ভাঙা বন্দুক ও ভোঁতা তরবারি হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে

প্রস্তুত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মতো বোধ হইল। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমার ভীরু ভ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছদ্মবেশে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারও দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধুলা এবং বারুদের ধোঁয়া, সৈনিকের চিৎকার এবং বন্দুকের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল-আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। যমুনার জল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শুক্লপক্ষের পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দৃশ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে করুণায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিন স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, খুঁজিতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল, সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনার তীরে আম্রকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বুঝিতে পারিলাম, সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভু ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভুকে, রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুবিলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বারম্বার তাঁহার পদধুলি মুছিয়া লইলাম, আমার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবামাত্র বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উদ্বেল হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল, এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফুট আর্তস্বর শুনিয়া আমি তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম; শুনিলাম, নিমীলিত নেত্রে শুষ্ক কণ্ঠে একবার বলিলেন, 'জল'।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার গাত্রবস্ত্র যমুনার জলে ভিজাইয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমীলিত ওষ্ঠাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বামচক্ষু নষ্ট করিয়া তাঁহার কপালে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিক্ত বসনপ্রান্ত ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যমুনার জল আনিয়া তাঁহার মুখে চক্ষে সিঞ্চন করার পর অল্পে অল্পে চেতনার সঞ্চার হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর জল দিব?' কেশরলাল কহিলেন, 'কে তুমি।' আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'অধীনা আপনার ভক্ত সেবিকা। আমি নবাব গোলামকাদের খাঁর কন্যা।' মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসন্ন মৃত্যুকালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এ সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'বেইমানের কন্যা, বিধর্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি!' এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোলদেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন, আমি

ম্ছি্তপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি ষোড়শী, প্রথম দিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছি, তখনও বহিরাকাশের রুদ্ধ তপ্ত সূর্যকর আমার সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই, সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামাত্র সংসারের নিকট হইতে, আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলাম।"

আমি নির্বাপিত-সিগারেটে এতক্ষণ মোহমুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া ছিলাম। গল্প শুনিতেছিলাম কি ভাষা শুনিতেছিলাম কি সংগীত শুনিতেছিলাম জানি না, আমার মুখে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "জানোয়ার।"

নবাবজাদী কহিলেন, "কে জানোয়ার! জানোয়ার কি মৃত্যুযন্ত্রণার সময় মুখের নিকট সমাহৃত জলবিন্দু পরিত্যাগ করে।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, "তা বটে। সে দেবতা।"

নবাবজাদী কহিলেন, "কিসের দেবতা! দেবতা কি ভক্তের একাগ্রচিত্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।"

আমি বলিলাম, "তাও বটে।"

বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নবাবপুত্রী কহিতে লাগিলেন, "প্রথমটা আমার বড়ো বিষম বাজিল। মনে হইল, বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমার মাথার উপর চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম— মনে মনে কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই!

নবাবদুহিতাকে ভূলুণ্ঠিতমস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কী মনে করিল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার মুখে বিস্ময় অথবা কোনো ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্য আমার হস্ত প্রসারণ করিলাম, সে তাহা নীরবে প্রত্যাখ্যান করিল এবং বহু কষ্টে যমুনার ঘাটে গিয়া অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেয়ানৌকা বাঁধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না। সেই নৌকার উপর উঠিয়া কেশরলাল বাঁধন খুলিয়া দিল, নৌকা দেখিতে দেখিতে মধ্যস্রোতে গিয়া ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া গেল— আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিভার লইয়া সেই অদৃশ্য নৌকার অভিমুখে জোড়কর করিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই চন্দ্রালোকপুলকিত নিস্তরঙ্গ যমুনার মধ্যে অকালবৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের ঊর্ধ্বে আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ, সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল; সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ তিন ভুবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল

বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্যসুন্দর শান্তশীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহস্বপ্নাভিহতার ন্যায় যমুনার তীরে তীরে কোথাও-বা কাশবন, কোথাও-বা মরুবালুকা কোথাও-বা বন্ধুর বিদীর্ণ তট, কোথাও-বা ঘনগুল্মদুর্গম বনখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।"

এইখানে বক্তা চুপ করিল। আমিও কোনো কথা কহিলাম না।

অনেক ক্ষণ পরে নবাবদুহিতা কহিল, "ইহার পরে ঘটনাবলী বড়ো জটিল। সে কেমন করিয়া বিশ্লেষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়াছিলাম সে কি আর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, কোন্‌টা ত্যাগ করিব, কোন্‌টা রাখিব, সমস্ত কাহিনীকে কী উপায়ে এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়।

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে বুঝিয়াছি যে, অসাধ্য-অসম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপুরের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাল্পনিক; একবার বাহির হইয়া পড়িলেই একটা চলিবার পথ থাকেই। সে পথ নবাবি পথ নহে, কিন্তু পথ; সে পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে—তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, তাহা সুখে-দুঃখে বাধাবিঘ্নে জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাবদুহিতার সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না, হইলেও সে-সব কথা বলিবার উৎসাহ আমার নাই। এক কথায়, দুঃখকষ্ট বিপদ অবমাননা অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে, তবু জীবন অসহ্য হয় নাই। আতস-বাজির মতো যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়াছি। যতক্ষণ বেগে চলিয়াছিলাম ততক্ষণ পুড়িতেছি বলিয়া বোধ ছিল না, আজ হঠাৎ সেই পরম দুঃখের, সেই চরম সুখের আলোকশিখাটি নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রান্তের ধূলির উপর জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া গিয়াছি—আজ আমার যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাপ্ত।"

এই বলিয়া নবাবপুত্রী থামিল। আমি মনে মনে ঘাড় নাড়িলাম; এখানে তো কোনোমতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙা হিন্দিতে বলিলাম, "বেয়াদবি মাপ করিবেন, শেষ দিককার কথাটা আর-একটু খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।"

নবাবপুত্রী হাসিলেন। বুঝিলাম, আমার ভাঙা হিন্দিতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাস হিন্দিতে বাৎ চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লজ্জা ভাঙিত না, কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অল্পই জানি সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান, সেইটেই একটা আব্রু।

তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম

কিন্তু কোনোমতেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে অকস্মাৎ কখনও পূর্বে, কখনও পশ্চিমে, কখনও ঈশানে, কখনও নৈঋতে, বজ্রপাতের মতো মুহূর্তের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়া, মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দস্বামীকে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত, আমি ভক্তিভরে শাস্ত্র শিক্ষা করিতাম এবং মর্মান্তিক উদ্বেগের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্ত-রশ্মিতে ভারতবর্ষের দূরদূরান্তর হইতে যে-সকল বীরমূর্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।

তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবীবেশে আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে, তীর্থে তীর্থে, মঠে মন্দিরে ভ্রমণ করিয়াছি, কোথাও কেশরলালের কোনো সন্ধান পাই নাই। দুই-একজন যাহারা তাহার নাম জানিত, কহিল, 'সে হয় যুদ্ধে নয় রাজদণ্ডে মৃত্যু লাভ করিয়াছে।' আমার অন্তরাত্মা কহিল, 'কখনও নহে, কেশরলালের মৃত্যু নাই। সেই ব্রাহ্মণ, সেই দুঃসহ জ্বলদগ্নি কখনও নির্বাণ পায় নাই, আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনও কোনো দুর্গম নির্জন যজ্ঞবেদীতে ঊর্ধ্বশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।'

হিন্দুশাস্ত্রে আছে, জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে, মুসলমান ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে কথার কোনো উল্লেখ নাই, তাহার একমাত্র কারণ, তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম, কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে, কারণ তৎপূর্বে আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। একে একে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুষতেজে আমার সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তি লাভ করিলাম।

যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে কেশরলালের বীরত্বের কথা আমি অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু সে কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। আমি সেই-যে দেখিয়াছিলাম নিঃশব্দে জ্যোৎস্নানিশীথে নিস্তব্ধ যমুনার মধ্যস্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম, ব্রাহ্মণ নির্জন স্রোত বাহিয়া নিশিদিন কোন্ অনির্দেশ রহস্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে—তাহার কোনো সঙ্গী নাই, কোনো সেবক নাই, কাহাকেও তাহার কোনো আবশ্যক নাই, সেই নির্মল আত্মনিমগ্ন পুরুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আকাশের গ্রহচন্দ্রতারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমন সময় সংবাদ পাইলাম কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। আমি নেপালে গেলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম,

কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

তাহার পর পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে— ভুটিয়া-লেপ্‌চাগণ ম্লেচ্ছ, ইহাদের আহার-ব্যবহারে আচার-বিচার নাই, ইহাদের দেবতা, ইহাদের পূজার্চনাবিধি সকলই স্বতন্ত্র ; বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশুদ্ধ শুচিতা লাভ করিয়াছি, ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে সর্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম, আমার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতিদূরে।

তাহার পরে আর কী বলিব। শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যখন নেবে তখন একটি ফুৎকারেই নিবিয়া যায়, সে কথা আর সুদীর্ঘ করিয়া কী ব্যাখ্যা করিব।

আটত্রিশ বৎসর পরে এই দার্জিলিঙে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পাইয়াছি।"

বক্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী দেখিলেন।"

নবাবপুত্রী কহিলেন, "দেখিলাম, বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়াপল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্রপৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

গল্প শেষ হইল; আমি ভাবিলাম, একটা সান্ত্বনার কথা বলা আবশ্যক। কহিলাম, "আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজাতীয়ের সংস্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।"

নবাবকন্যা কহিলেন, "আমি কি তাহা বুঝি না। কিন্তু এতদিন আমি কী মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোলো বৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্নানিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগকম্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরুহস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে দ্বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম। হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর-এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "নমস্কার বাবুজি!"

মুহূর্তপরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল, "সেলাম বাবুসাহেব!" এই মুসলমান-অভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। আমি কোনো কথা না বলিতেই সে সেই হিমাদ্রিশিখরের ধূসর কুজ্‌ঝটিকারাশির মধ্যে মেঘের মতো মিলাইয়া গেল।

আমি ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত ঘটনাবলী মানসপটে চিত্রিত দেখিতে লাগিলাম। মছলন্দের আসনে যমুনাতীরের গবাক্ষে সুখাসীনা ষোড়শী নবাববালিকাকে

দেখিলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বিনীর ভক্তিগদগদ একাগ্র মূর্তি দেখিলাম, তাহার পরে এই দার্জিলিঙে ক্যাল্‌কাটা রোডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাচ্ছন্ন ভগ্ন-হৃদয়ভারকাতর নৈরাশ্যমূর্তিও দেখিলাম—একটি সুকুমার রমণীদেহে ব্রাহ্মণ-মুসলমানের রক্ততরঙ্গের বিপরীত সংঘর্ষজনিত বিচিত্র ব্যাকুল সংগীতধ্বনি সুন্দর সুসম্পূর্ণ উর্দুভাষায় বিগলিত হইয়া আমার মস্তিষ্কের মধ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্মল আকাশ ঝলমল করিতেছে, ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ু-সেবনে বাহির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুই-একটি বাঙালির গলাবন্ধবিজড়িত মুখমণ্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে।

দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম, এই সূর্যালোকিত অনাবৃত জগৎদৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরিপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিয়াছিলাম—সেই মুসলমানব্রাহ্মণী, সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনাতীরের কেল্লা কিছুই হয়তো সত্য নহে।

বৈশাখ ১৩০৫

পুত্রযজ্ঞ

বৈদ্যনাথ গ্রামের মধ্যে বিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমানের সমস্ত কাজ করিতেন। যখন বিবাহ করিলেন তখন তিনি বর্তমান নববধূর অপেক্ষা ভাবী নবকুমারের মুখ স্পষ্টতররূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। শুভদৃষ্টির সময় এতটা দূরদৃষ্টি প্রায় দেখা যায় না। তিনি পাকা লোক ছিলেন, সেইজন্য প্রেমের চেয়ে পিণ্ডটাকেই অধিক বুঝিতেন এবং পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা এই মর্মেই তিনি বিনোদিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সংসারে বিজ্ঞলোকও ঠকে। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াও যখন বিনোদিনী তাহার সর্বপ্রধান কর্তব্যটি পালন করিল না তখন পুন্নাম নরকের দ্বার খোলা দেখিয়া বৈদ্যনাথ বড়ো চিন্তিত হইলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্যই বা কে ভোগ করিবে এই ভাবনায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেই ঐশ্বর্য ভোগ করিতে একপ্রকার বিমুখ হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি বর্তমানের অপেক্ষা ভবিষ্যৎটাকেই তিনি সত্য বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু যুবতী বিনোদিনীর নিকট হঠাৎ এতটা প্রাজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না। সে বেচারার দুর্মূল্য বর্তমান, তাহার নববিকশিত যৌবন, বিনা প্রেমে বিফলে অতিবাহিত হইয়া যায় এইটেই তাহার পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয় ছিল। পারলৌকিক পিণ্ডের ক্ষুধাটা সে ইহলৌকিক চিত্তক্ষুধাদাহে একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছিল, মনুর পবিত্র বিধান এবং বৈদ্যনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাহার বুভুক্ষিত হৃদয়ের তিলমাত্র তৃপ্তি হইল না।

যে যাহাই বলুক এই বয়সটাতে ভালোবাসা দেওয়া এবং ভালোবাসা পাওয়াই রমণীর সকল সুখ এবং সকল কর্তব্যের চেয়ে স্বভাবতই বেশি মনে হয়।

কিন্তু বিনোদার ভাগ্যে নবপ্রেমের বর্ষাবারিসিঞ্চনের বদলে স্বামীর, পিস্‌শাশুড়ির এবং অন্যান্য গুরু ও গুরুতর লোকের সমুচ্চ আকাশ হইতে তর্জন-গর্জনের শিলাবৃষ্টি ব্যবস্থা হইল। সকলেই তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া অপরাধী করিত। একটা ফুলের চারাকে আলোক এবং বাতাস হইতে রুদ্ধঘরে রাখিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, বিনোদার বঞ্চিত যৌবনেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

সদাসর্বদা এই-সকল চাপাচুপি ও বকাবকির মধ্যে থাকিতে না পারিয়া যখন সে কুসুমের বাড়ি তাস খেলিতে যাইত সেই সময়টা তাহার বড়ো ভালো লাগিত। সেখানে পুৎনরকের ভীষণ ছায়া সর্বদা বর্তমান না থাকাতে হাসি-ঠাট্টা গল্পের কোনো বাধা ছিল না।

কুসুম যেদিন তাস খেলিবার সাথি না পাইত সেদিন তাহার তরুণ দেবর নগেন্দ্রকে ধরিয়া আনিত। নগেন্দ্র ও বিনোদার আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এ সংসারে এক হইতে আর হয় এবং খেলা ক্রমে সঙ্কটে পরিণত হইতে পারে এ-সব গুরুতর কথা অল্পবয়সে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।

এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রেরও আপত্তির দৃঢ়তা কিছুমাত্র দেখা গেল না, এখন আর সে তাস খেলিবার জন্য অধিক পীড়াপীড়ির অপেক্ষা করিতে পারে না।

এইরূপে বিনোদার সহিত নগেন্দ্রের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হইতে লাগিল।

নগেন্দ্র যখন তাস খেলিতে বসিত তখন তাসের অপেক্ষা সজীবতর পদার্থের প্রতি তাহার নয়নমন পড়িয়া থাকাতে খেলায় প্রায়ই হারিতে লাগিল। পরাজয়ের প্রকৃত কারণ বুঝিতে কুসুম এবং বিনোদার কাহারও বাকি রহিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, কর্মফলের গুরুত্ব বোঝা অল্প বয়সের কর্ম নহে। কুসুম মনে করিত এ একটা বেশ মজা হইতেছে, এবং মজাটা ক্রমে ষোলো-আনায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠে ইহাতে তাহার একটা আগ্রহ ছিল। (ভালোবাসার নবাঙ্কুরে গোপনে জলসিঞ্চন তরুণীদের পক্ষে বড়ো কৌতুকের।)

বিনোদারও মন্দ লাগিল না। (হৃদয়জয়ের সুতীক্ষ্ম ক্ষমতাটা একজন পুরুষ মানুষের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।)

এইরূপে তাসের হারজিৎ ও ছক্কাপাঞ্জার পুনঃ পুনঃ আবর্তনের মধ্যে কোন্‌-এক সময়ে দুইটি খেলোয়াড়ের মনে মনে মিল হইয়া গেল, অন্তর্যামী ব্যতীত আর-একজন খেলোয়াড় তাহা দেখিল এবং আমোদ বোধ করিল।

একদিন দুপুরবেলায় বিনোদা কুসুম ও নগেন্দ্র তাস খেলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে কুসুম তাহার রুগ্‌ণ শিশুর কান্না শুনিয়া উঠিয়া গেল। নগেন্দ্র বিনোদার সহিত গল্প করিতে লাগিল। কিন্তু কী গল্প করিতেছিল তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না; রক্তস্রোত তাহার হৃৎপিণ্ড উদ্‌বেলিত করিয়া তাহার সর্বশরীরের শিরার মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছিল।

হঠাৎ একসময় তাহার উদ্দাম যৌবন বিনয়ের সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিল, হঠাৎ বিনোদার হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। বিনোদা নগেন্দ্র কর্তৃক এই অবমাননায় ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় অধীর হইয়া নিজের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতেছে এমন সময় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। নগেন্দ্র নতমুখে ঘর হইতে বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

পরিচারিকা গম্ভীরস্বরে কহিল, "বৌঠাকরুন, তোমাকে পিসিমা ডাকছেন।" বিনোদা ছলছল চক্ষে নগেন্দ্রের প্রতি বিদ্যুৎকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া দাসীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

পরিচারিকা যেটুকু দেখিয়াছিল তাহাকে হ্রস্ব এবং যাহা না দেখিয়াছিল তাহাকেই সুদীর্ঘতর করিয়া বৈদ্যনাথের অন্তঃপুরে একটা ঝড় তুলিয়া দিল। বিনোদার কী দশা হইল সে কথা বর্ণনার অপেক্ষা কল্পনা সহজ। সে যে কতদূর নিরপরাধ কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিল না, নতমুখে সমস্ত সহিয়া গেল।

বৈদ্যনাথ আপন ভাবী পিণ্ডদাতার আবির্ভাব-সম্ভাবনা অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিয়া বিনোদাকে কহিল, "কলঙ্কিনী, তুই আমার ঘর হইতে দূর হইয়া যা।"

বিনোদা শয়নকক্ষের দ্বার রোধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, তাহার অশ্রুহীন চক্ষু মধ্যাহ্নের মরুভূমির মতো জ্বলিতেছিল। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া বাহিরের বাগানে কাকের ডাক থামিয়া গেল, তখন নক্ষত্রখচিত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বাপমায়ের কথা মনে পড়িল এবং তখন দুই গণ্ড দিয়া অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

সেই রাত্রে বিনোদা স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কেহ তাহার খোঁজও করিল না। তখন বিনোদা জানিত না যে, 'প্রজনার্থং মহাভাগা' স্ত্রী-জন্মের মহাভাগ্য সে

লাভ করিয়াছে, তাহার স্বামীর পারলৌকিক সদ্গতি তাহার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই ঘটনার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথের বৈষয়িক অবস্থার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। এখন তিনি পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বৃহৎ বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার বিষয় যতই বৃদ্ধি হইল বিষয়ের উত্তরাধিকারীর জন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরে পরে দুইবার বিবাহ করিলেন, তাহাতে পুত্র না জন্মিয়া কেবলি কলহ জন্মিতে লাগিল। দৈবজ্ঞপণ্ডিতে সন্ন্যাসী-অবধূতে ঘর ভরিয়া গেল; শিকড় মাদুলি জলপড়া এবং পেটেন্ট্ ঔষধের বর্ষণ হইতে লাগিল। কালীঘাটে যত ছাগশিশু মরিল তাহার অস্থিস্তূপে তৈমুরলঙ্গের কঙ্কালজয়স্তম্ভ ধিক্‌কৃত হইতে পারিত; কিন্তু তবু, কেবল গুটিকতক অস্থি ও অতি স্বল্প মাংসের একটি ক্ষুদ্রতম শিশুও বৈদ্যনাথের বিশাল প্রাসাদের প্রান্তস্থান অধিকার করিয়া দেখা দিল না। তাঁহার অবর্তমানে পরের ছেলে কে তাঁহার অন্ন খাইবে ইহাই ভাবিয়া অন্নে তাঁহার অরুচি জন্মিল।

বৈদ্যনাথ আরও একটি স্ত্রী বিবাহ করিলেন— কারণ, সংসারে আশারও অন্ত নাই, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যারও শেষ নাই।

দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী দেখিয়া বলিল, ঐ কন্যার পুত্রস্থানে যেরূপ শুভযোগ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৈদ্যনাথের ঘরে প্রজাবৃদ্ধির আর বিলম্ব নাই; তাহার পরে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল তথাপি পুত্রস্থানের শুভযোগ আলস্য পরিত্যাগ করিলেন না।

বৈদ্যনাথ নৈরাশ্যে অবনত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পরামর্শে একটা প্রচুরব্যয়সাধ্য যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। তাহাতে বহু কাল ধরিয়া বহু ব্রাহ্মণের সেবা চলিতে লাগিল।

এ দিকে তখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অস্থিচর্মসার হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদ্যনাথ যখন অন্নের মধ্যে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, আমার অন্ন কে খাইবে, তখন সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তস্থালীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, কী খাইব।

ঠিক সেই সময়ে চারিমাস কাল ধরিয়া বৈদ্যনাথের চতুর্থ সহধর্মিণী একশত ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিতেছিল এবং একশত ব্রাহ্মণ প্রাতে প্রচুর অন্ন এবং সায়াহ্নে অপর্যাপ্ত পরিমাণে জলপান খাইয়া খুরি সরা ভাঁড় এবং দধিঘৃতলিপ্ত কলার পাতে ম্যুনিসি-পালিটির আবর্জনাশকট পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। অন্নের গন্ধে দুর্ভিক্ষকাতর বুভুক্ষুগণ দলে দলে দ্বারে সমাগত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে সর্বদা খেদাইয়া রাখিবার জন্য অতিরিক্ত দ্বারী নিযুক্ত হইল।

একদিন প্রাতে বৈদ্যনাথের মার্বল-মণ্ডিত দালানে একটি স্থূলোদর সন্ন্যাসী দুই-সের মোহনভোগ এবং দেড়সের দুগ্ধ-সেবায় নিযুক্ত আছে, বৈদ্যনাথ গায়ে একখানি চাদর দিয়া জোড়করে একান্ত বিনীতভাবে ভূতলে বসিয়া ভক্তিভরে পবিত্র ভোজন-ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় কোনোমতে দ্বারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া জীর্ণদেহ বালক-সহিত একটি অতি শীর্ণকায়া রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণস্বরে

কহিল, "বাবু, দুটি খেতে দাও।"

বৈদ্যনাথ শশব্যস্ত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "গুরুদয়াল! গুরুদয়াল!" গতিক মন্দ বুঝিয়া স্ত্রীলোকটি অতি করুণস্বরে কহিল, "ওগো, এই ছেলেটিকে দুটি খেতে দাও। আমি কিছু চাই নে।"

গুরুদয়াল আসিয়া বালক ও তাহার মাতাকে তাড়াইয়া দিল। সেই ক্ষুধাতুর নিরন্ন বালকটি বৈদ্যনাথের একমাত্র পুত্র। একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির দুরাশায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

ডিটেক্‌টিভ

আমি পুলিসের ডিটেক্‌টিভ কর্মচারী। আমার জীবনে দুটিমাত্র লক্ষ্য ছিল— আমার স্ত্রী এবং আমার ব্যবসায়। পূর্বে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমার স্ত্রীর প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন, অতএব সহসা সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসা আমার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনও নিজের উপরে আমার বিশ্বাসের ত্রুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম, সুন্দরী স্ত্রীকে যেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদৃষ্টলক্ষ্মীকেও তেমনি বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

পুলিস-বিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম, অবশেষে ডিটেক্‌টিভ-পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উজ্জ্বল শিখা হইতেও যেমন কজ্জলপাত হয় তেমনি আমার স্ত্রীর প্রেম হইতেও ঈর্ষা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাতে আমার কিছু কাজের ব্যাঘাত করিত, কারণ পুলিসের কর্মে স্থানাস্থান কালাকাল বিচার করিলে চলে না, বরঞ্চ স্থানের অপেক্ষা অস্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চা অধিক করিয়া করিতে হয়— তাহাতে করিয়া আমার স্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ আরও যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, "তুমি এমন যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাপন কর, কালেভদ্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার জন্য তোমার আশঙ্কা হয় না?" আমি তাহাকে বলিতাম, "সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।"

স্ত্রী বলিত, "সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব, আমাকে তুমি লেশমাত্র সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি।"

ডিটেক্‌টিভ-লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটা নাম রাখিব, এ প্রতিজ্ঞা আমার দৃঢ় ছিল। এ সম্বন্ধে যতকিছু বিবরণ এবং গল্প আছে তাহার কোনোটাই পড়িতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল।

কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু এবং নির্বোধ, অপরাধগুলা নির্জীব এবং সরল, তাহার মধ্যে দুরূহতা দুর্গমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনী নররক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সম্বরণ করিতে পারে না। জালিয়াত যে জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলম্বে নিজেই আপাদমস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধব্যূহ হইতে নির্গমনের কূটকৌশল সে কিছুই জানে না। এমন নির্জীব দেশে ডিটেক্‌টিভের কাজে সুখও নাই, গৌরবও নাই।

বড়োবাজারের মাড়োয়ারী জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেফতার করিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি, 'ওরে অপরাধীকুলকলঙ্ক, পরের সর্বনাশ করা গুণী ওস্তাদলোকের কর্ম; তোর মতো আনাড়ি নির্বোধের সাধুতপস্বী হওয়া উচিত ছিল।' খুনীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উক্তি করিয়াছি, 'গবর্মেণ্টের সমুন্নত ফাঁসিকাষ্ঠ কি তোদের মতো

গৌরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল— তোদের না আছে উদার কল্পনাশক্তি, না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটারা খুনী হইবার স্পর্ধা করিস!'

আমি কল্পনাচক্ষে যখন লণ্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে শীতবাষ্পাকুল অভ্রভেদী হর্ম্যশ্রেণী দেখিতে পাইতাম তখন আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম, 'এই হর্ম্যরাজি এবং পথ-উপপথের মধ্য দিয়া যেমন জনস্রোত কর্মস্রোত উৎসবস্রোত সৌন্দর্যস্রোত অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্বত্রই একটা হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ংকর অপরাধপ্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে; তাহারই সামীপ্যে য়ুরোপীয় সামাজিকতার হাস্যকৌতুক শিষ্টাচার এমন বিরাট্‌ভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। আর, আমাদের কলিকাতার পথপার্শ্বের মুক্ত-বাতায়ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে রান্নাবাটনা, গৃহকার্য, পরীক্ষার পাঠ, তাসদাবার বৈঠক, দাম্পত্যকলহ, বড়োজোর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই— কোনো-একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনও এ কথা মনে হয় না যে, হয়তো এই মুহূর্তেই এই গৃহের কোনো-একটা কোণে সয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিমগুলিতে তা দিতেছে।

আমি অনেকসময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম; ভাবে ভঙ্গিতে যাহাদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেকসময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নামধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি— তাহারা নিষ্কলঙ্ক ভালোমানুষ, এমন-কি তাহাদের আত্মীয়-বান্ধবেরাও তাহাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোনোপ্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সবচেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমন-কি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে, এইমাত্র সে কোনো-একটা উৎকট দুষ্কার্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি— সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তখনই অধ্যাপনকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এই-সকল লোকেরাই অন্য-কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোরডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পণ্ডিতি করিয়া বৃদ্ধবয়সে পেন্সন লইয়া মরে; বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোনো অতিক্ষুদ্র ঘটিবাটিচোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই বাসার অনতিদূরে একটি গ্যাস্‌পোস্টের নীচে একটা মানুষ দেখিলাম, বিনা আবশ্যকে সে উৎসুকভাবে একই স্থানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, সে একটি-কোনো গোপন দুরভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চেহারাখানা বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম— তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী; আমি মনে মনে কহিলাম, 'দুষ্কর্ম করিবার এই তো ঠিক উপযুক্ত চেহারা; নিজের মুখশ্রীই যাহাদের সর্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী তাহারা যেন সর্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্বযত্নে পরিহার করে; সৎকার্য করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে কিন্তু দুষ্কর্ম দ্বারা সফলতা লাভও তাহাদের পক্ষে দুরাশা।' দেখিলাম, এই ছোকরাটির চেহারাটাই ইহার

সর্বপ্রধান বাহাদুরি; সেজন্য আমি মনে মনে অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম, বলিলাম, 'ভগবান তোমাকে যে দুর্লভ সুবিধাটি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমত কাজে খাটাইতে পার, তবে তো বলি সাবাস্।'

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই পৃষ্ঠে চপেটাঘাতপূর্বক বলিলাম, "এই যে, ভালো আছেন তো?" সে তৎক্ষণাৎ প্রবলমাত্রায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "মাপ করিবেন, ভুল হইয়াছে, হঠাৎ আপনাকে অন্য লোক ঠাওরাইয়াছিলাম।" মনে করিলাম, কিছুমাত্র ভুল করি নাই, যাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে। কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল, ইহাতে আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম। নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরও অধিক দখল থাকা উচিত ছিল; কিন্তু শ্রেষ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধীশ্রেণীর মধ্যেও বিরল। চোরকেও সেরা চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে ত্রস্তভাবে গ্যাস্‌পোস্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে গেলাম, দেখিলাম, গোলদিঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীতীরে তৃণশয্যার উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়িল; আমি ভাবিলাম, উপায়চিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাস্‌পোস্টের তলদেশের অপেক্ষা অনেকাংশে ভালো— লোকে যদি কিছু সন্দেহ করে তো বড়োজোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেয়সীর মুখচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অভাব পূরণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম, সে কলেজের ছাত্র, পরীক্ষা ফেল্ করিয়া গ্রীষ্মাবকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়, এই লোকটিকে কোন্ দুষ্টগ্রহ ছুটি দিতেছে না সেটা বাহির করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল, কেমন একরকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল তাহার ভাবটা ভালো বুঝিলাম না। যেন সে বিস্মিত, যেন সে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে, এমনি একটা ভাব। বুঝিলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস্ করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ যখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেষ্টা করিলাম তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। কিন্তু মনে হইল, সেও আমাকে সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে, সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল, ইহা ওস্তাদের লক্ষণ। এত অল্প বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড়ো খুশি হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালধূর্ত ছেলেটির হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদ্‌গদকণ্ঠে মন্মথকে বলিলাম, "ভাই, একটি স্ত্রীলোককে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।"

প্রথমটা সে যেন কিছু চকিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "এরূপ দুর্যোগ বিরল নহে। এইপ্রকার মজা করিবার জন্যই কৌতুকপর

বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।"

আমি কহিলাম, "তোমার পরামর্শ ও সাহায্য চাহি।" সে সম্মত হইল।

আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম; সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল, কিন্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালোবাসার, বিশেষত গর্হিত ভালোবাসার, ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দ্রুত বাড়িয়া উঠে; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, ছোকরাটি পূর্বাপেক্ষা যেন চুপ মারিয়া গেল, অথচ সকল কথা যেন মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এ দিকে মন্মথ প্রত্যহ গোপনে দ্বার রোধ করিয়া কী করে, এবং তাহার গোপন অভিসন্ধি কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না, অথচ অগ্রসর হইতেছিল তাহার সন্দেহ নাই। কী একটা নিগূঢ় ব্যাপারে সে ব্যাপৃত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপক্ক হইয়াছে, তাহা এই নবযুবকটির মুখ দেখিবামাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্‌ক্‌ খুলিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটা অত্যন্ত দুর্বোধ কবিতার খাতা, কলেজের বক্তৃতার নোট এবং বাড়ির লোকের গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল বাড়ির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, বাড়ি ফিরিবার জন্য আত্মীয়স্বজন বারম্বার প্রবল অনুরোধ করিয়াছে; তথাপি, তৎসত্ত্বেও বাড়ি না যাইবার একটা সংগত কারণ অবশ্য আছে; সেটা যদি ন্যায়সংগত হইত তবে নিশ্চয় কথায় কথায় এতদিনে ফাঁস হইত, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতেই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার কাছে এমন নিরতিশয় ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে— যে অসামাজিক মনুষ্যসম্প্রদায় পাতালতলে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই বৃহৎ মনুষ্য-সমাজকে সর্বদাই নীচের দিক হইতে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছে, এই বালকটি সেই বিশ্বব্যাপী বহু পুরাতন বৃহৎজাতির একটি অঙ্গ, এ সামান্য একজন স্কুলের ছাত্র নহে; এ জগৎবক্ষবিহারিণী সর্বনাশিনীর একটি প্রলয়সহচর; আধুনিককালের চশমাপরা নিরীহ বাঙালি ছাত্রের বেশে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে, নৃমুণ্ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরও ভৈরবতর হইত না; আমি ইহাকে ভক্তি করি।

অবশেষে সশরীরে রমণীর অবতারণা করিতে হইল। পুলিসের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম, আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছুদিন গোলদিঘির ধারে মন্মথের পার্শ্বচর হইয়া 'আবার গগনে কেন সুধাংশু-উদয় রে' কবিতাটি বারম্বার আবৃত্তি করিলাম; এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলাসহকারে জানাইল যে, তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইল না, মন্মথ সুদূর নির্লিপ্ত অবিচলিত কৌতূহলের সহিত সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন মধ্যাহ্নে তাহার ঘরের মেজেতে একখানি চিঠির গুটিকতক ছিন্নাংশ কুড়াইয়া পাইলাম। জোড়া দিয়া দিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যটুকু আদায় করিলাম, "আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গোপনে তোমার বাসায়"— অনেক খুঁজিয়া আর কিছু বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠিল; মাটির মধ্য হইতে কোনো বিলুপ্তবংশ

প্রাচীন প্রাণীর একখণ্ড হাড় পাইলে প্রত্নজীবতত্ত্ববিদের কল্পনা যেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম, আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবির্ভাব হইবার কথা আছে, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাপারখানা কী। ছেলেটির যেমন সাহস তেমনি তীক্ষ্ম বুদ্ধি। যদি কোনো গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যেদিন কোনো-একটা বিশেষ হাঙ্গামা সেইদিন অবকাশ বুঝিয়া করা ভালো। প্রথমত প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে, দ্বিতীয়ত যেদিন যেখানে কোনো বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপূর্বক কোনো গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই নূতন বন্ধুত্ব এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমাভিনয়, ইহাকেও মন্মথ আপন কার্যসিদ্ধির উপায় করিয়া লইয়াছে; এইজন্যই সে আপনাকে ধরাও দেয় না, আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কার্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি; সকলেই মনে করিতেছে যে সে আমাদিগকে লইয়াই ব্যাপৃত রহিয়াছে—সেও সেই ভ্রম দূর করিতে চায় না।

তর্কগুলো একবার ভাবিয়া দেখো। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আত্মীয়স্বজনের অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করিয়া শূন্য বাসায় একলা পড়িয়া থাকে, নির্জন স্থানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না, অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নির্জনতা ভঙ্গ করিয়াছি, এবং একটা রমণীর অবতারণা করিয়া নূতন উপদ্রব সৃজন করিয়াছি; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে বিরক্ত হয় না, বাসা ছাড়ে না, আমাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকে না—অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসক্তি জন্মে নাই ইহা নিশ্চয় সত্য, এমন-কি তাহার অসতর্ক অবস্থায় বারম্বার লক্ষ করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভয়ের প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘৃণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ করিতে হইলে আমার মতো নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্বাপেক্ষা সদুপায়; এবং কোনো বিষয়ে একান্তমনে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে রমণীর মতো এমন সহজ ছুতা আর কিছু নাই। ইতিপূর্বে মন্মথর আচরণ যেরূপ নিরর্থক এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্পূর্ণ লোপ হইল। কিন্তু এতটা দূরের কথা মুহূর্তের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বড়ো মগজওয়ালা লোক যে আমাদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল—মন্মথ কিছু যদি মনে না করিত তবে আমি বোধহয় তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্মথর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহাকে বলিলাম, “আজ তোমাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেলে খাওয়াইব সংকল্প করিয়াছি।” শুনিয়া সে একটু চমকিয়া উঠিল, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, “ভাই, মাপ করো, আমার পাকযন্ত্রের অবস্থা আজ বড়ো শোচনীয়।” হোটেলের খানায় মন্মথর কখনও কোনো কারণে অনভিরুচি দেখি নাই, আজ তাহার অন্তরিন্দ্রিয় নিশ্চয়ই নিতান্তই দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বভাগে আমার বাসায় থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গায়ে পড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিল, কোনো তর্কের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হরিমতিকে আজ আনিতে যাইবে না?" আমি সচকিত ভাবে কহিলাম, "হাঁ হাঁ, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি ভাই আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখো, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাত্রে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্বশরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মথের যেপ্রকার ঔৎসুক্য দেখিলাম আমার ঔৎসুক্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না; আমি আমাদের বাসার অনতিদূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রেয়সীসমাগমোৎকণ্ঠিত প্রণয়ীর ন্যায় মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোধূলির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যখন রাজপথে গ্যাস জ্বালিবার সময় হইল এমন সময় একটি রুদ্ধদ্বার পাল্‌কি আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ আচ্ছন্ন পাল্‌কিটির মধ্যে একটি অপ্রসিদ্ধ অবগুণ্ঠিত পাপ, একটি মূর্তিমতী ট্র্যাজেডি কলেজের ছাত্রনিবাসের মধ্যে গুটিকতক উড়ে বেহারার স্কন্ধে চাপিয়া সমুচ্চ হাঁই-হুঁই শব্দে অত্যন্ত অনায়াসে সহজভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্বশরীরে অপূর্ব পুলকসঞ্চার হইল।

আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল, গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া-শুনিয়া লইব, কিন্তু তাহা ঘটিল না; কারণ সিঁড়ির সম্মুখবর্তী ঘরেই সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া মন্মথ বসিয়া ছিল, এবং গৃহের অপর প্রান্তে বিপরীতমুখে একটি অবগুণ্ঠিতা নারী বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। যখন দেখিলাম মন্মথ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, "ভাই, আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাই লইতে আসিলাম।" মন্মথ এমনি অভিভূত হইয়া পড়িল যে, বোধ হইল যেন তখনি সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। আমি কৌতুক এবং আনন্দে নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, "ভাই, তোমার অসুখ করিয়াছে নাকি।" সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তখন সেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ আড়ষ্ট অবগুণ্ঠিত নারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মন্মথর কে হন।" কোনো উত্তর পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম, তিনি মন্মথর কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন। তাহার পর কী হইল সকলে জানেন।

এই আমার ডিটেক্‌টিভ-পদের প্রথম চোর ধরা।

আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ডিটেক্‌টিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, "মন্মথর সহিত তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধ সমাজবিরুদ্ধ না হইতেও পারে।"

মহিম কহিল, "না হইবারই সম্ভব। আমার স্ত্রীর বাক্স হইতে মন্মথর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।" বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল; সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

সুচরিতাসু,

হতভাগ্য মন্মথর কথা তুমি বোধকরি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ। বাল্যকালে যখন

কাজিবাড়ির মাতুলালয়ে যাইতাম, তখন সর্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ-চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষেরই কর্তারা কোনোক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চারপাঁচ বৎসর তোমার আর কোনো সন্ধান পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার পুলিসের কর্ম লইয়া শহরে বদলি হইয়াছেন, খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

তোমার সহিত সাক্ষাতের দুরাশা আমার নাই এবং অন্তর্যামী জানেন, তোমার গার্হস্থ্যসুখের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশ করিবার দুরভিসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্তী একটি গ্যাস্‌পোস্টের তলে আমি সূর্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় একটি প্রজ্বলিত কেরোসিন-ল্যাম্প্‌ লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত তোমাদের দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর; সেই সময় মুহূর্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বুঝিতে বাকি নাই যে, তোমার জীবন সুখের নহে। তোমার প্রতি আমার কোনোপ্রকার সামাজিক অধিকার নাই কিন্তু যে বিধাতা তোমার দুঃখকে আমার দুঃখে পরিণত করিয়াছেন, তিনিই সে দুঃখ মোচনের চেষ্টা-ভার আমার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার স্পর্ধা মাপ করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পাল্‌কি করিয়া একবার বিশ মিনিটের জন্য আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগুলি গোপনকথা বলিতে চাহি, যদি বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করিতে পার তবে তৎসম্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পারি, এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি; আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমতে চলিলে তুমি একদিন সুখী হইতে পারিবে।

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে; ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব এবং তোমার চরণতলস্পর্শে আমার গৃহখানিকে চির-কালের জন্য সুখস্বপ্নমণ্ডিত করিয়া তুলিব, এ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তরে আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর এবং যদি এ সুখ হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও তবে সে কথা আমাকে লিখিয়ো, আমি তদুত্তরে পত্রযোগেই সকল কথা জানাইব। যদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই পত্রখানি তোমার স্বামীকে দেখাইয়ো, তাহার পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা তাঁহাকেই বলিব।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার

আষাঢ় ১৩০৫

অধ্যাপক

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলেজে আমার সহপাঠীসম্প্রদায়ের মধ্যে আমার একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই আমাকে সকল বিষয়েই সমজদার বলিয়া মনে করিত।

ইহার প্রধান কারণ, ভুল হউক আর ঠিক হউক সকল বিষয়েই আমার একটা মতামত ছিল। অধিকাংশ লোকই হাঁ এবং না জোর করিয়া বলিতে পারে না, আমি সেটা খুব বলিতাম।

কেবল যে আমি মতামত লইয়া ছিলাম তাহা নহে, নিজেও রচনা করিতাম; বক্তৃতা দিতাম, কবিতা লিখিতাম, সমালোচনা করিতাম, এবং সর্বপ্রকারেই আমার সহপাঠীদের ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলাম।

কলেজে এইরূপে শেষ পর্যন্ত আপন মহিমা মহীয়ান রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার খ্যাতিস্থানের শনি এক নূতন অধ্যাপকের মূর্তি ধারণ করিয়া কলেজে উদিত হইল।

আমাদের তখনকার সেই নবীন অধ্যাপকটি আজকালকার একজন সুবিখ্যাত লোক, অতএব আমার এই জীবনবৃত্তান্তে তাঁহার নাম গোপন করিলেও তাঁহার উজ্জ্বল নামের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি তাঁহার আচরণ লক্ষ করিয়া বর্তমান ইতিহাসে তাঁহাকে বামাচরণবাবু বলিয়া ডাকা যাইবে।

ইঁহার বয়স যে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে; অল্পদিন হইল এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হইয়া টনি-সাহেবের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু লোকটি ব্রাহ্ম বলিয়া কেমন তাঁহাকে অত্যন্ত সুদূর এবং স্বতন্ত্র মনে হইত; আমাদের সমকালীন সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না। আমরা নব্যহিন্দুর দল পরস্পরের মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মদৈত্য বলিয়া ডাকিতাম।

আমাদের একটি তর্কসভা ছিল। আমি সে সভার বিক্রমাদিত্য এবং আমিই সে সভার নবরত্ন ছিলাম। আমরা ছত্রিশ জন সভ্য ছিলাম, তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনকে গণনা হইতে বাদ দিলে কোনো ক্ষতি হইত না এবং অবশিষ্ট এক জনের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা উক্ত পঁয়ত্রিশ জনেরও সেইরূপ ধারণা ছিল।

এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি কার্লাইলের সমালোচনা করিয়া এক ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার অসাধারণত্বে শ্রোতামাত্রেই চমৎকৃত হইবে—চমৎকৃত হইবার কথা ছিল, কারণ আমার প্রবন্ধে কার্লাইলকে আদ্যোপান্ত নিন্দা করিয়াছিলাম।

সে অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বামাচরণবাবু। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে আমার সহাধ্যায়ী ভক্তগণ আমার মতের অসমসাহসিকতা ও ইংরাজি ভাষার বিশুদ্ধ তেজস্বিতায় বিমুগ্ধ ও নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। কাহারও কিছু বক্তব্য নাই শুনিয়া বামাচরণবাবু উঠিয়া শান্তগম্ভীরস্বরে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমেরিকার সুলেখক সুবিখ্যাত লাউয়েল-সাহেবের প্রবন্ধ হইতে আমার প্রবন্ধটির যে অংশ চুরি সে অংশ অতি চমৎকার এবং যে অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেটুকু পরিত্যাগ করিলেই ভালো হইত।

যদি তিনি বলিতেন, লাউয়েলের সহিত নবীন প্রবন্ধলেখকের মতের এমন-কি ভাষারও আশ্চর্য অবিকল ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে তাঁহার কথাটা সত্যও হইত অথচ অপ্রিয়ও হইত না।

এই ঘটনার পর, সহপাঠীমহলে আমার প্রতি যে অখণ্ড বিশ্বাস ছিল তাহাতে একটি বিদারণরেখা পড়িল। কেবল আমার চিরানুরক্ত ভক্তাগ্রগণ্য অমূল্যচরণের হৃদয়ে লেশমাত্র বিকার জন্মিল না। সে আমাকে বারম্বার বলিতে লাগিল, "তোমার বিদ্যাপতি নাটকখানা ব্রহ্মদৈত্যকে শুনাইয়া দাও, দেখি সে সম্বন্ধে নিন্দুক কী বলিতে পারে।"

রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীকে কবি বিদ্যাপতি ভালোবাসিতেন এবং তাঁহাকে না দেখিলে তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। এই মর্ম অবলম্বন করিয়া আমি একখানি পরম শোকাবহ উচ্চশ্রেণীর পদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলাম; আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাঁহারা পুরাতত্ত্বের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে চাহেন না তাঁহারা বলিতেন, ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। আমি বলিতাম, সে ইতিহাসের দুর্ভাগ্য! ঘটিলে ইতিহাস ঢের বেশি সরস ও সত্য হইত।

নাটকখানি যে উচ্চশ্রেণীর সে কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। অমূল্য বলিত সর্বোচ্চশ্রেণীর। আমি আপনাকে যতটা মনে করিতাম, সে আবার আমাকে তাহার চেয়েও বেশি মনে করিত। অতএব আমার যে কী-এক বিরাট রূপ তাহার চিত্তে প্রতিফলিত ছিল, আমিও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিতাম না।

নাটকখানি বামাচরণবাবুকে শুনাইয়া দিবার পরামর্শ আমার কাছে মন্দ লাগিল না; কারণ, সে নাটকে নিন্দাযোগ্য ছিদ্র লেশমাত্র ছিল না এইরূপ আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব আর-একদিন তর্কসভার বিশেষ অধিবেশন আহূত হইল, ছাত্রবৃন্দের সমক্ষে আমি আমার নাটকখানি পাঠ করিলাম এবং বামাচরণবাবু তাহার সমালোচনা করিলেন।

সে সমালোচনাটি বিস্তারিত আকারে লিপিবদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সংক্ষেপত, সমালোচনাটি আমার অনুকূল হয় নাই; বামাচরণবাবুর মতে নাটকগত পাত্রগণের চরিত্র ও মনোভাব -সকল নির্দিষ্ট বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। বড়ো বড়ো সাধারণ ভাবের কথা আছে, কিন্তু তাহা বাষ্পবৎ অনিশ্চিত, লেখকের অন্তরের মধ্যে আকার ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া তাহা সৃজিত হইয়া উঠে নাই।

বৃশ্চিকের পুচ্ছদেশেই হুল থাকে, বামাচরণবাবুর সমালোচনার উপসংহারেই তীব্রতম বিষ সঞ্চিত ছিল। আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি বলিলেন, আমার এই নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবং মূলভাবটি গেটে-রচিত টাসো নাটকের অনুকরণ, এমন-কি অনেকস্থলে অনুবাদ।

এ কথার সদুত্তর ছিল। আমি বলিতে পারিতাম, হউক অনুকরণ, কিন্তু সেটা নিন্দার বিষয় নহে। সাহিত্যরাজ্যে চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা—এমন-কি, ধরা পড়িলেও। সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাজনগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন, এমন-কি, শেক্স্পিয়রও বাদ যান না। সাহিত্যে যাহার ওরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক সেই চুরি করিতে সাহস করে, কারণ, সে পরের জিনিসকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে পারে।

ভালো ভালো এইরূপ আরও অনেক কথা ছিল, কিন্তু সেদিন বলা হয় নাই। বিনয় তাহার কারণ নহে। আসল কথা, সেদিন একটি কথাও মনে পড়ে নাই। প্রায়

পাঁচসাত দিন পরে একে একে উত্তরগুলি দৈবাগত ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় আমার মনে উদয় হইতে লাগিল ; কিন্তু শত্রুপক্ষ সম্মুখে উপস্থিত না থাকাতে সে অস্ত্রগুলি আমাকেই বিঁধিয়া মারিল। ভাবিতাম, এ কথাগুলো অন্তত আমার ক্লাসের ছাত্রদিগকে শুনাইয়া দিব। কিন্তু উত্তরগুলি আমার সহাধ্যায়ী গর্দভদিগের বুদ্ধির পক্ষে কিছু অতিমাত্র সূক্ষ্ম ছিল। তাহারা জানিত, চুরিমাত্রেই চুরি; আমার চুরি এবং অন্যের চুরিতে যে কতটা প্রভেদ আছে তাহা বুঝিবার সামর্থ্য যদি তাহাদের থাকিত তবে আমার সহিতও তাহাদের বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

বি. এ. পরীক্ষা দিলাম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু মনে আনন্দ রহিল না। বামাচরণের সেই গুটিকতক কথার আঘাতে আমার সমস্ত খ্যাতি ও আশার অভ্রভেদী মন্দির ভগ্নস্তূপ হইয়া পড়িল। কেবল আমার প্রতি অবোধ অমূল্যের শ্রদ্ধা কিছুতেই হ্রাস হইল না ; প্রভাতে যখন যশঃসূর্য আমার সম্মুখে উদিত ছিল তখনও সেই শ্রদ্ধা অতি দীর্ঘ ছায়ার ন্যায় আমার পদতললগ্ন হইয়া ছিল, আবার সায়াহ্নে যখন আমার যশঃসূর্য অস্তোন্মুখ হইল তখনও সেই শ্রদ্ধা দীর্ঘায়তন বিস্তার করিয়া আমার পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু এ শ্রদ্ধায় কোনো পরিতৃপ্তি নাই, ইহা শূন্য ছায়ামাত্র, ইহা মূঢ় ভক্তহৃদয়ের মোহান্ধকার, ইহা বুদ্ধির উজ্জ্বল রশ্মিপাত নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাবা বিবাহ দিবার জন্য আমাকে দেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কিছুদিন সময় লইলাম।

বামাচরণবাবুর সমালোচনায় আমার নিজের মধ্যে একটা আত্মবিরোধ, নিজের প্রতি নিজের একটা বিদ্রোহভাব জন্মিয়াছিল। আমার সমালোচক অংশ আমার লেখক অংশকে গোপনে আঘাত দিতেছিল। আমার লেখক অংশ বলিতেছিল, আমি ইহার পরিশোধ লইব; আবার একবার লিখিব এবং তখন দেখিব, আমি বড়ো না আমার সমালোচক বড়ো।

মনে মনে স্থির করিলাম, বিশ্বপ্রেম, পরের জন্য আত্মবিসর্জন এবং শত্রুকে মার্জনা —এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া গদ্যে হউক পদ্যে হউক, খুব 'সাব্লাইম'-গোছের একটা-কিছু লিখিব; বাঙালি সমালোচকদিগকে সুবৃহৎ সমালোচনার খোরাক জোগাইব।

স্থির করিলাম, একটি সুন্দর নির্জন স্থানে বসিয়া আমার জীবনের এই সর্বপ্রধান কীর্তিটির সৃষ্টিকার্য সমাধা করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্তত একমাসকাল বন্ধুবান্ধব পরিচিত-অপরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিব না।

অমূল্যকে ডাকিয়া আমার প্ল্যান বলিলাম। সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে যেন তখনই আমার ললাটে স্বদেশের অনতিদূরবর্তী ভাবী মহিমার প্রথম অরুণ-জ্যোতি দেখিতে পাইল। গম্ভীর মুখে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্র আমার মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "যাও ভাই, অমর কীর্তি অক্ষয় গৌরব অর্জন করিয়া আইস।"

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; মনে হইল, যেন আসন্নগৌরবগর্বিত ভক্ত-

বিহ্বল বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইয়া অমূল্য এই কথাগুলি আমাকে বলিল।

অমূল্যও বড়ো কম ত্যাগস্বীকার করিল না; সে স্বদেশের হিতের জন্য সুদীর্ঘ একমাসকাল আমার সঙ্গপ্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিল। সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার বন্ধু ট্রামে চড়িয়া তাহার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাসায় চলিয়া গেল, আমি গঙ্গার ধারে ফরাসডাঙার বাগানে অমর কীর্তি, অক্ষয় গৌরব উপার্জন করিতে গেলাম।

গঙ্গার ধারে নির্জন ঘরে চিত হইয়া শুইয়া বিশ্বজনীন প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মধ্যাহ্নে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হইত, একেবারে অপরাহ্নে পাঁচটার সময় জাগিয়া উঠিতাম। তাহার পর শরীর-মনটা কিছু অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত; কোনোমতে চিত্তবিনোদন ও সময়যাপনের জন্য বাগানের পশ্চাদ্দিকে রাজপথের ধারে একটা ছোটো কাষ্ঠাসনে বসিয়া চুপচাপ করিয়া গোরুর গাড়ি ও লোক-চলাচল দেখিতাম। নিতান্ত অসহ্য হইলে স্টেশনে গিয়া বসিতাম, টেলিগ্রাফের কাঁটা কট্‌কট্‌ শব্দ করিত, টিকিটের ঘণ্টা বাজিত, লোক-সমাগম হইত, রক্তচক্ষু সহস্রপদ লৌহসরীসৃপ ফুঁষিতে ফুঁষিতে আসিত, উৎকট চীৎকার করিয়া চলিয়া যাইত, লোকজনের হুড়াহুড়ি পড়িত— কিয়ৎক্ষণের জন্য কৌতুক বোধ করিতাম। বাড়ি ফিরিয়া আহার করিয়া সঙ্গী-অভাবে সকাল-সকাল শুইয়া পড়িতাম, এবং প্রাতঃকালে সকাল-সকাল উঠিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকাতে বেলা আট-নয়টা পর্যন্ত বিছানায় যাপন করিতাম।

শরীর মাটি হইল, বিশ্বপ্রেমেরও কোনো অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া পাইলাম না। কোনোকালে একা থাকা অভ্যাস না থাকাতে সঙ্গীহীন গঙ্গাতীর শূন্য শ্মশানের মতো বোধ হইতে লাগিল; অমূল্যটাও এমনি গর্দভ যে, একদিনের জন্যেও সে আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল না।

ইতিপূর্বে কলিকাতায় বসিয়া ভাবিতাম, বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে পা ছড়াইয়া বসিব, পদপ্রান্তে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী আপন-মনে বহিয়া চলিবে— মাঝখানে স্বপ্নাবিষ্ট কবি, এবং চারি দিকে তাহার ভাবরাজ্য ও বহিঃপ্রকৃতি— কাননে পুষ্প, শাখায় বিহঙ্গ, আকাশে তারা, মনের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম এবং লেখনীমুখে অশ্রান্ত অজস্র ভাবস্রোত বিচিত্র ছন্দে প্রবাহিত। কিন্তু কোথায় প্রকৃতি এবং কোথায় প্রকৃতির কবি, কোথায় বিশ্ব আর কোথায় বিশ্বপ্রেমিক! একদিনের জন্যও বাগানে বাহির হই নাই। কাননের ফুল কাননে ফুটিত, আকাশের তারা আকাশে উঠিত, বটবৃক্ষের ছায়া বট-বৃক্ষের তলে পড়িত, আমিও ঘরের ছেলে ঘরে পড়িয়া থাকিতাম।

আত্মমাহাত্ম্য কিছুতেই প্রমাণ করিতে না পারিয়া বামাচরণের প্রতি আক্রোশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সে সময়টাতে বাল্যবিবাহ লইয়া বাঙলার শিক্ষিতসমাজে একটা বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়াছিল। বামাচরণ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন এবং পরম্পর শোনা গিয়াছিল যে, তিনি একটি যুবতী কুমারীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ এবং অচিরে পরিণয়পাশে বদ্ধ হইবার প্রত্যাশায় আছেন।

বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত কৌতুকাবহ ঠেকিয়াছিল, এবং বিশ্বপ্রেমের মহাকাব্যও ধরা দিল না, তাই বসিয়া বসিয়া বামাচরণকে নায়কের আদর্শ করিয়া কদম্বকলি মজুমদার -নামক একটি কাল্পনিক যুবতীকে নায়িকা খাড়া করিয়া সুতীব্র এক প্রহসন

লিখিলাম। লেখনী এই অমর কীর্তিটি প্রসব করিবার পর আমি কলিকাতা-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমন সময় যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন অপরাহ্ণে স্টেশনে না গিয়া অলসভাবে বাগানবাড়ির ঘরগুলি পরিদর্শন করিতেছিলাম। আবশ্যক না হওয়াতে ইতিপূর্বে অধিকাংশ ঘরে পদার্পণ করি নাই, বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বা অভিনিবেশ লেশমাত্র ছিল না। সেদিন নিতান্তই সময়যাপনের উদ্দেশে বায়ুভরে উড্ডীন চ্যুতপত্রের মতো ইতস্তত ফিরিতেছিলাম।

উত্তরদিকের ঘরের দরজা খুলিবামাত্র একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারান্দার সম্মুখেই বাগানের উত্তরসীমার প্রাচীরের গাত্রসংলগ্ন দুইটি বৃহৎ জামের গাছ মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই দুইটি গাছের মধ্যবর্তী অবকাশ দিয়া আর-একটি বাগানের সুদীর্ঘ বকুলবীথির কিয়দংশ দেখা যায়।

কিন্তু সে-সমস্তই আমি পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তখন আমার আর কিছুই দেখিবার অবসর হয় নাই; কেবল দেখিয়াছিলাম, একটি ষোড়শী যুবতী হাতে একখানি বই লইয়া মস্তক আনমিত করিয়া পদচারণা করিতে করিতে অধ্যয়ন করিতেছে।

ঠিক সে সময়ে কোনোরূপ তত্ত্বালোচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু কিছুদিন পরে ভাবিয়াছিলাম যে, দুষ্যন্ত বড়ো বড়ো বাণ শরাসন বাগাইয়া রথে চড়িয়া বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, মৃগ তো মরিল না, মাঝে হইতে দৈবাৎ দশমিনিটকাল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন, তাহাই তাঁহার জীবনে সকল দেখাশুনার সেরা হইয়া দাঁড়াইল। আমিও পেন্সিল কলম এবং খাতাপত্র উদ্যত করিয়া কাব্যমৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, বিশ্বপ্রেম বেচারা তো পলাইয়া রক্ষা পাইল, আর আমি দুইটি জামগাছের আড়াল হইতে যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়া লইলাম; মানুষের একটা জীবনে এমন দুইবার দেখা যায় না।

পৃথিবীতে অনেক জিনিসই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার খনির মধ্যে নামি নাই—কিন্তু আমার নিজের মানসী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অজ্ঞ ছিলাম তাহা এই উত্তরদিকের বারান্দায় আসিবার পূর্বে সন্দেহমাত্র করি নাই। বয়স একুশ প্রায় উত্তীর্ণ হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকরণ কল্পনাযোগবলে নারীসৌন্দর্যের একটা ধ্যানমূর্তি যে সৃজন করিয়া লয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। সেই মূর্তিকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু কখনও সুদূর স্বপ্নেও তাহার পায়ে জুতা, গায়ে জামা, হাতে বই দেখিব এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্গুন-শেষের অপরাহ্ণে প্রবীণ তরুশ্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া এবং আলোক-রেখাঙ্কিত পুষ্পবনপথে, জুতা পায়ে দিয়া, জামা গায়ে দিয়া, বই হাতে করিয়া, দুইটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন—আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না।

দুইমিনিটের বেশি আর দেখা গেল না। নানা ছিদ্র দিয়া দেখিবার নানা চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। সেইদিন প্রথম সন্ধ্যার প্রাক্কালে বটবৃক্ষতলে

প্রসারিত-চরণে বসিলাম— আমার চোখের সম্মুখে পরপারের ঘনীভূত তরুশ্রেণীর উপর সন্ধ্যাতারা প্রশান্ত স্মিতহাস্যে উদিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাশ্রী আপন নাথহীন বিপুল নির্জন বাসরগৃহের দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

যে বইখানি তাহার হাতে দেখিয়াছিলাম সে আমার পক্ষে একটা নূতন রহস্য-নিকেতন হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, সেটা কী বই। উপন্যাস অথবা কাব্য? তাহার মধ্যে কী ভাবের কথা আছে। যে পাতাটি খোলা ছিল এবং যাহার উপর সেই অপরাহ্ণবেলার ছায়া ও রবিরশ্মি, সেই বকুলবনের পল্লবমর্মর এবং সেই যুগলচক্ষুর ঔৎসুক্যপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, ঠিক সেই পাতাটিতে গল্পের কোন্ অংশ, কাব্যের কোন্ রসটুকু প্রকাশ পাইতেছিল। সেই সঙ্গে ভাবিতে লাগিলাম, ঘনমুক্ত কেশজালের অন্ধকারচ্ছায়াতলে সুকুমার ললাটমণ্ডপটির অভ্যন্তরে বিচিত্র ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল, কুমারীহৃদয়ের নিভৃত নির্জনতার উপরে নব নব কাব্যমায়া কী অপূর্ব সৌন্দর্যলোক সৃজন করিতেছিল— অর্ধেক রাত্রি ধরিয়া এমন কত কী ভাবিয়াছিলাম তাহা পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

কিন্তু সে যে কুমারী এ কথা আমাকে কে বলিল। আমার বহুপূর্ববর্তী প্রেমিক দুষ্যন্তকে পরিচয়লাভের পূর্বেই যিনি শকুন্তলা সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনিই। তিনি মনের বাসনা; তিনি মানুষকে সত্য মিথ্যা ঢের কথা অজস্র বলিয়া থাকেন; কোনোটা খাটে, কোনোটা খাটে না, দুষ্যন্তর এবং আমারটা খাটিয়া গিয়াছিল।

আমার এই অপরিচিতা প্রতিবেশিনী বিবাহিতা কি কুমারী কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, সে সংবাদ লওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না; কিন্তু তাহা করিলাম না, কেবল নীরব চকোরের মতো বহুসহস্র যোজন দূর হইতে আমার চন্দ্রমণ্ডলটিকে বেষ্টন করিয়া করিয়া ঊর্ধ্বকণ্ঠে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

পরদিন মধ্যাহ্নে একখানি ছোটো নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম, মাল্লাদিগকে দাঁড় টানিতে নিষেধ করিয়া দিলাম।

আমার শকুন্তলার তপোবনকুটিরটি গঙ্গার ধারেই ছিল। কুটিরটি ঠিক কণ্বের কুটিরের মতো ছিল না; গঙ্গা হইতে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দার উপর উঠিয়াছে, বারান্দাটি ঢালু কাঠের ছাদ দিয়া ছায়াময়।

আমার নৌকাটি যখন নিঃশব্দে ঘাটের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল, দেখিলাম, আমার নবযুগের শকুন্তলা বারান্দার ভূমিতলে বসিয়া আছেন; পিঠের দিকে একটা চৌকি, চৌকির উপরে গোটাকতক বই রহিয়াছে, সেই বইগুলির উপরে তাঁহার খোলা চুল স্তূপাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তিনি সেই চৌকিতে ঠেস্ দিয়া ঊর্ধ্বমুখ করিয়া উত্তোলিত বাম বাহুর উপর মাথা রাখিয়াছেন, নৌকা হইতে তাঁহার মুখ অদৃশ্য, কেবল সুকোমল কণ্ঠের একটি সুকুমার বক্ররেখা দেখা যাইতেছে, খোলা দুইখানি পদপল্লবের একটি ঘাটের উপরের সিঁড়িতে এবং একটি তাহার নীচের সিঁড়িতে প্রসারিত, শাড়ির কালো পাড়টি বাঁকা হইয়া পড়িয়া সেই দুটি পা বেষ্টন করিয়া আছে। একখানা বই মনোযোগহীন শিথিল দক্ষিণ হস্ত হইতে স্রস্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইল, যেন মূর্তিমতী মধ্যাহ্নলক্ষ্মী। সহসা দিবসের কর্মের মাঝখানে একটি নিস্পন্দ-সুন্দরী অবসরপ্রতিমা। পদতলে গঙ্গা, সম্মুখে সুদূর পরপার এবং ঊর্ধ্বে তীব্রতাপিত নীলাম্বর তাহাদের সেই অন্তরাত্মারূপিণীর দিকে, সেই দুটি খোলা পা, সেই অলস-

বিন্যস্ত বাম বাহু, সেই উৎক্ষিপ্ত বঙ্কিম কণ্ঠরেখার দিকে নিরতিশয় নিস্তব্ধ একাগ্রতার সহিত নীরবে চাহিয়া আছে।

যতক্ষণ দেখা যায় দেখিলাম, দুই সজলপল্লব নেত্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণপদ্ম বারম্বার নিছিয়া মুছিয়া লইলাম।

অবশেষে নৌকা যখন দূরে গেল, মাঝখানে একটি তীরতরুর আড়াল আসিয়া পড়িল, তখন হঠাৎ যেন কী-একটা ত্রুটি স্মরণ হইল, চমকিয়া মাঝিকে কহিলাম, "মাঝি, আজ আর আমার হুগলি যাওয়া হইল না, এইখান হইতেই বাড়ি ফেরো।" কিন্তু ফিরিবার সময় উজানে দাঁড় টানিতে হইল, সেই শব্দে আমি সংকুচিত হইয়া উঠিলাম। সেই দাঁড়ের শব্দে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যাহা সচেতন সুন্দর সুকুমার, যাহা অনন্ত-আকাশ-ব্যাপী অথচ একটি হরিণশাবকের মতো ভীরু। নৌকা যখন ঘাটের নিকটবর্তী হইল তখন দাঁড়ের শব্দে আমার প্রতিবেশিনী প্রথমে ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদু কৌতূহলের সহিত আমার নৌকার দিকে চাহিল, মুহূর্ত পরেই আমার ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টি দেখিয়া সে চকিত হইয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেল; আমার মনে হইল, আমি যেন তাহাকে আঘাত করিলাম, যেন কোথায় তাহার বাজিল!

তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় তাহার ক্রোড় হইতে একটি অর্ধদষ্ট স্বল্পপক্ক পেয়ারা গড়াইতে গড়াইতে নিম্ন সোপানে আসিয়া পড়িল, সেই দশনচিহ্নিত অধরচুম্বিত ফলটির জন্য আমার সমস্ত অন্তঃকরণ উৎসুক হইয়া উঠিল, কিন্তু মাঝিমাল্লাদের লজ্জায় তাহা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়া গেলাম। দেখিলাম, উত্তরোত্তর লোলুপায়মান জোয়ারের জল ছলছল লুব্ধ শব্দে তাহার লোল রসনার দ্বারা সেই ফলটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য বারম্বার উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার নির্লজ্জ অধ্যবসায় চরিতার্থ হইবে ইহাই কল্পনা করিয়া ক্লিষ্টচিত্তে আমি আমার বাড়ির ঘাটে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

বটবৃক্ষচ্ছায়ায় পা ছড়াইয়া দিয়া সমস্তদিন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, দুইখানি, সুকোমল পদপল্লবের তলে বিশ্বপ্রকৃতি মাথা নত করিয়া পড়িয়া আছে—আকাশ আলোকিত, ধরণী পুলকিত, বাতাস উতলা, তাহারই মধ্যে দুইখানি অনাবৃত চরণ স্থির নিস্পন্দ সুন্দর; তাহারা জানেও না যে, তাহাদেরই রেণুকণার মাদকতায় তপ্ত-যৌবন নববসন্ত দিগ্‌বিদিকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

ইতিপূর্বে প্রকৃতি আমার কাছে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছিল, নদী বন আকাশ সমস্তই স্বতন্ত্র ছিল। আজ সেই বিশাল বিপুল বিকীর্ণতার মাঝখানে একটি সুন্দরী প্রতিমূর্তি দেখা দিবামাত্র তাহা অবয়ব ধারণ করিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রকৃতি আমার কাছে এক ও সুন্দর, সে আমাকে অহরহ মূকভাবে অনুনয় করিতেছে, "আমি মৌন, তুমি আমাকে ভাষা দেও, আমার অন্তঃকরণে যে-একটি অব্যক্ত স্তব উত্থিত হইতেছে তুমি তাহাকে ছন্দে লয়ে তানে তোমার সুন্দর মানবভাষায় ধ্বনিত করিয়া তোলো!"

প্রকৃতির সেই নীরব অনুনয়ে আমার হৃদয়ের তন্ত্রী বাজিতে থাকে। বারম্বার কেবল এই গান শুনি, "হে সুন্দরী, হে মনোহারিণী, হে বিশ্বজয়িনী, হে মনপ্রাণ-পতঙ্গের একটিমাত্র দীপশিখা, হে অপরিসীম জীবন, হে অনন্তমধুর মৃত্যু!" এ গান শেষ করিতে পারি না, সংলগ্ন করিতে পারি না; ইহাকে আকারে পরিস্ফুট

করিতে পারি না, ইহাকে ছন্দে গাঁথিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না; মনে হয়, আমার অন্তরের মধ্যে জোয়ারের জলের মতো একটা অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির সঞ্চার হইতেছে, এখনও তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না, যখন পারিব তখন আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ দিব্য সংগীতে ধ্বনিত, আমার ললাট অলৌকিক আভায় আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এমন সময় একটি নৌকা পরপারের নৈহাটি স্টেশন হইতে পার হইয়া আমার বাগানের ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই স্কন্ধের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতাটি কক্ষে লইয়া হাস্যমুখে অমূল্য নামিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে যেরূপ ভাবোদয় হইল, আশা করি, শত্রুর প্রতিও কাহারও যেন সেইরূপ না ঘটে। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাকে সেই বটের ছায়ায় নিতান্ত ক্ষিপ্তের মতো বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অমূল্যের মনে ভারি একটা আশার সঞ্চার হইল। পাছে বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের কোনো-একটা অংশ তাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া বন্য রাজহংসের মতো একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে সে সসংকোচে মৃদুমন্দগমনে আসিতে লাগিল; দেখিয়া আমার আরও রাগ হইল, কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলাম, "কী হে অমূল্য, ব্যাপারখানা কী। তোমার পায়ে কাঁটা ফুটিল নাকি।" অমূল্য ভাবিল, আমি খুব একটা মজার কথা বলিলাম; হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া তরুতল কোঁচা দিয়া বিশেষরূপে ঝাড়িয়া লইল, পকেট হইতে একটি রুমাল লইয়া ভাঁজ খুলিয়া বিছাইয়া তাহার উপরে সাবধানে বসিল; কহিল, "যে প্রহসনটা লিখিয়া পাঠাইয়াছ সেটা পড়িয়া হাসিয়া বাঁচি না।" বলিয়া তাহার স্থানে স্থানে আবৃত্তি করিতে করিতে হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহার নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমার এমনি মনে হইল যে, যে কলমে সেই প্রহসনটা লিখিয়াছিলাম, সেটা যে গাছের কাষ্ঠদণ্ডে নির্মিত সেটাকে শিকড়সুদ্ধ উৎপাটন করিয়া মস্ত একটা আগুনে প্রহসনটাকে ছাই করিয়া ফেলিলেও আমার খেদ মিটিবে না।

অমূল্য সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সে কাব্যের কতদূর।" শুনিয়া আরও আমার গা জ্বলিতে লাগিল; মনে মনে কহিলাম, 'যেমন আমার কাব্য তেমনি তোমার বুদ্ধি!' মুখে কহিলাম, "সে-সব পরে হইবে ভাই, আমাকে অনর্থক ব্যস্ত করিয়া তুলিয়ো না।"

অমূল্য লোকটা কৌতূহলী, চারি দিক পর্যবেক্ষণ না করিয়া সে থাকিতে পারে না, তাহার ভয়ে আমি উত্তরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও দিকে কী আছে হে।" আমি বলিলাম, "কিছু না।" এতবড়ো মিথ্যা কথাটা আমার জীবনে আর কখনও বলি নাই।

দুটা দিন আমাকে নানা প্রকারে বিদ্ধ করিয়া, দগ্ধ করিয়া, তৃতীয় দিনের সন্ধ্যার ট্রেনে অমূল্য চলিয়া গেল। এই দুটা দিন আমি বাগানের উত্তরের দিকে যাই নাই, সে দিকে নেত্রপাতমাত্র করি নাই, কৃপণ যেমন তাহার রত্নভাণ্ডারটি লুকাইয়া বেড়ায় আমি তেমনি করিয়া আমার উত্তরের সীমানার বাগানটি সামলাইয়া বেড়াইতেছিলাম। অমূল্য চলিয়া যাইবামাত্র একেবারে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া দোতলার ঘরের উত্তরের বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উপরে উন্মুক্ত আকাশে প্রথম কৃষ্ণপক্ষের অপর্যাপ্ত জ্যোৎস্না; নিম্নে শাখাজালনিবদ্ধ তরুশ্রেণীতলে খণ্ডকিরণখচিত একটি গভীর

নিভৃত প্রদোষান্ধকার; মর্মরিত ঘনপল্লবের দীর্ঘনিশ্বাসে, তরুতলবিচ্যুত বকুলফুলের নিবিড় সৌরভে এবং সন্ধ্যারণ্যের স্তম্ভিত সংযত নিঃশব্দতায় তাহা রোমে রোমে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। তাহারই মাঝখানটিতে আমার কুমারী প্রতিবেশিনী তাহার শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ পিতার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে কী কথা কহিতেছিল—বৃদ্ধ সস্নেহে অথচ শ্রদ্ধাভরে ঈষৎ অবনমিত হইয়া নীরবে মনোযোগসহকারে শুনিতেছিলেন। এই পবিত্র স্নিগ্ধ বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত করিবার কিছুই ছিল না, সন্ধ্যাকালের শান্ত নদীতে কচিৎ দাঁড়ের শব্দ সুদূরে বিলীন হইতেছিল এবং অবিরল তরুশাখার অসংখ্য নীড়ে দুটি-একটি পাখি দৈবাৎ ক্ষণিক মৃদুকাকলিতে জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার অন্তঃকরণ আনন্দে অথবা বেদনায় যেন বিদীর্ণ হইবে মনে হইল। আমার অস্তিত্ব যেন প্রসারিত হইয়া সেই ছায়ালোকবিচিত্র ধরণীতলের সহিত এক হইয়া গেল, আমি যেন আমার বক্ষঃস্থলের উপর ধীরবিক্ষিপ্ত পদচারণা অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন তরুপল্লবের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়া আমার কানের কাছে মধুর মৃদুগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল; আমি যেন বুঝিতে পারিলাম, ধরণী পায়ের নীচে পড়িয়া থাকে অথচ পা জড়াইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ভিতরে ভিতরে কেমন করিতে থাকে, নতশাখা বনস্পতিগুলি কথা শুনিতে পারে অথচ কিছুই বুঝিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শাখায় পল্লবে মিলিয়া কেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্মাদ কলশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিতে চাহে। আমিও আমার সর্বাঙ্গে সর্বান্তঃকরণে ঐ পদবিক্ষেপ, ঐ বিশ্রম্ভালাপ অব্যবহিতভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনোমতেই ধরিতে পারিলাম না বলিয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিতে লাগিলাম।

পরদিন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে আমার প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভবনাথবাবু তখন বড়ো এক পেয়ালা চা পাশে রাখিয়া চোখে চশমা দিয়া নীল পেন্সিলে দাগ-করা একখানা হ্যামিল্‌টনের পুরাতন পুঁথি মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে চশমার উপরিভাগ হইতে আমাকে কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দেখিলেন, বই হইতে মনটাকে এক মুহূর্তে প্রত্যাহরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অকস্মাৎ সচকিত হইয়া ত্রস্তভাবে আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। আমি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিলাম। তিনি এমনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে চশমার খাপ খুঁজিয়া পাইলেন না। খামকা বলিলেন, "আপনি চা খাইবেন?" আমি যদিও চা খাই না, তথাপি বলিলাম, "আপত্তি নাই।" ভবনাথবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া 'কিরণ' 'কিরণ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকট অত্যন্ত মধুর শব্দ শুনিলাম, "কী বাবা।" ফিরিয়া দেখিলাম, তাপসকন্যা ছিন্ন সহসা আমাকে দেখিয়া ত্রস্ত হরিণীর মতো পলায়নোদ্যত হইয়াছেন। ভবনাথবাবু তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন; আমার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "ইনি আমাদের প্রতিবেশী মহীন্দ্রকুমারবাবু।" এবং আমাকে কহিলেন, "ইনি আমার কন্যা কিরণবালা।" আমি কী করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, ইতিমধ্যে কিরণ আমাকে আনম্রসুন্দর নমস্কার করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ত্রুটি সারিয়া লইয়া তাহা শোধ করিয়া দিলাম। ভবনাথবাবু কহিলেন, "মা, মহীন্দ্রবাবুর জন্য এক পেয়ালা চা আনিয়া দিতে হইবে।" আমি মনে

মনে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া উঠিলাম কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই কিরণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমার মনে হইল, যেন কৈলাসে সনাতন ভোলানাথ তাঁহার কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মীকে অতিথির জন্য এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন; অতিথির পক্ষে সে নিশ্চয়ই অমিশ্র অমৃত হইবে, কিন্তু তবু, কাছাকাছি নন্দীভৃঙ্গী কোনো বেটাই কি হাজির ছিল না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবনাথবাবুর বাড়ি আমি এখন নিত্য অতিথি। পূর্বে চা জিনিসটাকে অত্যন্ত ডরাইতাম, এক্ষণে সকালে বিকালে চা খাইয়া খাইয়া আমার চায়ের নেশা ধরিয়া গেল।

আমাদের বি. এ. পরীক্ষার জন্য জর্মানপণ্ডিত-বিরচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাস আমি সদ্য পাঠ করিয়া আসিয়াছিলাম, তদুপলক্ষে ভবনাথবাবুর সহিত কেবল দর্শন-আলোচনার জন্যই আসিতাম কিছুদিন এইপ্রকার ভাণ করিলাম। তিনি হ্যামিল্‌টন প্রভৃতি কতকগুলি সেকাল-প্রচলিত ভ্রান্ত পুঁথি লইয়া এখনও নিযুক্ত রহিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে আমি কৃপাপাত্র মনে করিতাম, এবং আমার নূতন বিদ্যা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত জাহির করিতে ছাড়িতাম না। ভবনাথবাবু এমনি ভালোমানুষ, এমনি সকল বিষয়ে সসংকোচ যে, আমার মতো অল্পবয়স্ক যুবকের মুখ হইতেও সকল কথা মানিয়া যাইতেন, তিলমাত্র প্রতিবাদ করিতে হইলে অস্থির হইয়া উঠিতেন, ভয় করিতেন পাছে আমি কিছুতে ক্ষুণ্ণ হই। কিরণ আমাদের এই-সকল তত্ত্বালোচনার মাঝখান হইতেই কোনো ছুতায় উঠিয়া চলিয়া যাইত। তাহাতে আমার যেমন ক্ষোভ জন্মিত তেমনি আমি গর্বও অনুভব করিতাম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্য কিরণের পক্ষে দুঃসহ; সে যখন মনে মনে আমার বিদ্যাপর্বতের পরিমাপ করিত তখন তাহাকে কত উচ্চেই চাহিতে হইত।

কিরণকে যখন দূর হইতে দেখিতাম তখন তাহাকে শকুন্তলা দময়ন্তী প্রভৃতি বিচিত্র নামে এবং বিচিত্র ভাবে জানিতাম, এখন ঘরের মধ্যে তাহাকে 'কিরণ' বলিয়া জানিলাম। এখন আর সে জগতের বিচিত্র নায়িকার ছায়ারূপিণী নহে, এখন সে একমাত্র কিরণ। এখন সে শতশতাব্দীর কাব্যলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া অনন্তকালের যুবকচিত্তের স্বপ্নস্বর্গ পরিহার করিয়া একটি নির্দিষ্ট বাঙালিঘরের মধ্যে কুমারী-কন্যারূপে বিরাজ করিতেছে। সে আমারই মাতৃভাষায় আমার সঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ ঘরের কথা বলিয়া থাকে, সামান্য কথায় সরলভাবে হাসিয়া উঠে, সে আমাদেরই ঘরের মেয়ের মতো দুই হাতে দুটি সোনার বালা পরিয়া থাকে, গলার হারটি বেশি কিছু নয় কিন্তু বড়ো সুমিষ্ট—শাড়ির প্রান্তটি কখনও কবরীর উপরিভাগ বাঁকিয়া বেষ্টন করিয়া আসে কখনও বা পিতৃগৃহের অনভ্যাসবশত চ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়, ইহা আমার কাছে বড়ো আনন্দের। সে যে অকাল্পনিক, সে যে সত্য, সে যে কিরণ, সে যে তাহা ব্যতীত নহে এবং তাহার অধিক নহে, এবং যদিচ সে আমার নহে তবুও সে যে আমাদের, সেজন্য আমার অন্তঃকরণ সর্বদাই তাহার প্রতি উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

একদিন জ্ঞানমাত্রেরই আপেক্ষিকতা লইয়া ভবনাথবাবুর নিকট অত্যন্ত উৎসাহ-

সহকারে বাচালতা প্রকাশ করিতেছিলাম ; আলোচনা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র কিরণ উঠিয়া গেল, এবং অনতিকাল পরেই সম্মুখের বারান্দায় একটা তোলা উনান এবং রাঁধিবার সরঞ্জাম আনিয়া রাঁধিয়া ভবনাথবাবুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "বাবা, কেন তুমি মহীন্দ্রবাবুকে ঐ-সকল শক্ত কথা লইয়া বৃথা বকাইতেছ। আসুন মহীন্দ্রবাবু, তার চেয়ে আমার রান্নায় যোগ দিলে কাজে লাগিবে।"

ভবনাথবাবুর কোনো দোষ ছিল না, এবং কিরণ তাহা অবগত ছিল। কিন্তু ভবনাথবাবু অপরাধীর মতো অনুতপ্ত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে! আচ্ছা ও কথাটা আর-একদিন হইবে।" এই বলিয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তিনি তাঁহার নিত্যনিয়মিত অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন।

আবার আর-একদিন অপরাহ্ণে আর-একটা গুরুতর কথা পাড়িয়া ভবনাথবাবুকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছি এমন সময় মাঝখানে আসিয়া কিরণ কহিল, "মহীন্দ্রবাবু, অবলাকে সাহায্য করিতে হইবে। দেয়ালে লতা চড়াইব, নাগাল পাইতেছি না, আপনাকে এই পেরেকগুলি মারিয়া দিতে হইবে।" আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া গেলাম, ভবনাথ-বাবুও প্রফুল্লমনে পড়িতে বসিলেন।

এমনি প্রায় যখনই ভবনাথবাবুর কাছে আমি ভারী কথা পাড়িবার উপক্রম করি, কিরণ একটা-না-একটা কাজের ছুতা ধরিয়া ভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহাতে আমি মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিতাম ; আমি বুঝিতাম যে, কিরণের কাছে আমি ধরা পড়িয়াছি ; সে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভবনাথবাবুর সহিত তত্ত্বালোচনা আমার জীবনের চরম সুখ নহে।

বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যখন দুরূহ রহস্যরসাতলের মধ্যপথে অবতীর্ণ হইয়াছি এমন সময় কিরণ আসিয়া বলিত, "মহীন্দ্রবাবু, রান্নাঘরের পাশে আমার বেগুনের খেত আপনাকে দেখাইয়া আনি গে, চলুন।"

আকাশকে অসীম মনে করা কেবল আমাদের অনুমানমাত্র, আমাদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির বাহিরে কোথাও কোনো-এক রূপে তাহার সীমা থাকা কিছুই অসম্ভব নহে, ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, এমন সময় কিরণ আসিয়া বলিত, "মহীন্দ্রবাবু, দুটা আম পাকিয়াছে, আপনাকে ডাল নামাইয়া ধরিতে হইবে।"

কী উদ্ধার, কী মুক্তি। অকূল সমুদ্রের মাঝখান হইতে এক মুহূর্তে কী সুন্দর কূলে আসিয়া উঠিতাম। অনন্ত আকাশ ও বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে সংশয়জাল যতই দুশ্ছেদ্য জটিল হউক না কেন, কিরণের বেগুনের খেত বা আমতলা সম্বন্ধে কোনো-প্রকার দুরূহতা ও সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। কাব্যে বা উপন্যাসে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে কিন্তু জীবনে তাহা সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায় মনোহর। মাটিতে পা ঠেকা যে কী আরাম তাহা সে-ই জানে যে বহুক্ষণ জলের মধ্যে সাঁতার দিয়াছে। আমি এতদিন কল্পনায় যে প্রেমসমুদ্র সৃজন করিয়াছিলাম তাহা যদি সত্য হইত তবে সেখানে চিরকাল যে কী করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতাম তাহা বলিতে পারি না। সেখানে আকাশও অসীম, সমুদ্রও অসীম, সেখান হইতে আমাদের প্রতিদিবসের বিচিত্র জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধ ব্যাপার একেবারে নির্বাসিত, সেখানে তুচ্ছতার লেশমাত্র নাই, সেখানে কেবল ছন্দে লয়ে সংগীতে ভাব ব্যক্ত করিতে হয়, এবং তলাইতে গেলে কোথাও তল পাওয়া

যায় না। কিরণ সেখান হইতে মজ্জমান এই হতভাগ্যের কেশপাশ ধরিয়া যখন তাহার আমতলায়, তাহার বেগুনের খেতে টানিয়া তুলিল তখন পায়ের তলায় মাটি পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি দেখিলাম, বারান্দায় বসিয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া, মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া, লেবুগাছে ঘনসবুজ পত্ররাশির মধ্য হইতে সবুজ লেবুফল সন্ধান করিতে সাহায্য করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করা যায়, অথচ সে আনন্দ-লাভের জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না—আপনি যে কথা মুখে আসে, আপনি যে হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আকাশ হইতে যতটুকু আলো আসে, এবং গাছ হইতে যতটুকু ছায়া পড়ে তাহাই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া আমার কাছে একটি সোনার কাঠি ছিল আমার নবযৌবন, একটি পরশপাথর ছিল আমার প্রেম, একটি অক্ষয় কল্পতরু ছিল আমার নিজের প্রতি নিজের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। আমি বিজয়ী, আমি ইন্দ্র, আমার উচ্চৈঃশ্রবার পথে কোনো বাধা দেখিতে পাই না। কিরণ, আমার কিরণ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। সে কথা এতক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত মুহূর্তের মধ্যে মহাসুখে বিদীর্ণ করিয়া সে কথা বিদ্যুতের মতো আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধাঁধিয়া ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়া উঠিতেছিল। কিরণ, আমার কিরণ!

ইতিপূর্বে আমি কোনো অনাত্মীয়া মহিলার সংস্রবে আসি নাই, যে নব্যরমণীগণ শিক্ষালাভ করিয়া অবরোধের বাহিরে সঞ্চরণ করেন তাঁহাদের রীতিনীতি আমি কিছুই অবগত নহি, অতএব তাঁহাদের আচরণে কোন্‌খানে শিষ্টতার সীমা, কোন্‌খানে প্রেমের অধিকার তাহা আমি কিছুই জানি না ; কিন্তু ইহাও জানি না, আমাকে কেনই বা ভালো না বাসিবে, আমি কোন্ অংশে ন্যূন।

কিরণ যখন আমার হাতে চায়ের পেয়ালাটি দিয়া যাইত তখন চায়ের সঙ্গে পাত্রভরা কিরণের ভালোবাসাও গ্রহণ করিতাম ; চা'টি যখন পান করিতাম তখন মনে করিতাম, আমার গ্রহণ সার্থক হইল এবং কিরণেরও দান সার্থক হইল। কিরণ যদি সহজ সুরে বলিত, "মহীন্দ্রবাবু, কাল সকালে আসবেন তো?" তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত—

> কী মোহিনী জান, বন্ধু, কী মোহিনী জান!
> অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা-হেন!

আমি সহজ কথায় উত্তর করিতাম, "কাল আটটার মধ্যে আসব।" তাহার মধ্যে কিরণ কি শুনিতে পাইত না—

> পরানপুতলি তুমি হিয়ে-মণিহার,
> সরবস ধন মোর সকল সংসার।

আমার সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি অমৃতে পূর্ণ হইয়া গেল। আমার সমস্ত চিন্তা এবং সমস্ত কল্পনা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া লতার ন্যায় কিরণকে আমার সহিত বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। যখন শুভ-অবসর আসিবে তখন কিরণকে কী পড়াইব, কী শিখাইব, কী শুনাইব, কী দেখাইব তাহারই অসংখ্য সংকল্পে আমার মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এমন-কি স্থির করিলাম জর্মানপণ্ডিত-রচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাসেও যাহাতে তাহার চিত্তের ঔৎসুক্য জন্মে এমন শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে, নতুবা আমাকে সে সর্বতোভাবে বুঝিতে

পারিবে না। ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের সৌন্দর্যলোকে আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। আমি মনে মনে হাসিলাম, কহিলাম, 'কিরণ, তোমার আমতলা, বেগুনের খেত আমার কাছে নূতন রাজ্য। আমি কস্মিনকালে স্বপ্নেও জানিতাম না যে, সেখানে বেগুন এবং ঝড়ে-পড়া কাঁচা আম ছাড়াও দুর্লভ অমৃতফল এত সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সময় আসিবে তখন আমিও তোমাকে এমন এক রাজ্যে লইয়া যাইব যেখানে বেগুন ফলে না কিন্তু তথাপি বেগুনের অভাব মুহূর্তের জন্য অনুভব করিতে হয় না। সে জ্ঞানের রাজ্য, ভাবের স্বর্গ।'

সূর্যাস্তকালে দিগন্তবিলীন পাণ্ডুবর্ণ সন্ধ্যাতারা জনায়মান সায়াহ্নে ক্রমেই যেমন পরিস্ফুট দীপ্তি লাভ করে, কিরণও তেমনি কিছুদিন ধরিয়া ভিতর হইতে আনন্দে লাবণ্যে নারীত্বের পূর্ণতায় যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সে যেন তাহার গৃহের, তাহার সংসারের ঠিক মধ্য-আকাশে অধিরোহণ করিয়া চারি দিকে আনন্দের মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; সেই জ্যোতিতে তাহার বৃদ্ধ পিতার শুভ্রকেশের উপর পবিত্রতার উজ্জ্বল আভা পড়িল, এবং সেই জ্যোতি আমার উদ্বেল হৃদয়-সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গের উপর কিরণের মধুর নামের একটি করিয়া জ্যোতির্ময় স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিল।

এ দিকে আমার ছুটি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল, বিবাহ-উদ্দেশে বাড়ি আসিবার জন্য পিতার সস্নেহ অনুরোধ ক্রমে কঠিন আদেশে পরিণত হইবার উপক্রম হইল— এ দিকে অমূল্যকেও আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে কোন্‌দিন উন্মত্ত বন্যহস্তীর ন্যায় আমার এই পদ্মবনের মাঝখানে ফস্‌ করিয়া তাহার বিপুল চরণচতুষ্টয় নিক্ষেপ করিবে এ উদ্‌বেগও উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। কেমন করিয়া অবিলম্বে অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়া আমার প্রণয়কে পরিণয়ে বিকশিত করিয়া তুলিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবনাথবাবুর গৃহে গিয়া দেখি, তিনি গ্রীষ্মের উত্তাপে চৌকিতে ঠেসান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এবং সম্মুখে গঙ্গাতীরের বারান্দায় নির্জন ঘাটের সোপানে বসিয়া কিরণ কী বই পড়িতেছে। আমি নিঃশব্দপদে পশ্চাতে গিয়া দেখি, একখানি নূতন কাব্যসংগ্রহ, যে পাতাটি খোলা আছে তাহাতে শেলির একটি কবিতা উদ্‌ধৃত এবং তাহার পার্শ্বে লাল কালিতে একটি পরিষ্কার লাইন টানা। সেই কবিতাটি পাঠ করিয়া কিরণ ঈষৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বপ্নভারাকুল নয়নে আকাশের দূরতম প্রান্তের দিকে চাহিল; বোধ হইল যেন সেই একটি কবিতা কিরণ আজ এক ঘণ্টা ধরিয়া দশবার করিয়া পড়িয়াছে এবং অনন্ত নীলাকাশে আপন হৃদয়তরণীর পালে একটিমাত্র উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস দিয়া তাহাকে অতিদূর নক্ষত্রলোকে প্রেরণ করিয়াছে। শেলি কাহার জন্য এই কবিতাটি লিখিয়াছিল জানি না; মহীন্দ্রনাথ-নামক কোনো বাঙালি যুবকের জন্য লেখে নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ এই গঙ্গাতীরে আমি ছাড়া আর-কাহারও অধিকার নাই ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কিরণ এই কবিতাটির পাশে আপন অন্তরতম হৃদয়-পেন্সিল দিয়া

একটি উজ্জ্বল রক্তচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে, সেই মায়াগণ্ডির মোহমন্ত্রে কবিতাটি আজ তাহারই, এবং সেই সঙ্গে আমারও। আমি পুলকোচ্ছ্বসিত চিত্তকে সম্বরণ করিয়া সহজ সুরে কহিলাম, "কী পড়িতেছেন।" পালভরা নৌকা যেন হঠাৎ চড়ায় ঠেকিয়া গেল। কিরণ চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া একেবারে আঁচলের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল। আমি হাসিয়া কহিলাম, "বইখানা একবার দেখিতে পারি?" কিরণকে কী যেন বাজিল, সে আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিল, "না না, ও বই থাক্।"

আমি কিয়দ্দূরে একটা ধাপ নীচে বসিয়া ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের কথা উত্থাপন করিলাম, এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্যশিক্ষা হয় এবং আমারও মনের কথা ইংরাজ কবির জবানিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে। খররৌদ্রতাপে সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জলের স্থলের ছোটো ছোটো কলশব্দগুলি জননীর ঘুমপাড়ানি-গানের মতো অতিশয় মৃদু এবং সকরুণ হইয়া আসিল।

কিরণ যেন অধীর হইয়া উঠিল ; কহিল, "বাবা একা বসিয়া আছেন, অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে আপনাদের সে তর্কটা শেষ করিবেন না?" আমি মনে মনে ভাবিলাম, 'অনন্ত আকাশ তো চিরকাল থাকিবে এবং তাহার সম্বন্ধে তর্কও তো কোনোকালে শেষ হইবে না, কিন্তু জীবন স্বল্প এবং শুভ অবসর দুর্লভ ও ক্ষণস্থায়ী।' কিরণের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম, "আমার কতকগুলি কবিতা আছে, আপনাকে শুনাইব।" কিরণ কহিল, "কাল শুনিব।" বলিয়া একেবারে উঠিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মহীন্দ্রবাবু আসিয়াছেন।" ভবনাথবাবু নিদ্রাভঙ্গে বালকের ন্যায় তাঁহার সরল নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমার বক্ষে যেন ধক্ করিয়া একটা মস্ত ঘা লাগিল। ভবনাথবাবুর ঘরে গিয়া অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে তর্ক করিতে লাগিলাম। কিরণ বই হাতে লইয়া দোতলায় বোধ হয় তাহার নির্জন শয়নকক্ষে নির্বিঘ্নে পড়িতে গেল।

পরদিন সকালের ডাকে লাল পেন্সিলের দাগ-দেওয়া একখানা স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ পাওয়া গেল, তাহাতে বি. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। প্রথমেই প্রথম-ডিবিশান-কোঠায় কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চোখে পড়িল ; আমার নিজের নাম প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কোনো বিভাগেই নাই।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাগ্নির ন্যায় একটা সন্দেহ বাজিতে লাগিল যে, কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো আমাদেরই কিরণবালা। সে যে কালেজে পড়িয়াছে বা পরীক্ষা দিয়াছে, এ কথা যদিও আমাকে বলে নাই তথাপি সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। কারণ, ভাবিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতা এবং তাঁহার কন্যাটি নিজেদের সম্বন্ধে কোনো কথাই কখনও আলাপ করেন নাই, এবং আমিও নিজের আখ্যান বলিতে এবং নিজের বিদ্যা প্রচার করিতে সর্বদাই এমন নিযুক্ত ছিলাম যে, তাঁহাদের কথা ভালো করিয়া জিজ্ঞাসাও করি নাই।

জর্মানপণ্ডিত-রচিত আমার নূতন-পড়া দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধীয় তর্কগুলি আমার মনে পড়িতে লাগিল, এবং মনে পড়িল, আমি একদিন কিরণকে বলিয়াছিলাম, আপনাকে যদি আমি কিছুদিন গুটিকতক বই পড়াইবার সুযোগ পাই তাহা হইলে

ইংরাজি কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে আপনার একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাইতে পারি।

কিরণবালা দর্শনশাস্ত্রে অনার লইয়াছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা। যদি এই কিরণ হয়।

অবশেষে প্রবল খোঁচা দিয়া আপন ভস্মাচ্ছন্ন অহংকারকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিলাম, "হয় হউক—আমার রচনাবলী আমার জয়স্তম্ভ।" বলিয়া খাতা-হাতে সবলে পা ফেলিয়া মাথা পূর্বাপেক্ষা উচ্চে তুলিয়া ভবনাথবাবুর বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন তাঁহার ঘরে কেহ ছিল না। আমি একবার ভালো করিয়া বৃদ্ধের পুস্তকগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক কোণে আমার সেই নব্য জর্মানপণ্ডিত-রচিত দর্শনের ইতিহাসখানি অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে; খুলিয়া দেখিলাম, ভবনাথ-বাবুর স্বহস্তলিখিত নোটে তাহার মার্জিন পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ নিজে তাঁহার কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমার আর সন্দেহ রহিল না।

ভবনাথবাবু অন্যদিনের অপেক্ষা প্রসন্নজ্যোতির্বিচ্ছুরিত মুখে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, যেন কোনো সুসংবাদের নির্ঝরধারায় তিনি সদ্য প্রাতঃস্নান করিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ কিছু দম্ভের ভাবে রুক্ষহাস্য হাসিয়া কহিলাম, "ভবনাথবাবু, আমি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি।" যে-সকল বড়ো বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি যেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইলাম। পরীক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায় চাকুরি প্রভৃতিতে কৃতকার্য হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ, নিম্নতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকেদেরই অকৃতকার্য হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভবনাথবাবুর মুখ সস্নেহকরুণ হইয়া আসিল, তিনি তাঁহার কন্যার পরীক্ষোত্তরণসংবাদ আমাকে আর দিতে পারিলেন না; কিন্তু আমার অসংগত উগ্র প্রফুল্লতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সরল বুদ্ধিতে আমার গর্বের কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

এমন সময় আমাদের কালেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সহিত কিরণ সলজ্জ সরসোজ্জ্বল মুখে বর্ষাধৌত লতাটির মতো ছল্‌ছল্‌ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। রাত্রে বাড়িতে আসিয়া আমার রচনাবলীর খাতাখানা পুড়াইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।

গঙ্গার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখিবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।

ভাদ্র ১৩০৫

রাজটিকা

নবেন্দুশেখরের সহিত অরুণলেখার যখন বিবাহ হইল, তখন হোমধূমের অন্তরাল হইতে ভগবান প্রজাপতি ঈষৎ একটু হাস্য করিলেন। হায়, প্রজাপতির পক্ষে যাহা খেলা আমাদের পক্ষে তাহা সকল সময়ে কৌতুকের নহে।

নবেন্দুশেখরের পিতা পূর্ণেন্দুশেখর ইংরাজরাজ-সরকারে বিখ্যাত। তিনি এই ভবসমুদ্রে কেবলমাত্র দ্রুতবেগে সেলাম-চালনা-দ্বারা রায়বাহাদুর পদবীর উত্তুঙ্গ মরুকূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; আরও দুর্গমতর সম্মানপথের পাথেয় তাঁহার ছিল, কিন্তু পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে অনতিদূরবর্তী রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরি-চূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করিয়া এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাববর্জিত লোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার বহু-সেলাম-শিথিল গ্রীবাগ্রন্থি শ্মশানশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিল।

কিন্তু, বিজ্ঞানে বলে, শক্তির স্থানান্তর ও রূপান্তর আছে, নাশ নাই— চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচঞ্চলা সখী সেলামশক্তি পৈতৃক স্কন্ধ হইতে পুত্রের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং নবেন্দুর নবীন মস্তক তরঙ্গতাড়িত কুষ্মাণ্ডের মতো ইংরাজের দ্বারে দ্বারে অবিশ্রাম উঠিতে পড়িতে লাগিল।

নিঃসন্তান অবস্থায় ইঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যে পরিবারে ইনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন সেখানকার ইতিহাস ভিন্নপ্রকার।

সে পরিবারের বড়োভাই প্রমথনাথ পরিচিতবর্গের প্রীতি এবং আত্মীয়বর্গের আদরের স্থল ছিলেন। বাড়ির লোকে এবং পাড়ার পাঁচজনে তাঁহাকে সর্ববিষয়ে অনুকরণস্থল বলিয়া জানিত।

প্রমথনাথ বিদ্যায় বি. এ. এবং বুদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু মোটা মাহিনা বা জোর কলমের ধার ধারিতেন না; মুরুব্বির বলও তাঁহার বিশেষ ছিল না, কারণ, ইংরাজ তাঁহাকে যে পরিমাণ দূরে রাখিত তিনিও তাহাকে সেই পরিমাণ দূরে রাখিয়া চলিতেন। অতএব, গৃহকোণ ও পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রমথনাথ জাজ্বল্যমান ছিলেন, দূরস্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কোনো ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

এই প্রমথনাথ একবার বছরতিনেকের জন্য বিলাতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে ইংরাজের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের অপমান-দুঃখ ভুলিয়া ইংরাজি সাজ পরিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভাইবোনেরা প্রথমটা একটু কুণ্ঠিত হইল, অবশেষে দুইদিন পরে বলিতে লাগিল, ইংরাজি কাপড়ে দাদাকে যেমন মানায় এমন আর-কাহাকেও না; ইংরাজি বস্ত্রের গৌরবগর্ব পরিবারের অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইল।

প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন 'কী করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্যায় রক্ষা করিয়া চলিতে হয় আমি তাহারই অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইব'— নত না হইলে ইংরাজের সহিত মিলন হয় না এ কথা যে বলে সে নিজের হীনতা প্রকাশ করে এবং ইংরাজকেও অন্যায় অপরাধী করিয়া থাকে।

প্রমথনাথ বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের কাছ হইতে অনেক সাদরপত্র আনিয়া

ভারতবর্ষীয় ইংরাজমহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমন-কি মধ্যে মধ্যে সম্রান্ত ইংরাজের চা, ডিনার, খেলা এবং হাস্যকৌতুকের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ পাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যমদমত্ততায় ক্রমশই তাঁহার শিরা-উপশিরাগুলি অল্প অল্প রীরী করিতে শুরু করিল।

এমন সময়ে একটি নূতন রেলওয়ে লাইন খোলা উপলক্ষে রেলওয়ে কোম্পানির নিমন্ত্রণে ছোটোলাটের সঙ্গে দেশের অনেকগুলি রাজপ্রসাদগর্বিত সম্ভ্রান্তলোকে গাড়ি বোঝাই করিয়া নবলৌহপথে যাত্রা করিলেন। প্রমথনাথও তাহার মধ্যে ছিলেন।

ফিরিবার সময় একটা ইংরাজ দারোগা দেশীয় বড়োলোকদিগকে কোনো-এক বিশেষ গাড়ি হইতে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া নামাইয়া দিল। ইংরাজবেশধারী প্রমথনাথও মানে মানে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দারোগা কহিল, "আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বসুন-না।"

এই বিশেষ সম্মানে প্রথমনাথ প্রথমটা একটু স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, যখন তৃণহীন কর্ষণধূসর পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তসীমা হইতে ম্লান সূর্যাস্ত-আভা সকরুণরক্তিম লজ্জার মতো সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং যখন তিনি একাকী বসিয়া বাতায়নপথ হইতে অনিমেষনয়নে বনান্তরালবাসিনী কুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তখন ধিক্কারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালাময়ী অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তাঁহার মনে একটা গল্পের উদয় হইল। একটি গর্দভ রাজপথ দিয়া দেবপ্রতিমার রথ টানিয়া চলিতেছিল, পথিকবর্গ তাহার সম্মুখে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিতেছিল এবং মূঢ় গর্দভ আপন মনে ভাবিতেছিল, 'সকলে আমাকেই সম্মান করিতেছে।'

প্রমথনাথ মনে মনে কহিলেন, 'গর্দভের সহিত আমার এই একটু প্রভেদ দেখিতেছি, আমি আজ বুঝিয়াছি, সম্মান আমাকে নহে, আমার স্কন্ধের বোঝাগুলাকে।'

প্রমথনাথ বাড়ি আসিয়া বাড়ির ছেলেপুলে সকলকে ডাকিয়া একটা হোমাগ্নি জ্বালাইলেন এবং বিলাতি বেশভূষাগুলো একে একে আহুতিস্বরূপ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

শিখা যতই উচ্চ হইয়া উঠিল ছেলেরা ততই উচ্ছ্বসিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পর হইতে প্রমথনাথ ইংরাজঘরের চায়ের চুমুক এবং রুটির টুকরা পরিত্যাগ করিয়া পুনশ্চ গৃহকোণদুর্গের মধ্যে দুর্গম হইয়া বসিলেন, এবং পূর্বোক্ত লাঞ্ছিত উপাধিধারীগণ পূর্ববৎ ইংরাজের দ্বারে দ্বারে উষ্ণীষ আন্দোলিত করিয়া ফিরিতে লাগিল।

দৈবদুর্যোগে দুর্ভাগ্য নবেন্দুশেখর এই পরিবারের একটি মধ্যমা ভগিনীকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। বাড়ির মেয়েগুলি লেখাপড়াও যেমন জানে দেখিতে শুনিতেও তেমনি; নবেন্দু ভাবিলেন, 'বড়ো জিতিলাম।'

কিন্তু 'আমাকে পাইয়া তোমরা জিতিয়াছ' এ কথা প্রমাণ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। কোন্ সাহেব তাঁহার বাবাকে কবে কী চিঠি লিখিয়াছিল তাহা যেন নিতান্ত ভ্রমবশত দৈবক্রমে পকেট হইতে বাহির করিয়া শ্যালীদের হস্তে চালনা করিয়া

দিতে লাগিলেন। শ্যালীদের সুকোমল বিম্বোষ্ঠের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণপ্রখর হাসি যখন টুক্‌টুকে মখমলের খাপের ভিতরকার ঝক্‌ঝকে ছোরার মতো দেখা দিতে লাগিল, তখন স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে হতভাগ্যের চৈতন্য জন্মিল। বুঝিল, 'বড়ো ভুল করিয়াছি।'

শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা লাবণ্যলেখা একদা শুভদিন দেখিয়া নবেন্দুর শয়নকক্ষের কুলুঙ্গির মধ্যে দুই জোড়া বিলাতি বুট সিন্দুরে মণ্ডিত করিয়া স্থাপন করিল; এবং তাহার সম্মুখে ফুলচন্দন ও দুই জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া দিল। নবেন্দু ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দুই শ্যালী তাহার দুই কান ধরিয়া কহিল, "তোমার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করো, তাঁহার কল্যাণে তোমার পদবৃদ্ধি হউক।"

তৃতীয়া শ্যালী কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোন্স্‌ স্মিথ ব্রাউন টম্‌সন প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরাজি নাম লাল সুতা দিয়া সেলাই করিয়া একদিন মহাসমারোহে নবেন্দুকে নামাবলি উপহার দিল।

চতুর্থ শ্যালী শশাঙ্কলেখা যদিও বয়ঃক্রম হিসাবে গণ্যব্যক্তির মধ্যে নহে, বলিল, "ভাই, আমি একটি জপমালা তৈরি করিয়া দিব। সাহেবের নাম জপ করিবে।"

তাহার বড়ো বোনরা তাহাকে শাসন করিয়া বলিল, "যাঃ, তোর আর জ্যাঠামি করিতে হইবে না।"

নবেন্দুর মনে মনে রাগও হয়, লজ্জাও হয়, কিন্তু শ্যালীদের ছাড়িতেও পারে না; বিশেষত বড়োশ্যালীটি বড়ো সুন্দরী। তাহার মধুও যেমন কাঁটাও তেমনি; তাহার নেশা এবং তাহার জ্বালা দুটোই মনের মধ্যে একেবারে লাগিয়া থাকে। ক্ষতপক্ষ পতঙ্গ রাগিয়া ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে অথচ অন্ধ অবোধের মতো চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে।

অবশেষে শ্যালীসংসর্গের প্রবল মোহে পড়িয়া সাহেবের সোহাগলালসা নবেন্দু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে লাগিল। বড়োসাহেবকে যেদিন সেলাম নিবেদন করিতে যাইত শ্যালীদিগকে বলিত, "সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছি।" দার্জিলিং হইতে প্রত্যাসন্ন মেজোসাহেবকে স্টেশনে সম্মান জ্ঞাপন করিতে যাইবার সময় শ্যালী-দিগকে বলিয়া যাইত, "মেজোমামার সহিত দেখা করিতে চলিলাম।"

সাহেব এবং শ্যালী এই দুই নৌকায় পা দিয়া হতভাগা বিষম সংকটে পড়িল। শ্যালীরা মনে মনে কহিল, 'তোমার অন্য নৌকাটাকে ফুটা না করিয়া ছাড়িব না।'

মহারানীর আগামী জন্মদিনে নবেন্দু খেতাব-স্বর্গলোকের প্রথম সোপানে রায়-বাহাদুর-পদবীতে পদার্পণ করিবেন এইরূপ গুজব শুনা গেল, কিন্তু সেই সম্ভাবিত সম্মানলাভের আনন্দ-উচ্ছ্বসিত সংবাদ ভীরু বেচারা শ্যালীদিগের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিল না; কেবল একদিন শরৎশুক্লপক্ষের সায়াহ্নে সর্বনেশে চাঁদের আলোকে পরিপূর্ণ চিত্তাবেগে স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। পরদিন দিবালোকে স্ত্রী পাল্কি করিয়া তাহার বড়োদিদির বাড়ি গিয়া অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিল। লাবণ্য কহিল, "তা বেশ তো, রায়বাহাদুর হইয়া তোর স্বামীর তো লেজ বাহির হইবে না, তোর এত লজ্জাটা কিসের।"

অরুণলেখা বারম্বার বলিতে লাগিল, "না দিদি, আর যা-ই হই, আমি রায়-বাহাদুরনী হইতে পারিব না।"

আসল কথা, অরুণের পরিচিত ভূতনাথবাবু রায়বাহাদুর ছিলেন, পদবীটার প্রতি আন্তরিক আপত্তির কারণ তাহাই।

লাবণ্য অনেক আশ্বাস দিয়া কহিল, "আচ্ছা, তোকে সেজন্য ভাবিতে হইবে না।"

বক্সারে লাবণ্যর স্বামী নীলরতন কাজ করিতেন। শরতের অবসানে নবেন্দু সেখান হইতে লাবণ্যর নিমন্ত্রণ পাইলেন। সানন্দচিত্তে অনতিবিলম্বে গাড়ি চড়িয়া যাত্রা করিলেন। রেলে চড়িবার সময় তাঁহার বামাঙ্গ কাঁপিল না, কিন্তু তাহা হইতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, আসন্ন বিপদের সময় বামাঙ্গ কাঁপাটা একটা অমূলক কুসংস্কারমাত্র।

লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নবশীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অরুণে পাণ্ডুরে পূর্ণপরিস্ফুট হইয়া নির্মল শরৎকালের নির্জননদীকূললালিতা অম্লান-প্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।

নবেন্দুর মুগ্ধ দৃষ্টির উপরে যেন একটি পূর্ণপুষ্পিতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোজ্জ্বল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।

মনের আনন্দে এবং পশ্চিমের হাওয়ায় নবেন্দুর অজীর্ণ রোগ দূর হইয়া গেল। স্বাস্থ্যের নেশায়, সৌন্দর্যের মোহে এবং শ্যালীহস্তের শুশ্রূষাপুলকে সে যেন মাটি ছাড়িয়া আকাশের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের বাগানের সম্মুখ দিয়া পরিপূর্ণ গঙ্গা যেন তাহারই মনের দুরন্ত পাগলামিকে আকার দান করিয়া বিষম গোলমাল করিতে করিতে প্রবল আবেগে নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত।

ভোরের বেলা নদীতীরে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় শীতপ্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্র যেন প্রিয়মিলনের উত্তাপের মতো তাহার সমস্ত শরীরকে চরিতার্থ করিয়া দিত। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া শ্যালীর শখের রন্ধনে জোগান দিবার ভার লইয়া নবেন্দুর অজ্ঞতা ও অনৈপুণ্য পদে পদে প্রকাশ পাইতে থাকিত। কিন্তু, অভ্যাস ও মনোযোগের দ্বারা উত্তরোত্তর তাহা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য মূঢ় অনভিজ্ঞের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না; কারণ, প্রত্যহ নিজেকে অপরাধী করিয়া সে যে-সকল তাড়না ভর্ৎসনা লাভ করিত তাহাতে কিছুতেই তাহার তৃপ্তির শেষ হইত না। যথাযথ পরিমাণে মালমসলা বিভাগ, উনান হইতে হাঁড়ি তোলা-নামা, উত্তাপাধিক্যে ব্যঞ্জন পুড়িয়া না যায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়ে সে যে সদ্যোজাত শিশুর মতো অপটু অক্ষম এবং নিরুপায় ইহাই প্রত্যহ বলপূর্বক প্রমাণ করিয়া নবেন্দু শ্যালীর কৃপা-মিশ্রিত হাস্য এবং হাস্যমিশ্রিত লাঞ্ছনা মনের সুখে ভোগ করিত।

মধ্যাহ্নে এক দিকে ক্ষুধার তাড়না অন্য দিকে শ্যালীর পীড়াপীড়ি, নিজের আগ্রহ এবং প্রিয়জনের ঔৎসুক্য, রন্ধনের পারিপাট্য এবং রন্ধনীর সেবামাধুর্য, উভয়ের সংযোগে ভোজন-ব্যাপারের ওজন রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত।

আহারের পর সামান্য তাস খেলাতেও নবেন্দু প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিত না। চুরি করিত, হাতের কাগজ দেখিত, কাড়াকাড়ি বকাবকি বাধাইয়া দিত কিন্তু তবু জিতিতে পারিত না। না জিতিলেও জোর করিয়া তাহার হার অস্বীকার করিত এবং সেজন্য প্রত্যহ তাহার গঞ্জনার সীমা থাকিত না; তথাপিও পাষণ্ড আত্মসংশোধনচেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

কেবল এক বিষয়ে তাহার সংশোধন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সাহেবের সোহাগ যে জীবনের চরম লক্ষ্য এ কথা সে উপস্থিতমত ভুলিয়া গিয়াছিল। আত্মীয়স্বজনের শ্রদ্ধা ও স্নেহ যে কত সুখের ও গৌরবের ইহাই সে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছিল।

তাহা ছাড়া, সে যেন এক নূতন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। লাবণ্যর স্বামী নীলরতনবাবু আদালতে বড়ো উকিল হইয়াও সাহেবসুবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না বলিয়া অনেক কথা উঠিত। তিনি বলিতেন, "কাজ কী, ভাই। যদি পাল্টা ভদ্রতা না করে তবে আমি যাহা দিলাম তাহা তো কোনোমতেই ফিরাইয়া পাইব না। মরুভূমির বালি ফুট্‌ফুটে সাদা বলিয়াই কি তাহাতে বীজ বুনিয়া কোনো সুখ আছে। ফসল ফিরিয়া পাইলে কালো জমিতেও বীজ বোনা যায়।"

নবেন্দুও টানে পড়িয়া দলে ভিড়িয়া গেল। তাহার আর পরিণামচিন্তা রহিল না। পৈতৃক এবং স্বকীয় যত্নে পূর্বে জমি যাহা পাট করা ছিল তাহাতেই রায়বাহাদুর-খেতাবের সম্ভাবনা আপনিই বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর নবজলসিঞ্চনের প্রয়োজন রহিল না। নবেন্দু ইংরাজের বিশেষ একটি শখের শহরে এক বহুব্যয়সাধ্য ঘোড়দৌড়স্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হেনকালে কন্‌গ্রেসের সময় নিকটবর্তী হইল। নীলরতনের নিকট চাঁদা-সংগ্রহের অনুরোধপত্র আসিল।

নবেন্দু লাবণ্যর সহিত মনের আনন্দে নিশ্চিন্তমনে তাস খেলিতেছিল। নীলরতন খাতা-হস্তে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কহিল, "একটা সই দিতে হইবে।"

পূর্বসংস্কারক্রমে নবেন্দুর মুখ শুকাইয়া গেল। লাবণ্য শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "খবরদার, এমন কাজ করিয়ো না, তোমার ঘোড়দৌড়ের মাঠখানা মাটি হইয়া যাইবে।"

নবেন্দু আস্ফালন করিয়া কহিল, "সেই ভাবনায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না!"

নীলরতন আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমার নাম কোনো কাগজে প্রকাশ হইবে না।"

লাবণ্য অত্যন্ত চিন্তিত বিজ্ঞভাবে কহিল, "তবু কাজ কী। কী জানি কথায় কথায়—"

নবেন্দু তীব্রস্বরে কহিল, "কাগজে প্রকাশ হইলে আমার নাম ক্ষইয়া যাইবে না।"

এই বলিয়া নীলরতনের হাত হইতে খাতা টানিয়া একেবারে হাজার টাকা ফস্ করিয়া সই করিয়া দিল। মনের মধ্যে আশা রহিল, কাগজে সংবাদ বাহির হইবে না।

লাবণ্য মাথায় হাত দিয়া কহিল, "করিলে কী।"

নবেন্দু দর্পভরে কহিল, "কেন, অন্যায় কী করিয়াছি।"

লাবণ্য কহিল, "শেয়ালদা স্টেশনের গার্ড, হোয়াইট্-অ্যাবের দোকানের অ্যাসিস্টান্ট্, হার্টব্রাদার্সের সহিস-সাহেব, এঁরা যদি তোমার উপর রাগ করিয়া অভিমান করিয়া বসেন, যদি তোমার পূজোর নিমন্ত্রণে শ্যাম্পেন খাইতে না আসেন, যদি দেখা হইলে তোমার পিঠ না চাপড়ান!"

নবেন্দু উদ্ধতভাবে কহিল, "তাহা হইলে আমি বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিব।"

দিনকয়েক পরেই নবেন্দু প্রাতঃকালে চা খাইতে খাইতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, হঠাৎ চোখে পড়িল এক X-স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়া কন্‌গ্রেসের চাঁদার কথা প্রকাশ করিয়াছে এবং তাঁহার মতো লোককে দলে পাইয়া কন্‌গ্রেসের যে কতটা বলবৃদ্ধি হইয়াছে লোকটা তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

কন্‌গ্রেসের দলবৃদ্ধি! হা স্বর্গগত তাত পূর্ণেন্দুশেখর! কন্‌গ্রেসের দলবৃদ্ধি করিবার জন্যই কি তুমি হতভাগাকে ভারতভূমিতে জন্মদান করিয়াছিলে!

কিন্তু, দুঃখের সঙ্গে সুখও আছে। নবেন্দুর মতো লোক যে যে-সে লোক নহেন, তাঁহাকে নিজতীরে তুলিবার জন্য যে এক দিকে ভারতবর্ষীয় ইংরাজসম্প্রদায় অপর দিকে কন্‌গ্রেস লালায়িতভাবে ছিপ ফেলিয়া অনিমিষলোচনে বসিয়া আছে, এ কথাটা নিতান্ত ঢাকিয়া রাখিবার কথা নহে। অতএব নবেন্দু হাসিতে হাসিতে কাগজখানা লইয়া লাবণ্যকে দেখাইলেন। কে লিখিয়াছে যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে লাবণ্য আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, "ওমা, এ যে সমস্তই ফাঁস করিয়া দিয়াছে! আহা! আহা! তোমার এমন শত্রু কে ছিল! তাহার কলমে যেন ঘুণ ধরে, তাহার কালিতে যেন বালি পড়ে, তাহার কাগজ যেন পোকায় কাটে—"

নবেন্দু হাসিয়া কহিল, "আর অভিশাপ দিয়ো না। আমি আমার শত্রুকে মার্জনা করিয়া আশীর্বাদ করিতেছি, তাহার সোনার দোয়াত-কলম হয় যেন।"

দুইদিন পরে কন্‌গ্রেসের বিপক্ষপক্ষীয় একখানা ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজি কাগজ ডাকযোগে নবেন্দুর হাতে আসিয়া পৌঁছিলে পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে 'One who knows'-স্বাক্ষরে পূর্বোক্ত সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। লেখক লিখিতেছেন যে, নবেন্দুকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা তাঁহার নামে এই দুর্নামরটনা কখনোই বিশ্বাস করিতে পারেন না; চিতাবাঘের পক্ষে নিজ চর্মের কৃষ্ণ অঙ্কগুলির পরিবর্তন যেমন অসম্ভব নবেন্দুর পক্ষেও কন্‌গ্রেসের দলবৃদ্ধি করা তেমনি। বাবু নবেন্দুশেখরের যথেষ্ট নিজস্ব পদার্থ আছে, তিনি কর্মশূন্য উমেদার ও মক্কেলশূন্য আইনজীবী নহেন। তিনি দুইদিন বিলাতে ঘুরিয়া বেশভূষা-আচারব্যবহারে অদ্ভুত কপিবৃত্তি করিয়া স্পর্ধাভরে ইংরাজ-সমাজে প্রবেশোদ্যত হইয়া অবশেষে ক্ষুণ্ণমনে হতাশভাবে ফিরিয়া আসেন নাই, অতএব কেন যে তিনি এই সকল— ইত্যাদি ইত্যাদি।

হা পরলোকগত পিতঃ পূর্ণেন্দুশেখর! ইংরাজের নিকট এত নাম, এত বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া তবে তুমি মরিয়াছিলে!

এ চিঠিখানিও শ্যালীর নিকট পেখমের মতো বিস্তার করিয়া ধরিবার যোগ্য। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে যে, নবেন্দু অখ্যাত অকিঞ্চন লক্ষ্মীছাড়া নহেন, তিনি সারবান পদার্থবান লোক।

লাবণ্য পুনশ্চ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, "এ আবার তোমার কোন্ পরমবন্ধু লিখিল! কোন্ টিকিট-কালেক্টর, কোন্ চামড়ার দালাল, কোন্ গড়ের বাদ্যের বাজনদার!"

নীলরতন কহিল, "এ চিঠির একটা প্রতিবাদ করা তো তোমার উচিত।"

নবেন্দু কিছু উঁচু চালে বলিল, "দরকার কী। যে যা বলে তাহারই কি প্রতিবাদ করিতে হইবে।"

লাবণ্য উচ্চৈস্বরে চারি দিকে একেবারে হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া দিল।

নবেন্দু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "এত হাসি যে!"

তাহার উত্তরে লাবণ্য পুনর্বার অনিবার্য বেগে হাসিয়া পুষ্পিতযৌবনা দেহলতা লুণ্ঠিত করিতে লাগিল।

নবেন্দু নাকে মুখে চোখে এই প্রচুর পরিহাসের পিচকারি খাইয়া অত্যন্ত নাকাল

হইল। একটু ক্ষুণ্ন হইয়া কহিল, "তুমি মনে করিতেছ, প্রতিবাদ করিতে আমি ভয় করি!"

লাবণ্য কহিল, "তা কেন! আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার অনেক আশাভরসার সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি বাঁচাইবার চেষ্টা এখনও ছাড় নাই— যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

নবেন্দু কহিল, "আমি বুঝি সেইজন্য লিখিতে চাহি না!" অত্যন্ত রাগিয়া দোয়াতকলম লইয়া বসিল। কিন্তু, লেখার মধ্যে রাগের রক্তিমা বড়ো প্রকাশ পাইল না, কাজেই লাবণ্য ও নীলরতনকে সংশোধনের ভার লইতে হইল। যেন লুচিভাজার পালা পড়িল; নবেন্দু যেটা জলে ও ঘিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নরম নরম করিয়া এবং চাপিয়া যথাসাধ্য চেপ্টা করিয়া বেলিয়া দেয় তাঁহার দুই সহকারী তৎক্ষণাৎ সেটাকে ভাজিয়া কড়া ও গরম করিয়া ফুলাইয়া ফুলাইয়া তোলে। লেখা হইল যে, আত্মীয় যখন শত্রু হয় তখন বহিঃশত্রু অপেক্ষা ভয়ংকর হইয়া উঠে। পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারত-গবর্মেণ্টের তেমন শত্রু নহে যেমন শত্রু গর্বোদ্ধত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়। গবর্মেণ্টের সহিত প্রজাসাধারণের নিরাপদ সৌহার্দ্যবন্ধনের তাহারাই দুর্ভেদ্য অন্তরায়। কন্‌গ্রেস রাজা ও প্রজার মাঝখানে স্থায়ী সদ্ভাবসাধনের যে প্রশস্ত রাজপথ খুলিয়াছে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো ঠিক তাহার মধ্যস্থল জুড়িয়া একেবারে কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে। ইত্যাদি।

নবেন্দুর ভিতরে ভিতরে ভয়-ভয় করিতে লাগিল অথচ 'লেখাটা বড়ো সরেস হইয়াছে' মনে করিয়া, রহিয়া রহিয়া একটু আনন্দও হইতে লাগিল। এমন সুন্দর রচনা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া নানা কাগজে বিবাদবিসম্বাদ-বাদপ্রতিবাদে নবেন্দুর চাঁদা এবং কন্‌গ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা লইয়া দশ দিকে ঢাক বাজিতে লাগিল।

নবেন্দু এক্ষণে মরিয়া হইয়া কথায় বার্তায় শ্যালীসমাজে অত্যন্ত নির্ভীক দেশ-হিতৈষী হইয়া উঠিল। লাবণ্য মনে মনে হাসিয়া কহিল, 'এখনও তোমার অগ্নিপরীক্ষা বাকি আছে।'

একদিন প্রাতঃকালে নবেন্দু স্নানের পূর্বে বক্ষস্থল তৈলাক্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশের দুর্গম অংশগুলিতে তৈলসঞ্চার করিবার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন এমন সময় বেহারা এক কার্ড হাতে করিয়া তাঁহাকে দিল, তাহাতে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের নাম আঁকা। লাবণ্য সহাস্যকুতূহলী চক্ষে আড়াল হইতে কৌতুক দেখিতেছিল।

তৈললাঞ্ছিত কলেবরে তো ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করা যায় না— নবেন্দু ভাজিবার পূর্বে মসলা-মাখা কই-মৎস্যের মতো বৃথা ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি চকিতের মধ্যে স্নান করিয়া কোনোমতে কাপড় পরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেহারা বলিল, "সাহেব অনেক ক্ষণ বসিয়া বসিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" এই আগাগোড়া মিথ্যাচরণ-পাপের কতটা অংশ বেহারার, কতটা অংশ বা লাবণ্যের, তাহা নৈতিক গণিতশাস্ত্রের একটা সূক্ষ্ম সমস্যা।

টিক্‌টিকির কাটা লেজ যেমন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ধড়্‌ফড় করে নবেন্দুর ক্ষুব্ধ হৃদয় ভিতরে ভিতরে তেমনি আছাড় খাইতে লাগিল। সমস্ত দিন খাইতে শুইতে আর সোয়াস্তি রহিল না।

লাবণ্য আভ্যন্তরিক হাস্যের সমস্ত আভাস মুখ হইতে সম্পূর্ণ দূর করিয়া দিয়া উদ্‌বিগ্নভাবে থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আজ তোমার কী হইয়াছে বলো দেখি! অসুখ করে নাই তো?"

নবেন্দু কায়ক্লেশে হাসিয়া কোনোমতে একটা দেশকালপাত্রোচিত উত্তর বাহির করিল; কহিল, "তোমার এলেকার মধ্যে আবার অসুখ কিসের। তুমি আমার ধন্বন্তরিণী।"

কিন্তু, মুহূর্তমধ্যেই হাসি মিলাইয়া গেল এবং সে ভাবিতে লাগিল, 'একে আমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিলাম, কাগজে কড়া চিঠি লিখিলাম, তাহার উপরে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলাম, না জানি কী মনে করিতেছেন!'

'হা তাত, হা পূর্ণেন্দুশেখর! আমি যাহা নই ভাগ্যের বিপাকে গোলেমালে তাহাই প্রতিপন্ন হইলাম!'

পরদিন সাজগোজ করিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া মস্ত একটা পাগড়ি পরিয়া নবেন্দু বাহির হইল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "যাও কোথায়।"

নবেন্দু কহিল, "একটা বিশেষ কাজ আছে—"

লাবণ্য কিছু বলিল না।

সাহেবের দরজার কাছে কার্ড বাহির করিবামাত্র আরদালি কহিল, "এখন দেখা হইবে না।"

নবেন্দু পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল। আরদালি সংক্ষিপ্ত সেলাম করিয়া কহিল, "আমরা পাঁচজন আছি।" নবেন্দু তৎক্ষণাৎ দশ টাকার এক নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সাহেবের নিকট তলব পড়িল। সাহেব তখন চটিজুতা ও মর্নিংগোন পরিয়া লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নবেন্দু একটা সেলাম করিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে অঙ্গুলিসংকেতে বসিবার অনুমতি করিয়া কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন, "কী বলিবার আছে, বাবু।"

নবেন্দু ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে বিনীত কম্পিত স্বরে বলিল, "কাল আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু—"

সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একটা চোখ কাগজ হইতে তুলিয়া বলিলেন, "সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম! Babu, what nonsense are you talking!"

নবেন্দু "Beg your pardon! ভুল হইয়াছে, গোল হইয়াছে" করিতে করিতে ঘর্মাপ্লুত কলেবরে কোনোমতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবং সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া কোনো দূরস্বপ্নশ্রুত মন্ত্রের ন্যায় একটা বাক্য থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, "Babu, you are a howling idiot!"

পথে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে ধারণা হইল যে, ম্যাজিস্ট্রেট যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল সে কথাটা কেবল রাগ করিয়া সে অস্বীকার করিল। মনে মনে কহিলেন, 'ধরণী দ্বিধা হও!' কিন্তু ধরণী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন।

লাবণ্যকে আসিয়া কহিলেন, "দেশে পাঠাইবার জন্য গোলাপজল কিনিতে

গিয়াছিলাম।"

বলিতে না বলিতে কালেক্টরের চাপরাস-পরা জনছয়েক পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত। সেলাম করিয়া হাস্যমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "তুমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিয়াছ বলিয়া তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিতে আসে নাই তো?"

পেয়াদারা ছয়জনে বারো পাটি দন্তাগ্রভাগ উন্মুক্ত করিয়া কহিল, "বকশিশ, বাবুসাহেব।"

নীলরতন পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরক্তস্বরে কহিলেন, "কিসের বকশিশ।"

পেয়াদারা বিকশিতদন্তে কহিল, "ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাহার বকশিশ।"

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব আজকাল গোলাপজল বিক্রি ধরিয়াছেন নাকি। এমন অত্যন্ত ঠান্ডা ব্যবসায় তো তাঁহার পূর্বে ছিল না।"

হতভাগ্য নবেন্দু গোলাপজলের সহিত ম্যাজিস্ট্রেট-দর্শনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গিয়া কী যে আবোলতাবোল বলিল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

নীলরতন কহিল, "বকশিশের কোনো কাজ হয় নাই। বকশিশ নাহি মিলেগা।"

নবেন্দু সংকুচিতভাবে পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া কহিল, "উহারা গরিব মানুষ, কিছু দিতে দোষ কী।"

নীলরতন নবেন্দুর হাত হইতে নোট টানিয়া লইয়া কহিল, "উহাদের অপেক্ষা গরিব মানুষ জগতে আছে, আমি তাহাদিগকে দিব।"

রুষ্ট মহেশ্বরের ভূতপ্রেতগণকেও কিঞ্চিৎ ঠান্ডা করিবার সুযোগ না পাইয়া নবেন্দু অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পেয়াদাগণ যখন বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল, তখন নবেন্দু একান্ত করুণভাবে তাহাদের দিকে চাহিলেন; নীরবে নিবেদন করিলেন, "বাবাসকল, আমার কোনো দোষ নাই, তোমরা তো জান!"

কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশন। তদুপলক্ষে নীলরতন সস্ত্রীক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। নবেন্দুও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিল।

কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্র কন্‌গ্রেসের দলবল নবেন্দুকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড তাণ্ডব শুরু করিয়া দিল। সম্মান সমাদর স্তুতিবাদের সীমা রহিল না। সকলেই বলিল, "আপনাদের মতো নায়কগণ দেশের কাজে যোগ না দিলে দেশের উপায় নাই।" কথাটার যাথার্থ্য নবেন্দু অস্বীকার করিতে পারিলেন না, এবং গোলেমালে হঠাৎ কখন দেশের একজন অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। কন্‌গ্রেস-সভায় যখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতি তারস্বরে 'হিপ্ হিপ্ হুরে' শব্দে তাঁহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

যথাকালে মহারানীর জন্মদিন আসিল, নবেন্দুর রায়বাহাদুর খেতাব নিকটসমাগত মরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিল।

সেইদিন সায়াহ্নে লাবণ্যলেখা সমারোহে নবেন্দুকে নিমন্ত্রণপূর্বক তাঁহাকে নববস্ত্রে ভূষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার ললাটে রক্তচন্দনের তিলক এবং প্রত্যেক শ্যালী তাঁহার

কণ্ঠে একগাছি করিয়া স্বরচিত পুষ্পমালা পরাইয়া দিল। অরুণাম্বরবসনা অরুণলেখা সেদিন হাস্যে লজ্জায় এবং অলংকারে আড়াল হইতে ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিল। তাহার স্বেদাপ্লুত লজ্জাশীতল হস্তে একটা গোড়েমালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে কোনোমতে বশ মানিল না এবং সেই প্রধান মালাখানি নবেন্দুর কণ্ঠ কামনা করিয়া জনহীন নিশীথের জন্য গোপনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। শ্যালীরা নবেন্দুকে কহিল, "আজ আমরা তোমাকে রাজা করিয়া দিলাম। ভারতবর্ষে এমন সম্মান তুমি ছাড়া আর কাহারও সম্ভব হইবে না।"

নবেন্দু ইহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাইল কি না তাহা তাহার অন্তঃকরণ আর অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মরিবার পূর্বে সে রায়বাহাদুর হইবেই এবং তাহার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer সমস্বরে শোক করিতে ছাড়িবে না। অতএব, ইতিমধ্যে three cheers for বাবু পূর্ণেন্দুশেখর! হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে, হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে, হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে!

আশ্বিন ১৩০৫

মণিহারা

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর-এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বত্থ-মূল-বিদারিত ঘাটের উপরে ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।"

দেখিলাম, ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকুরের যেমন একরকম বহুকালজীর্ণ সংস্কারবিহীন চেহারা, ইঁহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম-খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপানপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, "আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।"

"কী করা হয়।"

"ব্যাবসা করিয়া থাকি।"

"কী ব্যাবসা।"

"হরীতকী, রেশমের গুটি এবং কাঠের ব্যাবসা।"

"কী নাম।"

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, "এখানে কী করিতে আগমন।"

আমি কহিলাম, "বায়ুপরিবর্তন।"

লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। কহিল, "মহাশয়, আজ প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি কিন্তু কিছু তো ফল পাই নাই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা মানিতেই হইবে রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।"

তিনি কহিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন।"

আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, "এই বাড়িতে।"

বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গুপ্ত-ধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়োবড়ো চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন-কি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্টাণ্ট্‌-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শান-দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ ও নাগপাশ-বন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে

চায়, স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল—ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেইসঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বুঝিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মানুরোধে এইখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনও তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় নাই; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশ বৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দ বৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা-কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না ; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না ; গৃহের আশ্রয়স্বরূপে স্ত্রী যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশ ঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকর্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষমানুষের কর্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা— ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষমানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই মেয়েদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসা-মান যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে-পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে ; সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভবিবাহের পূর্বে পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন! একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত ; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়— এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোট কথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন-কী -নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব

করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিণীর শূন্যগহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদুর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক, রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেই মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যাবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্‌পট্‌ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে ; যে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যান্ড্‌নোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয় ; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্য-স্খলন হয়, এমন-সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার

বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার কি বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না, ইহা তাহাকে শোভা পায়?

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে ; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অণুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের! ইহারা মেয়েমানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের যে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ-বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল ; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন পরামর্শ কী।'

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল— অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।'

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল, এইরূপ হওয়াই সম্ভব

এবং ইহাই সংগত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই ; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মানিক, যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার— সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা যায়।'

মধুসূদন কহিল, 'গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছু অংশ, এমন-কি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যুষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।' মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।'

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না, মোটা চাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পেঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের ; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দন্ত্য-স'কে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে, এ কথাটা ঠিকমতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, আমি গুরুতর ক্ষতিসম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবু আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র। পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক্‌ তাহাকে। পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো

রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক শ্রাবণমেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেঁকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।' আরও শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবীযুগের ফণিভূষণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে, শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনও সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতীপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নাই। স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল! মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্য-ব্যাবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মুক্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতিদূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধু এ পর্যন্ত সেখানে পোঁছে নাই।

তখন চারি দিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল—কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাতশব্দে যাত্রার গানের সুর

মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ-যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়া ছিল— বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্ট্স্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো ; আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যোব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যান্টার, শৌখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমন-কি শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো ; যে অতিক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প্ সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্প্টি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষমুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী ; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন এত ইতিহাস, সমস্ত জড়সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন, তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারি দিকের এই-সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো ; এই-সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন এক সময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতিকঠিন নিকষ-পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠক্ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল— স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্রদৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুতহস্তে আরও একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধদ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠান্ডা এবং হৃৎপিন্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনও ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল, 'মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানা প্রকারের লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না।' ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।' দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো-একটি অনির্দিষ্ট আসন্নপ্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চীৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরও একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ উঠিল। কিন্তু ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্তদ্বারের মধ্যে প্রবেশ

করিল। শুনা গেল, অন্দরমহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোল-সিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্‌খট্ এবং ঝম্‌ঝম্ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মণি!' অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চীৎকারে ঘরের শাসিগুলা পর্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্র-গুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসব-জাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিত হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বলিতেছে, 'সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ!'

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ

দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল, এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি। আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা-আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল, দেখিয়া তাহার সর্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্‌ ঠক্‌ঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নিচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল; অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইঁটের-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড়্‌কড়্‌ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা

ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারম্বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিক ক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেক ক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।"

তিনি কহিলেন, "না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত, প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—"

আমি কহিলাম, "দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।"

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, "আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।"

আমি কহিলাম, "নৃত্যকালী।"

অগ্রহায়ণ ১৩০৫

দৃষ্টিদান

শুনিয়াছি, আজকাল অনেক বাঙালির মেয়েকে নিজের চেষ্টায় স্বামী সংগ্রহ করিতে হয়। আমিও তাই করিয়াছি কিন্তু দেবতার সহায়তায়। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক ব্রত এবং অনেক শিবপূজা করিয়াছিলাম।

আমার আট বৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বজন্মের পাপ-বশত আমি আমার এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনয়নী আমার দুইচক্ষু লইলেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীকে দেখিয়া লইবার সুখ দিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই আমার অগ্নিপরীক্ষার আরম্ভ হয়। চোদ্দ বৎসর পার না হইতেই আমি একটি মৃতশিশু জন্ম দিলাম, নিজেও মরিবার কাছাকাছি গিয়াছিলাম; কিন্তু যাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন। যে দীপ জ্বলিবার জন্য হইয়াছে তাহার তেল অল্প হয় না; রাত্রিভোর জ্বলিয়া তবে তাহার নির্বাণ।

বাঁচিলাম বটে কিন্তু শরীরের দুর্বলতায়, মনের খেদে, অথবা যে কারণেই হউক, আমার চোখের পীড়া হইল।

আমার স্বামী তখন ডাক্তারি পড়িতেছিলেন। নূতন বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ-বশত চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলে তিনি খুশি হইয়া উঠিতেন। তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

দাদা সে বছর বি. এল. দিবেন বলিয়া কালেজে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া আমার স্বামীকে কহিলেন, "করিতেছ কী। কুমুর চোখ দুটো যে নষ্ট করিতে বসিয়াছ। একজন ভালো ডাক্তার দেখাও।"

আমার স্বামী কহিলেন, "ভালো ডাক্তার আসিয়া আর নূতন চিকিৎসা কী করিবে। ওষুধপত্র তো সব জানাই আছে।"

দাদা কিছু রাগিয়া কহিলেন, "তবে তো তোমার সঙ্গে তোমাদের কলেজের বড়োসাহেবের কোনো প্রভেদ নাই।"

স্বামী বলিলেন, "আইন পড়িতেছ ডাক্তারির তুমি কী বোঝ। তুমি যখন বিবাহ করিবে তখন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি লইয়া যদি কখনও মকদ্দমা বাধে তুমি কি আমার পরামর্শমত চলিবে।"

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে উলুখড়েরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধিল দাদার, কিন্তু দুইপক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকেই। আবার ভাবিলাম, দাদারা যখন আমাকে দানই করিয়াছেন তখন আমার সম্বন্ধে কর্তব্য লইয়া এ-সমস্ত ভাগাভাগি কেন। আমার সুখদুঃখ, আমার রোগ ও আরোগ্য সে তো সমস্তই আমার স্বামীর।

সেদিন আমার এই এক সামান্য চোখের চিকিৎসা লইয়া দাদার সঙ্গে আমার স্বামীর যেন একটু মনান্তর হইয়া গেল। সহজেই আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, আমার জলের ধারা আরও বাড়িয়া উঠিল; তাহার প্রকৃত কারণ আমার স্বামী কিম্বা দাদা কেহই তখন বুঝিলেন না।

আমার স্বামী কালেজে গেলে বিকালবেলায় হঠাৎ দাদা এক ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল, সাবধানে না থাকিলে পীড়া গুরুতর হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া কী-সমস্ত ওষুধ লিখিয়া দিল, দাদা তখনই তাহা আনাইতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি দাদাকে বলিলাম, "দাদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমার যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটাইবেন না।"

আমি শিশুকাল হইতে দাদাকে খুব ভয় করিতাম, তাঁহাকে যে মুখ ফুটিয়া এমন করিয়া কিছু বলিতে পারিব ইহা আমার পক্ষে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, আমার স্বামীকে লুকাইয়া দাদা আমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আমার অশুভ বই শুভ নাই।

দাদাও আমার প্রগল্‌ভতায় বোধ করি কিছু আশ্চর্য হইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আর ডাক্তার আনিব না, কিন্তু যে ওষুধটা আসিবে তাহা বিধিমতে সেবন করিয়া দেখিস।" ওষুধ আসিলে পর আমাকে তাহা ব্যবহারের নিয়ম বুঝাইয়া দিয়া দাদা চলিয়া গেলেন। স্বামী কালেজ হইতে আসিবার পূর্বেই আমি সে কৌটা শিশি তুলি এবং বিধিবিধান সমস্তই সযত্নে আমাদের প্রাঙ্গণের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

দাদার সঙ্গে কিছু আড়ি করিয়াই আমার স্বামী যেন আরও দ্বিগুণ চেষ্টায় আমার চোখের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ বেলা ও বেলা ওষুধ বদল হইতে লাগিল। চোখে ঠুলি পরিলাম, চশমা পরিলাম, চোখে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ওষুধ ঢালিলাম, গুঁড়া লাগাইলাম, দুর্গন্ধ মাছের তেল খাইয়া ভিতরকার পাকযন্ত্রসুদ্ধ যখন বাহির হইবার উদ্যম করিত তাহাও দমন করিয়া রহিলাম। স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন বোধ হইতেছে। আমি বলিতাম, অনেকটা ভালো। আমি মনে করিতেও চেষ্টা করিতাম যে, ভালোই হইতেছে। যখন বেশি জল পড়িতে থাকিত তখন ভাবিতাম, জল কাটিয়া যাওয়াই ভালো লক্ষণ; যখন জল পড়া বন্ধ হইত তখন ভাবিতাম, এই তো আরোগ্যের পথে দাঁড়াইয়াছি।

কিন্তু কিছুকাল পরে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম এবং মাথার বেদনায় আমাকে স্থির থাকিতে দিল না। দেখিলাম, আমার স্বামীও যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়াছেন। এতদিন পরে কী ছুতা করিয়া যে ডাক্তার ডাকিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "দাদার মন রক্ষার জন্য একবার একজন ডাক্তার ডাকিতে দোষ কী। এই লইয়া তিনি অনর্থক রাগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মনে কষ্ট হয়। চিকিৎসা তো তুমিই করিবে, ডাক্তার একজন উপসর্গ থাকা ভালো।"

স্বামী কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ।" এই বলিয়া সেইদিনই এক ইংরেজ ডাক্তার লইয়া হাজির করিলেন। কী কথা হইল জানি না কিন্তু মনে হইল, যেন সাহেব আমার স্বামীকে কিছু ভর্ৎসনা করিলেন; তিনি নতশিরে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি আমার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলাম, "কোথা হইতে একটা গোঁয়ার গোরা-গর্দভ ধরিয়া আনিয়াছ, একজন দেশী ডাক্তার আনিলেই হইত। আমার চোখের রোগ ও কি তোমার চেয়ে ভালো বুঝিবে।"

স্বামী কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "চোখে অস্ত্র করা আবশ্যক হইয়াছে।"

আমি একটু রাগের ভাণ করিয়া কহিলাম, "অস্ত্র করিতে হইবে, সে তো তুমি জানিতে কিন্তু প্রথম হইতেই সে কথা আমার কাছে গোপন করিয়া গেছ। তুমি কি মনে কর, আমি ভয় করি।"

স্বামীর লজ্জা দূর হইল; তিনি বলিলেন, "চোখে অস্ত্র করিতে হইবে শুনিলে ভয় না করে পুরুষের মধ্যে এমন বীর কয়জন আছে।"

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "পুরুষের বীরত্ব কেবল স্ত্রীর কাছে।"

স্বামী তৎক্ষণাৎ ম্লানগম্ভীর হইয়া কহিলেন, "সে কথা ঠিক। পুরুষের কেবল অহংকার সার।"

আমি তাঁহার গাম্ভীর্য উড়াইয়া দিয়া কহিলাম, "অহংকারেও বুঝি তোমরা মেয়েদের সঙ্গে পার? তাহাতেও আমাদের জিত।"

ইতিমধ্যে দাদা আসিলে আমি দাদাকে বিরলে ডাকিয়া বলিলাম, "দাদা, আপনার সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামত চলিয়া এতদিন আমার চোখ বেশ ভালোই হইতেছিল, একদিন ভ্রমক্রমে খাইবার ওষুধটা চক্ষে লেপন করিয়া তাহার পর হইতে চোখ যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। আমার স্বামী বলিতেছেন, চোখে অস্ত্র করিতে হইবে।"

দাদা বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম, তোর স্বামীর চিকিৎসাই চলিতেছে, তাই আরও আমি রাগ করিয়া এতদিন আসি নাই।"

আমি বলিলাম, "না, আমি গোপনে সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামতই চলিতেছিলাম, স্বামীকে জানাই নাই, পাছে তিনি রাগ করেন।"

স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিথ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কষ্ট দিতে পারি না, স্বামীর যশও ক্ষুণ্ণ করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশুকে ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকে ভুলাইতে হয়— মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন!

ছলনার ফল হইল এই যে, অন্ধ হইবার পূর্বে আমার দাদা এবং স্বামীর মিলন দেখিতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন, গোপনচিকিৎসা করিতে গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিল; স্বামী ভাবিলেন, গোড়ায় আমার দাদার পরামর্শ শুনিলেই ভালো হইত। এই ভাবিয়া দুই অনুতপ্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হইল। স্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীতভাবে সকল বিষয়ে আমার স্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে উভয়ের পরামর্শক্রমে একদিন একজন ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া আমার বাম চোখে অস্ত্রাঘাত করিল। দুর্বল চক্ষু সে আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, তাহার ক্ষীণ দীপ্তিটুকু হঠাৎ নিবিয়া গেল। তাহার পরে বাকি চোখটাও দিনে দিনে অল্পে অল্পে অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। বাল্যকালে শুভদৃষ্টির দিনে যে চন্দন-চর্চিত তরুণমূর্তি আমার সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উপরে চিরকালের মতো পর্দা পড়িয়া গেল।

একদিন স্বামী আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, "তোমার কাছে আর মিথ্যা বড়াই করিব না, তোমার চোখদুটি আমিই নষ্ট করিয়াছি।"

দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অশ্রুজল ভরিয়া আসিয়াছে। আমি দুই হাতে তাঁহার দক্ষিণহস্ত চাপিয়া কহিলাম, "বেশ করিয়াছ, তোমার জিনিস তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া

দেখো দেখি, যদি কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় আমার চোখ নষ্ট হইত তাহাতে আমার কী সান্ত্বনা থাকিত। ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না, সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমাত্র সুখ। যখন পুজায় ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম— আমার পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আমার প্রভাতের আলো, আমার আকাশের নীল, আমার পৃথিবীর সবুজ সব তোমাকে দিলাম; তোমার চোখে যখন যাহা ভালো লাগিবে আমাকে মুখে বলিয়ো, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।"

আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মুখে এমন করিয়া বলাও যায় না; এ-সব কথা আমি অনেকদিন ধরিয়া ভাবিয়াছি। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত, নিষ্ঠার তেজ ম্লান হইয়া পড়িত, নিজেকে বঞ্চিত দুঃখিত দুর্ভাগ্যদগ্ধ বলিয়া মনে হইত, তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এই-সব কথা বলাইয়া লইতাম; এই শান্তি, এই ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। সেদিন কতকটা কথায় কতকটা নীরবে বোধ করি আমার মনের ভাবটা তাঁহাকে একরকম করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন, "কুমু, মূঢ়তা করিয়া তোমার যা নষ্ট করিয়াছি সে আর ফিরাইয়া দিতে পারিব না, কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তোমার চোখের অভাব মোচন করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।"

আমি কহিলাম, "সে কোনো কাজের কথা নয়। তুমি যে তোমার ঘরকন্নাকে একটি অন্ধের হাসপাতাল করিয়া রাখিবে, সে আমি কিছুতেই হইতে দিব না। তোমাকে আর-একটি বিবাহ করিতেই হইবে।"

কী জন্য যে বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক তাহা সবিস্তারে বলিবার পূর্বে আমার একটুখানি কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। একটু কাশিয়া, একটু সামলাইয়া লইয়া বলিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার স্বামী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মূঢ়, আমি অহংকারী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পাষণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন ব্রহ্মহত্যা-পিতৃহত্যার পাতকী হই।"

এতবড়ো শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম, কিন্তু অশ্রু তখন বুক বাহিয়া, কণ্ঠ চাপিয়া, দুই চক্ষু ছাপিয়া, ঝরিয়া পড়িবার জো করিতেছিল; তাহাকে সম্বরণ করিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া বিপুল আনন্দের উদ্‌বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি অন্ধ, তবু তিনি আমাকে ছাড়িবেন না! দুঃখীর দুঃখের মতো আমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন! এত সৌভাগ্য আমি চাই না, কিন্তু মন তো স্বার্থপর।

অবশেষে অশ্রুর প্রথম পশলাটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেলে তাঁহার মুখ আমার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "এমন ভয়ংকর শপথ কেন করিলে। আমি কি তোমাকে নিজের সুখের জন্য বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম। সতীনকে দিয়া আমি আমার স্বার্থ সাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে কাজ নিজে করিতে পারিতাম না সে আমি তাহাকে দিয়া করাইতাম!"

স্বামী কহিলেন, "কাজ তো দাসীতেও করে। আমি কি কাজের সুবিধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সঙ্গে একাসনে বসাইতে পারি।" বলিয়া আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি নির্মল চুম্বন করিলেন; সেই চুম্বনের দ্বারা আমার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেইক্ষণে আমার দেবীত্বে অভিষেক হইয়া গেল। আমি মনে মনে কহিলাম, সেই ভালো। যখন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বহিঃসংসারের আর গৃহিণী হইতে পারি না, এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া স্বামীর মঙ্গল করিব। আর মিথ্যা নয়, ছলনা নয়, গৃহিণী রমণীর যত-কিছু ক্ষুদ্রতা এবং কপটতা আছে সমস্ত দূর করিয়া দিলাম।

সেদিন সমস্ত দিন নিজের সঙ্গে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। গুরুতর শপথে বাধ্য হইয়া স্বামী যে কোনোমতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একেবারে দংশন করিয়া রহিল; কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। অদ্য আমার মধ্যে যে নূতন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি কহিলেন, হয়তো এমন দিন আসিতে পারে যখন এই শপথ-পালন অপেক্ষা বিবাহ করিলে তোমার স্বামীর মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমার মধ্যে যে পুরাতন নারী ছিল সে কহিল, তা হউক, কিন্তু তিনি যখন শপথ করিয়াছেন তখন তো আর বিবাহ করিতে পারিবেন না। দেবী কহিলেন, তা হউক, কিন্তু ইহাতে তোমার খুশি হইবার কোনো কারণ নাই। মানবী কহিল, সকলই বুঝি, কিন্তু যখন তিনি শপথ করিয়াছেন তখন, ইত্যাদি। বার বার সেই এক কথা। দেবী তখন কেবল নিরুত্তরে ভ্রূকুটি করিলেন এবং একটা ভয়ংকর আশঙ্কার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

আমার অনুতপ্ত স্বামী চাকরদাসীকে নিষেধ করিয়া নিজে আমার সকল কাজ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীর উপর তুচ্ছ বিষয়েও এইরূপ নিরুপায় নির্ভর প্রথমটা ভালোই লাগিত। কারণ, এমনি করিয়া সর্বদাই তাঁহাকে কাছে পাইতাম। চোখে তাঁহাকে দেখিতাম না বলিয়া তাঁহাকে সর্বদা কাছে পাইবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। স্বামীসুখের যে অংশ আমার চোখের ভাগে পড়িয়াছিল সেইটে এখন অন্য ইন্দ্রিয়েরা বাঁটিয়া লইয়া নিজেদের ভাগ বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। এখন আমার স্বামী অধিকক্ষণ বাহিরের কাজে থাকিলে মনে হইত, আমি যেন শূন্যে রহিয়াছি, আমি যেন কোথাও কিছু ধরিতে পারিতেছি না, আমার যেন সব হারাইল। পূর্বে স্বামী যখন কালেজে যাইতেন তখন বিলম্ব হইলে পথের দিকের জানালা একটুখানি ফাঁক করিয়া পথ চাহিয়া থাকিতাম। যে জগতে তিনি বেড়াইতেন সে জগৎটাকে আমি চোখের দ্বারা নিজের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আমার দৃষ্টিহীন সমস্ত শরীর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। তাঁহার পৃথিবীর সহিত আমার পৃথিবীর যে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আজ ভাঙিয়া গেছে। এখন তাঁহার এবং আমার মাঝখানে একটা দুস্তর অন্ধতা; এখন আমাকে কেবল নিরুপায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, কখন তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সেইজন্য এখন, যখন ক্ষণকালের জন্যও তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন আমার সমস্ত অন্ধ দেহ উদ্যত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়, হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ডাকে।

কিন্তু এত আকাঙ্ক্ষা, এত নির্ভর তো ভালো নয়। একে তো স্বামীর উপরে

স্ত্রীর ভারই যথেষ্ট, তাহার উপরে আবার অন্ধতার প্রকাণ্ড ভার চাপাইতে পারি না। আমার এই বিশ্বজোড়া অন্ধকার, এ আমিই বহন করিব। আমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতা দ্বারা স্বামীকে আমি আমার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিব না।

অল্পকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমন-কি আমার অনেক গৃহকর্ম পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নৈপুণ্যের সহিত নির্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল, দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। যতটুকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্তমানে আমার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাদের কর্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণ -ভাবে করিতে লাগিল।

এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোনো কাজ করিতে দিলাম না, এবং তাঁহার সমস্ত কাজ আবার পূর্বের মতো আমিই করিতে লাগিলাম।

স্বামী আমাকে কহিলেন, "আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছ।"

আমি কহিলাম, "তোমার প্রায়শ্চিত্ত কিসের আমি জানি না, কিন্তু আমার পাপের ভার আমি বাড়াইব কেন।"

যাহাই বলুন, আমি যখন তাঁহাকে মুক্তি দিলাম তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অন্ধ স্ত্রীর সেবাকে চিরজীবনের ব্রত করা পুরুষের কর্ম নহে।

আমার স্বামী ডাক্তারি পাস করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া মফস্বলে গেলেন।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া যেন মাতৃক্রোড়ে আসিলাম মনে হইল। আমার আট বৎসর বয়সের সময় আমি গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে দশ বৎসরে জন্মভূমি আমার মনের মধ্যে ছায়ার মতো অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। যতদিন চক্ষু ছিল কলিকাতা শহর আমার চারি দিকে আর-সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চোখ যাইতেই বুঝিলাম, কলিকাতা কেবল চোখ ভুলাইয়া রাখিবার শহর, ইহাতে মন ভরিয়া রাখে না। দৃষ্টি হারাইবামাত্র আমার সেই বাল্যকালের পল্লিগ্রাম দিবাবসানে নক্ষত্রলোকের মতো আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারি দিক দেখিতে কিরকম তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভাবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা নূতন চষা খেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনা-ঢালা অড়র এবং সরিষা খেতের আকাশ-ভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন-কি ভাঙা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্তমানের মতো আমাকে ঘিরিয়া বসিল; অন্ধ চক্ষু তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম, কেবল মাকে পাইলাম না। মনে মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদুকম্পিত প্রাচীন দুর্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের

দেহতত্ত্বগান গুঞ্জনস্বরে শুনিতে পাইলাম না; সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশিরস্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেঁকিশালে নূতন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোটো ছোটো পল্লিসঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা অদূরে কোথা হইতে হাম্বাধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেইসঙ্গে ভিজা জাবনার ও খড়-জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শুনিতে পাই, পুকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ি হইতে কাঁসরঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার সেই শিশুকালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটুকু গন্ধটুকু আমার চারি দিকে রাশীকৃত করিয়াছে।

এইসঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলাকার ব্রত এবং ভোরবেলায় ফুল তুলিয়া শিব-পূজার কথা মনে পড়িল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কলিকাতার আলাপ আলোচনা আনাগোনার গোলমালে বুদ্ধির একটু বিকার ঘটেই। ধর্মকর্ম-ভক্তিশ্রদ্ধার মধ্যে নির্মল সরলতাটুকু থাকে না। সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে যেদিন অন্ধ হওয়ার পরে কলিকাতায় আমার পল্লিবাসিনী এক সখী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল, "তোর রাগ হয় না, কুমু? আমি হইলে এমন স্বামীর মুখ দেখিতাম না।" আমি বলিলাম, "ভাই, মুখ দেখা তো বন্ধই বটে, সেজন্যে এ পোড়া চোখের উপর রাগ হয়, কিন্তু স্বামীর উপর রাগ করিতে যাইব কেন।" যথাসময়ে ডাক্তার ডাকেন নাই বলিয়া লাবণ্য আমার স্বামীর উপর অত্যন্ত রাগিয়াছিল এবং আমাকেও রাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম, সংসারে থাকিলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞানে অজ্ঞানে ভুলে ভ্রান্তিতে দুঃখ সুখ নানারকম ঘটিয়া থাকে; কিন্তু মনের মধ্যে যদি ভক্তি স্থির রাখিতে পারি তবে দুঃখের মধ্যেও একটা শান্তি থাকে, নহিলে কেবল রাগারাগি রেষারেষি বকাবকি করিয়াই জীবন কাটিয়া যায়। অন্ধ হইয়াছি এই তো যথেষ্ট দুঃখ, তাহার পরে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দুঃখের বোঝা বাড়াইব কেন। আমার মতো বালিকার মুখে সেকেলে কথা শুনিয়া লাবণ্য রাগ করিয়া অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাই বলি, কথার মধ্যে বিষ আছে, কথা একেবারে ব্যর্থ হয় না। লাবণ্যের মুখ হইতে রাগের কথা আমার মনের মধ্যে দুটো-একটা স্ফুলিঙ্গ ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি সেটা পা দিয়া মাড়াইয়া নিবাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তবু দুটো-একটা দাগ থাকিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, কলিকাতায় অনেক তর্ক, অনেক কথা; সেখানে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া আমার সেই শিবপূজার শীতল শিউলিফুলের গন্ধে হৃদয়ের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশুকালের মতোই নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবতায় আমার হৃদয় এবং আমার সংসার পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি নতশিরে লুটাইয়া পড়িলাম। বলিলাম, "হে দেব, আমার চক্ষু গেছে বেশ হইয়াছে, তুমি তো আমার আছ।"

হায়, ভুল বলিয়াছিলাম। তুমি আমার আছ, এ কথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইটুকু বলিবারই অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটা আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারও উপরে কোনো জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।

কিছুকাল বেশ সুখে কাটিল। ডাক্তারিতে আমার স্বামীরও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল।

কিন্তু টাকা জিনিসটা ভালো নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া যায়। মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখসঞ্চয়ের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে যেখানে মনের সুখ ছিল, জিনিসপত্র আসবাব-আয়োজন সেই জায়গাটুকু জুড়িয়া বসে। তখন সুখের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি না, কিন্তু অন্ধের অনুভবশক্তি বেশি বলিয়া, কিম্বা কী কারণ জানি না, অবস্থার সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর পরিবর্তন আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। যৌবনারম্ভে ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে আমার স্বামীর যে-একটি বেদনাবোধ ছিল সেটা যেন প্রতিদিন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। মনে আছে, তিনি একদিন বলিতেন, "ডাক্তারি যে কেবল জীবিকার জন্য শিখিতেছি তাহা নহে, ইহাতে অনেক গরিবের উপকার করিতে পারিব।" যে-সব ডাক্তার দরিদ্র মুমূর্ষুর দ্বারে আসিয়া আগাম ভিজিট না লইয়া নাড়ি দেখিতে চায় না তাহাদের কথা বলিতে গিয়া ঘৃণায় তাঁহার বাক্‌রোধ হইত। আমি বুঝিতে পারি, এখন আর সেদিন নাই। একমাত্র ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য দরিদ্র নারী তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন; শেষে আমি মাথার দিব্য দিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় পাঠাইয়াছি, কিন্তু মনের সঙ্গে কাজ করেন নাই। যখন আমাদের টাকা অল্প ছিল তখন অন্যায় উপার্জনকে আমার স্বামী কী চক্ষে দেখিতেন তাহা আমি জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কে এখন অনেক টাকা জমিয়াছে, এখন একজন ধনী লোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুই দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, কী বলিল আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে অন্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তিদ্বারা বুঝিলাম, তিনি আজ কলঙ্ক মাখিয়া আসিয়াছেন।

অন্ধ হইবার পূর্বে আমি যাঁহাকে শেষবার দেখিয়াছিলাম আমার সে স্বামী কোথায়! যিনি আমার দৃষ্টিহীন দুইচক্ষুর মাঝখানে একটি চুম্বন করিয়া আমাকে একদিন দেবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কী করিতে পারিলাম। একদিন একটা রিপুর ঝড় আসিয়া যাহাদের অকস্মাৎ পতন হয় তাহারা আর-একটা হৃদয়াবেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই-যে দিনে দিনে পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা, ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোনো রাস্তা খুঁজিয়া পাই না।

স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে-দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়; কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হাঁপাইয়া উঠে যখন মনে করি, আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই; আমি অন্ধ, সংসারের আলোকবর্জিত অন্তরপ্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন প্রেম, অক্ষুণ্ণ ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি— আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরম্ভে আমি বালিকার করপুটে যে শেফালিকার অর্ঘ্যদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনও শুকায় নাই; আর, আমার স্বামী এই ছায়াশীতল চিরনবীনতার

দেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জনের পশ্চাতে সংসারমরুভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমি যাহা বিশ্বাস করি, যাহাকে ধর্ম বলি, যাহাকে সকল সুখসম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতিদূর হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা এক পথেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম; তাহার পরে কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই; অবশেষে আজ আমি আর তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।

এক-এক সময় ভাবি, হয়তো অন্ধ বলিয়া সামান্য কথাকে আমি বেশি করিয়া দেখি। চক্ষু থাকিলে আমি হয়তো সংসারকে ঠিক সংসারের মতো করিয়া চিনিতে পারিতাম।

আমার স্বামীও আমাকে একদিন তাহাই বুঝাইয়া বলিলেন। সেদিন সকালে একটি বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পৌত্রীর ওলাউঠার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। আমি শুনিতে পাইলাম সে কহিল, "বাবা, আমি গরিব, কিন্তু আল্লা তোমার ভালো করিবেন।" আমার স্বামী কহিলেন, "আল্লা যাহা করিবেন কেবল তাহাতেই আমার চলিবে না, তুমি কী করিবে সেটা আগে শুনি।" শুনিবামাত্রই ভাবিলাম, ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বধির করেন নাই কেন। বৃদ্ধ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত 'হে আল্লা' বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। আমি তখনই ঝিকে দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরের খিড়কি-দ্বারে ডাকাইয়া আনিলাম; কহিলাম, "বাবা, তোমার নাতনির জন্য এই ডাক্তারের খরচা কিছু দিলাম, তুমি আমার স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া পাড়া হইতে হরিশ ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া যাও।"

কিন্তু সমস্ত দিন আমার মুখে অন্ন রুচিল না। স্বামী অপরাহ্ণে নিদ্রা হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন।" পূর্বকালের অভ্যস্ত উত্তর একটা মুখে আসিতেছিল— 'না, কিছুই হয় নাই'; কিন্তু ছলনার কাল গিয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, "কতদিন তোমাকে বলিব মনে করি, কিন্তু বলিতে গিয়া ভাবিয়া পাই না, ঠিক কী বলিবার আছে। আমার অন্তরের কথাটা আমি বুঝাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিশ্চয় তুমি নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পার, আমরা দুজনে যেমনভাবে এক হইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম আজ তাহা পৃথক হইয়া গেছে।" স্বামী হাসিয়া কহিলেন, "পরিবর্তনই তো সংসারের ধর্ম।" আমি কহিলাম, "টাকাকড়ি রূপযৌবন সকলেরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু নিত্য জিনিস কি কিছুই নাই।" তখন তিনি একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "দেখো, অন্য স্ত্রীলোকেরা সত্যকার অভাব লইয়া দুঃখ করে—কাহারও স্বামী উপার্জন করে না, কাহারও স্বামী ভালোবাসে না; তুমি আকাশ হইতে দুঃখ টানিয়া আন।" আমি তখনই বুঝিলাম, অন্ধতা আমার চোখে এক অঞ্জন মাখাইয়া আমাকে এই পরিবর্তমান সংসারের বাহিরে লইয়া গেছে; আমি অন্য স্ত্রীলোকের মতো নহি; আমাকে আমার স্বামী বুঝিবেন না।

ইতিমধ্যে আমার এক পিস্‌শাশুড়ি দেশ হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সংবাদ লইতে আসিলেন। আমরা উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি প্রথম কথাতেই বলিলেন, "বলি বউমা, তুমি তো কপালক্রমে দুইটি চক্ষু খোয়াইয়া বসিয়াছ, এখন আমাদের অবিনাশ অন্ধ স্ত্রীকে লইয়া ঘরকন্না চালাইবে কী করিয়া। উহার আর-

একটা বিয়েথাওয়া দিয়া দাও!” স্বামী যদি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন ‘তা বেশ তো পিসিমা, তোমরা দেখিয়া-শুনিয়া একটা ঘটকালি করিয়া দাও-না’ তাহা হইলে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, “আঃ পিসিমা, কী বলিতেছ।” পিসিমা উত্তর করিলেন, “কেন, অন্যায় কী বলিতেছি। আচ্ছা বউমা, তুমিই বলো তো বাছা।” আমি হাসিয়া কহিলাম, “পিসিমা, ভালো লোকের কাছে পরামর্শ চাহিতেছ। যাহার গাঁঠ কাটিতে হইবে তাহার কি কেহ সম্মতি নেয়।” পিসিমা উত্তর করিলেন, “হাঁ, সে কথা ঠিক বটে। তা, তোতে আমাতে গোপনে পরামর্শ করিব, কী বলিস, অবিনাশ। তাও বলি বউমা, কুলীনের মেয়ের সতিন যত বেশি হয়, তাহার স্বামিগৌরব ততই বাড়ে। আমাদের ছেলে ডাক্তারি না করিয়া যদি বিবাহ করিত, তবে উহার রোজগারের ভাবনা কী ছিল। রোগী তো ডাক্তারের হাতে পড়িলেই মরে, মরিলে তো আর ভিজিট দেয় না, কিন্তু বিধাতার শাপে কুলীনের স্ত্রীর মরণ নাই এবং সে যতদিন বাঁচে ততদিনই স্বামীর লাভ।”

দুইদিন বাদে আমার স্বামী আমার সম্মুখে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিসিমা, আত্মীয়ের মতো করিয়া বউয়ের সাহায্য করিতে পারে, এমন একটি ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোক দেখিয়া দিতে পার? উনি চোখে দেখিতে পান না, সর্বদা ওঁর একটি সঙ্গিনী কেহ থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।” যখন নূতন অন্ধ হইয়াছিলাম তখন এ কথা বলিলে খাটিত, কিন্তু এখন চোখের অভাবে আমার কিম্বা ঘরকন্নার বিশেষ কী অসুবিধা হয় জানি না; কিন্তু প্রতিবাদমাত্র না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পিসিমা কহিলেন, “অভাব কী। আমারই তো ভাসুরের এক মেয়ে আছে, যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী। মেয়েটির বয়স হইল, কেবল উপযুক্ত বরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে; তোমার মতো কুলীন পাইলে এখনই বিবাহ দিয়া দেয়।” স্বামী চকিত হইয়া কহিলেন, “বিবাহের কথা কে বলিতেছে।” পিসিমা কহিলেন, “ওমা, বিবাহ না করিলে ভদ্র ঘরের মেয়ে কি তোমার ঘরে অমনি আসিয়া পড়িয়া থাকিবে।” কথাটা সংগত বটে এবং স্বামী তাহার কোনো সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

আমার রুদ্ধ চক্ষুর অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে আমি একলা দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে ডাকিতে লাগিলাম, ভগবান আমার স্বামীকে রক্ষা করো।

তাহার দিনকয়েক পরে একদিন সকালবেলায় আমার পূজা-আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিতেই পিসিমা কহিলেন, “বউমা, যে ভাসুরঝির কথা বলিয়াছিলাম সেই আমাদের হেমাঙ্গিনী আজ দেশ হইতে আসিয়াছে। হিমু, ইনি তোমার দিদি, ইঁহাকে প্রণাম করো।”

এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ আসিয়া যেন অপরিচিত স্ত্রীলোককে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পিসিমা কহিলেন, “কোথা যাস, অবিনাশ।” স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি কে।” পিসিমা কহিলেন, “এই মেয়েটিই আমার সেই ভাসুরঝি হেমাঙ্গিনী।” ইহাকে কখন আনা হইল, কে আনিল, কী বৃত্তান্ত, লইয়া আমার স্বামী বারম্বার অনেক অনাবশ্যক বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি মনে মনে কহিলাম, ‘যাহা ঘটিতেছে তাহা তো সবই বুঝিতেছি, কিন্তু ইহার উপরে আবার ছলনা আরম্ভ হইল। লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, মিথ্যাকথা! অধর্ম করিতে যদি হয় তো করো, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জন্য, কিন্তু আমার জন্য

কেন হীনতা করা। আমাকে ভুলাইবার জন্য কেন মিথ্যাচরণ।'

হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া আমি তাহাকে আমার শয়নগৃহে লইয়া গেলাম। তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে দেখিলাম; মুখটি সুন্দর হইবে, বয়সও চোদ্দ-পনেরোর কম হইবে না।

বালিকা হঠাৎ মধুর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "ও কী করিতেছ। আমার ভূত ঝাড়াইয়া দিবে নাকি।"

সেই উন্মুক্ত সরল হাস্যধ্বনিতে আমাদের মাঝখানের একটা অন্ধকার মেঘ যেন এক মুহূর্তে কাটিয়া গেল। আমি দক্ষিণবাহুতে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিলাম, "আমি তোমাকে দেখিতেছি, ভাই।" বলিয়া তাহার কোমল মুখখানিতে আর-একবার হাত বুলাইলাম।

"দেখিতেছ?" বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। কহিল, "আমি কি তোমার বাগানের সিম না বেগুন যে হাত বুলাইয়া দেখিতেছ কতবড়োটা হইয়াছি।"

তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, আমি যে অন্ধ তাহা হেমাঙ্গিনী জানে না। কহিলাম, "বোন, আমি যে অন্ধ।" শুনিয়া সে কিছুক্ষণ আশ্চর্য হইয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম, তাহার কুতূহলী তরুণ আয়ত নেত্র দিয়া সে আমার দৃষ্টিহীন-চক্ষু এবং মুখের ভাব মনোযোগের সহিত দেখিল; তাহার পরে কহিল, "ওঃ, তাই বুঝি কাকিকে এখানে আনাইয়াছ?"

আমি কহিলাম, "না, আমি ডাকি নাই। তোমার কাকি আপনি আসিয়াছেন।"

বালিকা আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দয়া করিয়া? তাহা হইলে দয়াময়ী শীঘ্র নড়িতেছেন না। কিন্তু, বাবা আমাকে এখানে কেন পাঠাইলেন।"

এমন সময়ে পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা চলিতেছিল। ঘরে আসিতেই হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, আমরা বাড়ি ফিরিব কবে বলো।"

পিসিমা কহিলেন, "ওমা! এইমাত্র আসিয়াই অমনি যাই-যাই! অমন চঞ্চল মেয়েও তো দেখি নাই।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, তোমার তো এখান হইতে শীঘ্র নড়িবার গতিক দেখি না। তা, তোমার এ হল আত্মীয়ঘর, তুমি যতদিন খুশি থাকো; আমি কিন্তু চলিয়া যাইব, তা তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি।" এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, "কী বলো ভাই, তোমরা তো আমার ঠিক আপন নও।" আমি তাহার এই-সকল প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া তাহাকে আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। দেখিলাম, পিসিমা যতই প্রবলা হউন, এই কন্যাটিকে তাঁহার সামলাইবার সাধ্য নাই। পিসিমা প্রকাশ্যে রাগ না দেখাইয়া হেমাঙ্গিনীকে একটু আদর করিবার চেষ্টা করিলেন; সে তাহা যেন গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসিমা সমস্ত ব্যাপারটাকে আদুরে মেয়ের একটা পরিহাসের মতো উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। আবার কী ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে কহিলেন, "হিমু, চল্, তোর স্নানের বেলা হইল।" সে আমার কাছে আসিয়া কহিল, "আমরা দুইজনে ঘাটে যাইব, কী বলো ভাই।" পিসিমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষান্ত দিলেন; তিনি জানিতেন, টানাটানি করিতে গেলে হেমাঙ্গিনীরই জয় হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যেকার বিরোধ অশোভনরূপে

আমার সম্মুখে প্রকাশ হইবে।

খিড়কির ঘাটে যাইতে যাইতে হেমাঙ্গিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলেপুলে নাই কেন।" আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, "কেন তাহা কী করিয়া জানিব, ঈশ্বর দেন নাই।" হেমাঙ্গিনী কহিল, "অবশ্য তোমার ভিতরে কিছু পাপ ছিল।" আমি কহিলাম, "তাহাও অন্তর্যামী জানেন।" বালিকা প্রমাণস্বরূপে কহিল, "দেখো-না, কাকির ভিতরে এত কুটিলতা যে উঁহার গর্ভে সন্তান জন্মিতে পায় না।" পাপপুণ্য সুখদুঃখ দণ্ডপুরস্কারের তত্ত্ব নিজেও বুঝি না, বালিকাকেও বুঝাইলাম না; কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে তাঁহাকে কহিলাম, তুমিই জান! হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা, আমার কথা শুনিয়াও তোমার নিশ্বাস পড়ে! আমার কথা বুঝি কেহ গ্রাহ্য করে!"

দেখিলাম, স্বামীর ডাক্তারি-ব্যবসায়ে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দূরে ডাক পড়িলে তো যানই না, কাছে কোথাও গেলেও চট্‌পট্ সারিয়া চলিয়া আসেন। পূর্বে যখন কর্মের অবসরে ঘরে থাকিতেন, মধ্যাহ্নে আহার এবং নিদ্রার সময়ে কেবল বাড়ির ভিতরে আসিতেন। এখন পিসিমাও যখন-তখন ডাকিয়া পাঠান, তিনিও অনাবশ্যক পিসিমার খবর লইতে আসেন। পিসিমা যখন ডাক ছাড়িয়া বলেন, "হিমু, আমার পানের বাটাটা নিয়ে আয় তো," আমি বুঝিতে পারি পিসিমার ঘরে আমার স্বামী আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম দিন-দুইতিন হেমাঙ্গিনী পানের বাটা, তেলের বাটি সিঁদুরের কৌটো প্রভৃতি যথাদিষ্ট লইয়া যাইত। কিন্তু, তাহার পরে ডাক পড়িলে সে আর কিছুতেই নড়িত না, ঝির হাত দিয়া আদিষ্ট দ্রব্য পাঠাইয়া দিত। পিসি ডাকিতেন, "হেমাঙ্গিনী, হিমু, হিমি"—বালিকা যেন আমার প্রতি একটা করুণার আবেগে আমাকে জড়াইয়া থাকিত; একটা আশঙ্কা এবং বিষাদে তাহাকে আচ্ছন্ন করিত। ইহার পর হইতে আমার স্বামীর কথা সে আমার কাছে ভ্রমেও উল্লেখ করিত না।

ইতিমধ্যে আমার দাদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি জানিতাম, দাদার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ব্যাপারটা কিরূপ চলিতেছে তাহা তাঁহার নিকট গোপন করা প্রায় অসাধ্য হইবে। আমার দাদা বড়ো কঠিন বিচারক। তিনি লেশমাত্র অন্যায়কে ক্ষমা করিতে জানেন না। আমার স্বামী যে তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে অপরাধীরূপে দাঁড়াইবেন, ইহাই আমি সবচেয়ে ভয় করিতাম। আমি অতিরিক্ত প্রফুল্লতা দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলাম। আমি বেশি কথা বলিয়া, বেশি ব্যস্তসমস্ত হইয়া, অত্যন্ত ধুমধাম করিয়া, চারি দিকে যেন একটা ধুলা উড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু, সেটা আমার পক্ষে এমন অস্বাভাবিক যে তাহাতেই আরও বেশি ধরা পড়িবার কারণ হইল। কিন্তু, দাদা বেশিদিন থাকিতে পারিলেন না, আমার স্বামী এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রকাশ্য রূঢ়তার আকার ধারণ করিল। দাদা চলিয়া গেলেন। বিদায় লইবার পূর্বে পরিপূর্ণ স্নেহের সহিত আমার মাথার উপর অনেকক্ষণ কম্পিত হস্ত রাখিলেন; মনে মনে একাগ্রচিত্তে কী আশীর্বাদ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম; তাঁহার অশ্রু আমার অশ্রুসিক্ত কপোলের উপর আসিয়া পড়িল।

মনে আছে, সেদিন চৈত্রমাসের সন্ধ্যাবেলায় হাটের বারে লোকজন বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে। দূর হইতে বৃষ্টি লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, তাহারই মাটি-ভেজা গন্ধ এবং বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে; সঙ্গচ্যুত সাথিগণ অন্ধকার মাঠের

মধ্যে পরস্পরকে ব্যাকুল ঊর্ধ্বকণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শয়নগৃহে যতক্ষণ আমি একলা থাকি ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না, পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় ধরিয়া উঠে বা কোনো দুর্ঘটনা হয়। আমি সেই নির্জন অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মাটিতে বসিয়া দুই হাত জুড়িয়া আমার অনন্ত অন্ধজগতের জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিলাম; বলিতেছিলাম, "প্রভু, তোমার দয়া যখন অনুভব হয় না, তোমার অভিপ্রায় যখন বুঝি না, তখন এই অনাথ ভগ্ন হৃদয়ের হালটাকে প্রাণপণে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরি; বুক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায় তবু তুফান সামলাইতে পারি না; আমার আর কত পরীক্ষা করিবে, আমার কতটুকুই-বা বল।" এই বলিতে বলিতে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, খাটের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ঘরের কাজ করিতে হয়। হেমাঙ্গিনী ছায়ার মতো কাছে কাছে থাকে, বুকের ভিতরে যে অশ্রু ভরিয়া উঠে সে আর ফেলিবার অবসর পাই না; অনেকদিন পরে আজ চোখের জল বাহির হইল, এমন সময় দেখিলাম, খাট একটু নড়িল, মানুষ-চলার উস্‌খুস্‌ শব্দ হইল এবং মুহূর্তপরে হেমাঙ্গিনী আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অঞ্চল দিয়া আমার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। সে যে সন্ধ্যার আরম্ভে কী ভাবিয়া কখন আসিয়া খাটেই শুইয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই। সে একটি প্রশ্নও করিল না, আমিও তাহাকে কোনো কথাই বলিলাম না। সে ধীরে ধীরে তাহার শীতল হস্ত আমার ললাটে বুলাইয়া দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন মেঘগর্জন এবং মুষলধারে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝড় হইয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না; বহুকাল পরে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি আসিয়া আমার জ্বরদাহদগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।

পরদিন হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, তুমি যদি বাড়ি না যাও আমি আমার কৈবর্ত-দাদার সঙ্গে চলিলাম, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।" পিসিমা কহিলেন, "তাহাতে কাজ কী, আমিও কাল যাইতেছি; একসঙ্গেই যাওয়া হইবে। এই দেখ্‌ হিমু, আমার অবিনাশ তোর জন্যে কেমন একটি মুক্তা-দেওয়া আংটি কিনিয়া দিয়াছে।" বলিয়া সগর্বে পিসিমা আংটি হেমাঙ্গিনীর হাতে দিলেন। হেমাঙ্গিনী কহিল, "এই দেখো কাকি, আমি কেমন সুন্দর লক্ষ্য করিতে পারি।" বলিয়া জানালা হইতে তাক করিয়া আংটি খিড়কি-পুকুরের মাঝখানে ফেলিয়া দিল। পিসিমা রাগে দুঃখে বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। আমাকে বারম্বার করিয়া হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন, "বউমা, এই ছেলেমানুষির কথা অবিনাশকে খবরদার বলিয়ো না; ছেলে আমার তাহা হইলে মনে দুঃখ পাইবে। মাথা খাও, বউমা!" আমি কহিলাম, "আর বলিতে হইবে না পিসিমা, আমি কোনো কথাই বলিব না।"

পরদিন যাত্রার পূর্বে হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দিদি, আমাকে মনে রাখিস।" আমি দুই হাত বারম্বার তাহার মুখে বুলাইয়া কহিলাম, "অন্ধ কিছু ভোলে না, বোন; আমার তো জগৎ নাই, আমি কেবল মন লইয়াই আছি।" বলিয়া তাহার মাথাটা লইয়া একবার আঘ্রাণ করিয়া চুম্বন করিলাম। ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া তাহার কেশরাশির মধ্যে আমার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

হেমাঙ্গিনী বিদায় লইলে আমার পৃথিবীটা শুষ্ক হইয়া গেল— সে আমার প্রাণের মধ্যে যে সৌগন্ধ্য সৌন্দর্য সংগীত, যে উজ্জ্বল আলো এবং যে কোমল তরুণতা আনিয়াছিল তাহা চলিয়া গেলে একবার আমার সমস্ত সংসার, আমার চারি দিকে,

দুই হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, কোথায় আমার কী আছে। আমার স্বামী আসিয়া বিশেষ প্রফুল্লতা দেখাইয়া কহিলেন, "ইঁহারা গেলেন, এখন বাঁচা গেল, একটু কাজকর্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।" ধিক্, ধিক্ আমাকে। আমার জন্য কেন এত চাতুরী। আমি কি সত্যকে ডরাই। আমি কি আঘাতকে কখনও ভয় করিয়াছি। আমার স্বামী কি জানেন না। যখন আমি দুই চক্ষু দিয়াছিলাম তখন আমি কি শান্তমনে আমার চিরান্ধকার গ্রহণ করি নাই।

এতদিন আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান সৃজন হইল। আমার স্বামী ভুলিয়াও কখনও হেমাঙ্গিনীর নাম আমার কাছে উচ্চারণ করিতেন না, যেন তাঁহার সম্পর্কীয় সংসার হইতে হেমাঙ্গিনী একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে, যেন সেখানে সে কোনোকালে লেশমাত্র রেখাপাত করে নাই। অথচ পত্রদ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একটু প্রবেশ করে সেইদিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে, তেমনি তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয় সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি। কবে তিনি খবর পাইতেন এবং কবে পাইতেন না তাহা আমার কাছে কিছু অগোচর ছিল না। কিন্তু, আমিও তাঁহাকে তাহার কথা শুধাইতে পারিতাম না। আমার অন্ধকার হৃদয়ে সেই-যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল সুন্দর তারাটি ক্ষণকালের জন্য উদয় হইয়াছিল তাহার একটু খবর পাইবার এবং তাহার কথা আলোচনা করিবার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত হইয়া থাকিত, কিন্তু আমার স্বামীর কাছে মুহূর্তের জন্য তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দুজনার মাঝখানে বাক্যে এবং বেদনায় পরিপূর্ণ এই একটা নীরবতা অটলভাবে বিরাজ করিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ঝি আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা-ঠাকরুন, ঘাটে যে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, বাবামশায় কোথায় যাইতেছেন।" আমি জানিতাম, একটা কী উদ্যোগ হইতেছে; আমার অদৃষ্টাকাশে প্রথম কিছুদিন ঝড়ের পূর্বকার নিস্তব্ধতা এবং তাহার পরে প্রলয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘ আসিয়া জমিতেছিল; সংহারকারী শংকর নীরব অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত প্রলয়শক্তিকে আমার মাথার উপরে জড়ো করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। ঝিকে বলিলাম, "কই, আমি তো এখনও কোনো খবর পাই নাই।" ঝি আর-কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আমার স্বামী আসিয়া কহিলেন, "দূরে এক জায়গায় আমার ডাক পড়িয়াছে, কাল ভোরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। বোধ করি ফিরিতে দিন-দুই তিন বিলম্ব হইতে পারে।"

আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, "কেন আমাকে মিথ্যা বলিতেছ।"

আমার স্বামী কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, "মিথ্যা কী বলিলাম।"

আমি কহিলাম, "তুমি বিবাহ করিতে যাইতেছ!"

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ ঘরে কোনো শব্দ রহিল না। শেষে আমি বলিলাম, "একটা উত্তর দাও। বলো, হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।"

তিনি প্রতিধ্বনির ন্যায় উত্তর দিলেন, “হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।”

আমি কহিলাম, “না, তুমি যাইতে পারিবে না। তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব। এ যদি না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী; কী জন্য আমি শিবপূজা করিয়াছিলাম।”

আবার অনেকক্ষণ গৃহ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। আমি মাটিতে পড়িয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, “আমি তোমার কী অপরাধ করিয়াছি, কিসে আমার ত্রুটি হইয়াছে, অন্য স্ত্রীতে তোমার কিসের প্রয়োজন। মাথা খাও, সত্য করিয়া বলো।”

তখন আমার স্বামী ধীরে ধীরে কহিলেন, “সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব ঝকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।”

“আমার বুকের ভিতরে চিরিয়া দেখো! আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নববিবাহের বালিকা বই কিছু নই; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা করিতে চাই; তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে বড়ো করিয়া তুলিয়ো না— আমাকে সর্ববিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।”

আমি কী কী কথা বলিয়াছিলাম সে কি আমার মনে আছে। ক্ষুব্ধ সমুদ্র কি নিজের গর্জন নিজে শুনিতে পায়। কেবল মনে পড়ে, বলিয়াছিলাম, “যদি আমি সতী হই তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনোমতেই তোমার ধর্ম-শপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।” এই বলিয়া আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন আমার মূর্ছা ভঙ্গ হইয়া গেল তখনও রাত্রিশেষের পাখি ডাকিতে আরম্ভ করে নাই এবং আমার স্বামী চলিয়া গেছেন।

আমি ঠাকুরঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজায় বসিলাম। সমস্ত দিন আমি ঘরের বাহির হইলাম না। সন্ধ্যার সময়ে কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম না যে, ‘হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন, তাঁহাকে রক্ষা করো।’ আমি কেবল একান্তমনে বলিতে লাগিলাম, “ঠাকুর, আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার তা হউক, কিন্তু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করো।” সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও আসন পরিত্যাগ করি নাই। অনিদ্রায় অনাহারে কে আমাকে বল দিয়াছিল জানি না, আমি পাষাণমূর্তির সম্মুখে পাষাণমূর্তির মতোই বসিয়া ছিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইতে দ্বার-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। দ্বার ভাঙিয়া যখন ঘরে লোক প্রবেশ করিল তখন আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছি।

মূর্ছাভঙ্গে শুনিলাম “দিদি!” দেখিলাম, হেমাঙ্গিনীর কোলে শুইয়া আছি। মাথা নাড়িতেই তাহার নূতন চেলি খস্‌খস্‌ করিয়া উঠিল। হা ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শুনিলে না। আমার স্বামীর পতন হইল।

হেমাঙ্গিনী মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, তোমার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

প্রথম একমুহূর্ত কাঠের মতো হইয়া পরক্ষণেই উঠিয়া বসিলাম, কহিলাম, "কেন আশীর্বাদ করিব না, বোন! তোমার কী অপরাধ।"

হেমাঙ্গিনী তাহার সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "অপরাধ! তুমি বিবাহ করিলে অপরাধ হয় না আর আমি করিলেই অপরাধ?"

হেমাঙ্গিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া আমিও হাসিলাম। মনে মনে কহিলাম, 'জগতে আমার প্রার্থনাই কি চূড়ান্ত। তাঁহার ইচ্ছাই কি শেষ নহে। যে আঘাত পড়িয়াছে সে আমার মাথার উপরেই পড়ুক, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যেখানে আমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস আছে, সেখানে পড়িতে দিব না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব।' হেমাঙ্গিনী আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। আমি কহিলাম, "তুমি চিরসৌভাগ্যবতী, চিরসুখিনী হও।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "কেবল আশীর্বাদ নয়, তোমার সতীর হস্তে আমাকে এবং তোমার ভগ্নীপতিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুমি তাঁহাকে লজ্জা করিলে চলিবে না। যদি অনুমতি কর তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসি।"

আমি কহিলাম, "আনো।"

কিছুক্ষণ পরে আমার ঘরে নূতন পদশব্দ প্রবেশ করিল। সস্নেহ প্রশ্ন শুনিলাম, "ভালো আছিস, কুমু?"

আমি ত্রস্ত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "দাদা।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "দাদা কিসের। কান মলিয়া দাও, ও তোমার ছোটো ভগ্নীপতি।"

তখন সমস্ত বুঝিলাম। আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না; মা নাই, তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বিবাহ করাইবার কেহ ছিল না। এবার আমিই তাঁহার বিবাহ দিলাম। দুই চক্ষু বাহিয়া হুহু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতেই থামাইতে পারি না। দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন; হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

রাত্রে ঘুম হইতেছিল না; আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। লজ্জা এবং নৈরাশ্য তিনি কিরূপভাবে সম্বরণ করিবেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

অনেক রাত্রে অতি ধীরে দ্বার খুলিল। আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার স্বামীর পদশব্দ। বক্ষের মধ্যে হৃৎপিণ্ড আছাড় খাইতে লাগিল।

তিনি বিছানার মধ্যে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "তোমার দাদা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি ক্ষণকালের মোহে পড়িয়া মরিতে যাইতেছিলাম। সেদিন আমি যখন নৌকায় উঠিয়াছিলাম, আমার বুকের মধ্যে যে কী পাথর চাপিয়াছিল তাহা অন্তর্যামী জানেন; যখন নদীর মধ্যে ঝড়ে পড়িয়াছিলাম তখন প্রাণের ভয়ও হইতেছিল, সেইসঙ্গে ভাবিতেছিলাম, যদি ডুবিয়া যাই তাহা হইলেই আমার উদ্ধার হয়। মথুরগঞ্জে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাহার পূর্বদিনেই তোমার দাদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হইয়া গেছে। কী লজ্জায় এবং কী আনন্দে নৌকায় ফিরিয়াছিলাম তাহা বলিতে

পারি না। এই কয়দিনে আমি নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোনো সুখ নাই। তুমি আমার দেবী।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "না, আমার দেবী হইয়া কাজ নাই, আমি তোমার ঘরের গৃহিণী, আমি সামান্য নারীমাত্র।"

স্বামী কহিলেন, "আমারও একটা অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বলিয়া কখনও অপ্রতিভ করিয়ো না।"

পরদিন হুলুরব ও শঙ্খধ্বনিতে পাড়া মাতিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী আমার স্বামীকে আহারে উপবেশনে, প্রভাতে রাত্রে, নানাপ্রকারে পরিহাস করিতে লাগিল, নির্যাতনের আর সীমা রহিল না; কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কী ঘটিয়াছিল, কেহ তাহার লেশমাত্র উল্লেখ করিল না।

পৌষ ১৩০৫

সদর ও অন্দর

বিপিনকিশোর ধনীগৃহে জন্মিয়াছিলেন, সেইজন্য ধন যে পরিমাণে ব্যয় করিতে জানিতেন তাহার অর্ধেক পরিমাণেও উপার্জন করিতে শেখেন নাই। সুতরাং যে গৃহে জন্ম সে গৃহে দীর্ঘকাল বাস করা ঘটিল না।

সুন্দর সুকুমারমূর্তি তরুণ যুবক, গানবাজনায় সিদ্ধহস্ত, কাজকর্মে নিরতিশয় অপটু; সংসারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; জীবনযাত্রার পক্ষে জগন্নাথদেবের রথের মতো অচল; যেরূপ বিপুল আয়োজনে চলিতে পারেন সেরূপ আয়োজন সম্প্রতি বিপিনকিশোরের আয়ত্তাতীত।

সৌভাগ্যক্রমে রাজা চিত্তরঞ্জন কোর্ট্ অফ ওয়ার্ডস্ হইতে বিষয় প্রাপ্ত হইয়া শখের থিয়েটার ফাঁদিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং বিপিনকিশোরের সুন্দর চেহারা ও গান গাহিবার ও গান তৈয়ারি করিবার ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সাদরে নিজের অনুচরশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

রাজা বি.এ পাস। তাঁহার কোনোপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। বড়োমানুষের ছেলে হইয়াও নিয়মিত সময়ে, এমন-কি, নির্দিষ্ট স্থানেই শয়ন ভোজন করিতেন। বিপিনকিশোরকে হঠাৎ তাঁহার নেশার মতো লাগিয়া গেল। তাঁহার গান শুনিতে ও তাঁহার রচিত গীতিনাট্য আলোচনা করিতে করিতে ভাত ঠাণ্ডা হইতে থাকে, রাত বাড়িয়া যায়। দেওয়ানজি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার সংযতস্বভাব মনিবের চরিত্রদোষের মধ্যে কেবল ঐ বিপিনকিশোরের প্রতি অতিশয় আসক্তি।

রানী বসন্তকুমারী স্বামীকে তর্জন করিয়া বলিলেন, "কোথাকার এক লক্ষ্মীছাড়া বানর আনিয়া শরীর মাটি করিবার উপক্রম করিয়াছ, ওটাকে দূর করিতে পারিলেই আমার হাড়ে বাতাস লাগে।"

রাজা যুবতী স্ত্রীর ঈর্ষায় মনে মনে একটু খুশি হইতেন, হাসিতেন; ভাবিতেন, মেয়েরা যাহাকে ভালোবাসে কেবল তাহাকেই জানে। জগতে যে আদরের পাত্র অনেক গুণী আছে, স্ত্রীলোকের শাস্ত্রে সে কথা লেখে না। যে লোক তাহার কানে বিবাহের মন্ত্র পড়িয়াছে সকল গুণ তাহার এবং সকল আদর তাহারই জন্য। স্বামীর আধঘণ্টা খাবার সময় অতীত হইয়া গেলে অসহ্য হয়; আর, স্বামীর আশ্রিতকে দূর করিয়া দিলে তাহার একমুষ্টি অন্ন জুটিবে না, এ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্ত্রীলোকের এই বিবেচনাহীন পক্ষপাত দূষণীয় হইতে পারে, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিকট তাহা নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল না। এইজন্য তিনি যখন-তখন বেশিমাত্রায় বিপিনের গুণগান করিয়া স্ত্রীকে খেপাইতেন ও বিশেষ আমোদ বোধ করিতেন।

এই রাজকীয় খেলা বেচারা বিপিনের পক্ষে সুবিধাজনক হয় নাই। অন্তঃপুরের বিমুখতায় তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থায় পদে পদে কণ্টক পড়িতে লাগিল। ধনীগৃহের ভৃত্য আশ্রিত ভদ্রলোকের প্রতি স্বভাবতই প্রতিকূল; তাহারা রানীর আক্রোশে সাহস পাইয়া ভিতরে ভিতরে বিপিনকে অনেকপ্রকার উপেক্ষা দেখাইত।

রানী একদিন পুঁটেকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "তোকে যে কোনো কাজেই পাওয়া যায় না, সমস্ত দিন করিস কী।"

সে কহিল, রাজার আদেশে বিপিনবাবুর সেবাতেই তাহার দিন কাটিয়া যায়।

রানী কহিলেন, "ইস্‌, বিপিনবাবু যে ভারি নবাব দেখিতেছি।"

পরদিন হইতে পুটে বিপিনের উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া রাখিত; অনেকসময় তাঁহার অন্ন ঢাকিয়া রাখিত না। অনভ্যস্ত হস্তে বিপিন নিজের অন্নের থালি নিজে মাজিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে উপবাস দিল; কিন্তু ইহা লইয়া রাজার নিকট নালিশ ফরিয়াদ করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কোনো চাকরের সহিত কলহ করিয়া সে আত্মাবমাননা করে নাই। এইরূপে বিপিনের ভাগ্যে সদর হইতে আদর বাড়িতে লাগিল, অন্দর হইতে অবজ্ঞার সীমা রহিল না।

এ দিকে সুভদ্রাহরণ গীতিনাট্য রিহার্শাল-শেষে প্রস্তুত। রাজবাটির অঙ্গনে তাহার অভিনয় হইল। রাজা স্বয়ং সাজিলেন কৃষ্ণ, বিপিন সাজিলেন অর্জুন। আহা, অর্জুনের যেমন কণ্ঠ তেমনি রূপ। দর্শকগণ 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল।

রাত্রে রাজা আসিয়া বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অভিনয় দেখিলে।"

রানী কহিলেন, "বিপিন তো বেশ অর্জুন সাজিয়াছিল। বড়োঘরের ছেলের মতো তাহার চেহারা বটে, এবং গলার সুরটিও তো দিব্য!"

রাজা বলিলেন, "আর, আমার চেহারা বুঝি কিছুই নয়, গলাটাও বুঝি মন্দ?"

রানী বলিলেন, "তোমার কথা আলাদা।" বলিয়া পুনরায় বিপিনের অভিনয়ের কথা পাড়িলেন।

রাজা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্ছ্বসিত ভাষায় রানীর নিকট বিপিনের গুণগান করিয়াছেন; কিন্তু অদ্য রানীর মুখের এইটুকুমাত্র প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, বিপিনটার ক্ষমতা যে পরিমাণে, অবিবেচক লোকে তদপেক্ষা তাহাকে ঢের বেশি বাড়াইয়া থাকে। উহার চেহারাই বা কী, আর গলাই বা কী এমন। কিয়ৎকাল পূর্বে তিনিও এই অবিবেচকশ্রেণীর মধ্যে ছিলেন; হঠাৎ কী কারণে তাঁহার বিবেচনাশক্তি বাড়িয়া উঠিল!

পরদিন হইতে বিপিনের আহারাদির সুব্যবস্থা হইল। বসন্তকুমারী রাজাকে কহিলেন, "বিপিনকে কাছারি-ঘরে আমলাদের সহিত বাসা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। হাজার হউক, এক সময়ে উহার অবস্থা ভালো ছিল।"

রাজা কেবল সংক্ষেপে উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "হাঃ!"

রানী অনুরোধ করিলেন, "খোকার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আর-একদিন থিয়েটার দেওয়া হউক।" রাজা কথাটা কানেই তুলিলেন না।

একদিন ভালো কাপড় কোঁচানো হয় নাই বলিয়া রাজা পুটে চাকরকে ভর্ৎসনা করাতে সে কহিল, "কী করিব, রানীমার আদেশে বিপিনবাবুর বাসন মাজিতে ও সেবা করিতেই সময় কাটিয়া যায়।"

রাজা রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ইস্‌, বিপিনবাবু তো ভারি নবাব হইয়াছেন, নিজের বাসন বুঝি নিজে মাজিতে পারেন না!"

বিপিন পুনর্মূষিক হইয়া পড়িল।

রানী রাজাকে ধরিয়া পড়িলেন, সন্ধ্যাবেলায় তাঁহাদের সংগীতালোচনার সময় পাশের ঘরে থাকিয়া পর্দার আড়ালে তিনি গান শুনিবেন, বিপিনের গান তাঁহার ভালো লাগে। রাজা অনতিকাল পরেই পূর্ববৎ অত্যন্ত নিয়মিত সময়ে শয়ন ভোজন

আরম্ভ করিলেন। গানবাজনা আর চলে না।

রাজা মধ্যাহ্নে জমিদারি-কাজ দেখিতেন। একদিন সকাল-সকাল অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, রানী কী-একটা পড়িতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কী পড়িতেছ।"

রানী প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "বিপিনবাবুর একটা গানের খাতা আনাইয়া দুটো-একটা গানের কথা মুখস্থ করিয়া লইতেছি; হঠাৎ তোমার শখ মিটিয়া গিয়া আর তো গান শুনিবার জো নাই!" বহুপূর্বে শখটাকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য রানী যে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কথা কেহ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল না।

পরদিন বিপিনকে রাজা বিদায় করিয়া দিলেন; কাল হইতে কী করিয়া কোথায় তাঁহার অন্নমুষ্টি জুটিবে সে সম্বন্ধে কোনো বিবেচনা করিলেন না।

দুঃখ কেবল তাহাই নহে, ইতিমধ্যে বিপিন রাজার সহিত অকৃত্রিম অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; বেতনের চেয়ে রাজার প্রণয়টা তাঁহার কাছে অনেক বেশি দামি হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, কী অপরাধে যে হঠাৎ রাজার হৃদ্যতা হারাইলেন, অনেক ভাবিয়াও বিপিন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার পুরাতন তম্বুরাটিতে গেলাপ পরাইয়া বন্ধুহীন বৃহৎ সংসারে বাহির হইয়া পড়িলেন; যাইবার সময় রাজভৃত্য পুঁটেকে তাঁহার শেষ সম্বল দুইটি টাকা পুরস্কার দিয়া গেলেন।

আষাঢ় ১৩০৭

উদ্ধার

গৌরী প্রাচীন ধনীবংশের পরমাদরে পালিতা সুন্দরী কন্যা। স্বামী পরেশ হীনাবস্থা হইতে সম্প্রতি নিজের উপার্জনে কিঞ্চিৎ অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। যতদিন তাহার দৈন্য ছিল ততদিন কন্যার কষ্ট হইবে ভয়ে শ্বশুর শাশুড়ি স্ত্রীকে তাঁহার বাড়িতে পাঠান নাই। গৌরী বেশ-একটু বয়স্থা হইয়াই পতিগৃহে আসিয়াছিল।

বোধ করি এই-সকল কারণেই পরেশ সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তগম্য বলিয়া বোধ করিতেন না। এবং বোধ করি সন্দিগ্ধ স্বভাব তাঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে।

পরেশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র শহরে ওকালতি করিতেন ; ঘরে আত্মীয়স্বজন বড়ো কেহ ছিল না, একাকিনী স্ত্রীর জন্য তাঁহার চিত্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন হঠাৎ অসময়ে তিনি আদালত হইতে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রথম প্রথম স্বামীর এইরূপ আকস্মিক অভ্যুদয়ের কারণ গৌরী ঠিক বুঝিতে পারিত না।

মাঝে মাঝে অকারণ পরেশ এক-একটা করিয়া চাকর ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। কোনো চাকর তাঁহার আর দীর্ঘকাল পছন্দ হয় না। বিশেষত অসুবিধার আশঙ্কা করিয়া যে চাকরকে গৌরী রাখিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিত তাহাকে পরেশ এক মুহূর্ত স্থান দিতেন না। তেজস্বিনী গৌরী ইহাতে যতই আঘাত বোধ করিত স্বামী ততই অস্থির হইয়া এক-এক সময়ে অদ্ভুত ব্যবহার করিতে থাকিতেন।

অবশেষে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া যখন দাসীকে গোপনে ডাকিয়া পরেশ নানাপ্রকার সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন তখন সে-সকল কথা গৌরীর কর্ণ-গোচর হইতে লাগিল। অভিমানিনী স্বল্পভাষিণী নারী অপমানে আহত সিংহিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিলেন এবং এই উন্মত্ত সন্দেহ দম্পতির মাঝখানে প্রলয়খড়্গের মতো পড়িয়া উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

গৌরীর কাছে তাঁহার তীব্র সন্দেহ প্রকাশ পাইয়া যখন একবার লজ্জা ভাঙিয়া গেল তখন পরেশ স্পষ্টতই প্রতিদিন পদে পদে আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়া স্ত্রীর সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল এবং গৌরী যতই নিরুত্তর অবজ্ঞা এবং কষাঘাতের ন্যায় তীক্ষ্ম কটাক্ষ দ্বারা তাঁহাকে আপাদমস্তক যেন ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল ততই তাঁহার সংশয়মত্ততা আরও যেন বাড়িবার দিকে চলিল।

এইরূপ স্বামীসুখ হইতে প্রতিহত হইয়া পুত্রহীনা তরুণী ধর্মে মন দিল। হরিসভার নবীন প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দস্বামীকে ডাকিয়া মন্ত্র লইল এবং তাঁহার নিকট ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতে আরম্ভ করিল। নারীহৃদয়ের সমস্ত ব্যর্থ স্নেহ প্রেম কেবল ভক্তি-আকারে পুঞ্জীভূত হইয়া গুরুদেবের পদতলে সমর্পিত হইল।

পরমানন্দের সাধু চরিত্র সম্বন্ধে দেশে বিদেশে কাহারও মনে সংশয়মাত্র ছিল না। সকলে তাঁহাকে পূজা করিত। পরেশ ইঁহার সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া সংশয় প্রকাশ করিতে পারিতেন না বলিয়াই তাহা গুপ্ত ক্ষতের মতো ক্রমশ তাঁহার মর্মের নিকট পর্যন্ত খনন করিয়া চলিয়াছিল।

একদিন সামান্য কারণে বিষ উদ্গীরিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর কাছে পরমানন্দকে উল্লেখ করিয়া 'দুশ্চরিত্র ভণ্ড' বলিয়া গালি দিলেন এবং কহিলেন, "তোমার শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথপূর্বক বলো দেখি, সেই বকধার্মিককে তুমি মনে মনে ভালোবাস না।"

দলিত ফণিনীর ন্যায় মুহূর্তের মধ্যেই উদগ্র হইয়া মিথ্যা স্পর্ধা দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া গৌরী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "ভালোবাসি, তুমি কী করিতে চাও করো!" পরেশ তৎক্ষণাৎ ঘরে তালাচাবি লাগাইয়া তাহাকে রুদ্ধ করিয়া আদালতে চলিয়া গেল।

অসহ্য রোষে গৌরী কোনোমতে দ্বার উন্মোচন করাইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরমানন্দ নিভৃত ঘরে জনহীন মধ্যাহ্নে শাস্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ অমেঘ-বাহিনী বিদ্যুল্লতার মতো গৌরী ব্রহ্মচারীর শাস্ত্রাধ্যয়নের মাঝখানে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

গুরু কহিলেন, "এ কী।"

শিষ্য কহিল, "গুরুদেব, অপমানিত সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলো, তোমার সেবাব্রতে আমি জীবন উৎসর্গ করিব।"

পরমানন্দ কঠোর ভর্ৎসনা করিয়া গৌরীকে গৃহে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু, হায় গুরুদেব, সেদিনকার সেই অকস্মাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন অধ্যয়নসূত্র আর কি তেমন করিয়া জোড়া লাগিতে পারিল।

পরেশ গৃহে আসিয়া মুক্তদ্বার দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কে আসিয়াছিল।"

স্ত্রী কহিল, "কেহ আসে নাই, আমি গুরুদেবের গৃহে গিয়াছিলাম।"

পরেশ মুহূর্তকাল পাংশু এবং পরক্ষণেই রক্তবর্ণ হইয়া কহিলেন, "কেন গিয়াছিলে।"

গৌরী কহিল, "আমার খুশি।"

সেদিন হইতে পাহারা বসাইয়া স্ত্রীকে ঘরে রুদ্ধ করিয়া পরেশ এমনি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে, শহরময় কুৎসা রটিয়া গেল।

এই-সকল কুৎসিত অপমান ও অত্যাচারের সংবাদে পরমানন্দের হরিচিন্তা দূর হইয়া গেল। এই নগর অবিলম্বে পরিত্যাগ করা তিনি কর্তব্য বোধ করিলেন অথচ উৎপীড়িতকে ফেলিয়া কোনোমতেই দূরে যাইতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীর এই কয়দিনকার দিনরাত্রের ইতিহাস কেবল অন্তর্যামীই জানেন।

অবশেষে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া গৌরী একদিন পত্র পাইল, "বৎসে, আলোচনা করিয়া দেখিলাম, ইতিপূর্বে অনেক সাধ্বী সাধকরমণী কৃষ্ণপ্রেমে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সংসারের অত্যাচারে হরিপাদপদ্ম হইতে তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে তবে জানাইলে ভগবানের সহায়তায় তাঁহার সেবিকাকে উদ্ধার করিয়া প্রভুর অভয় পদারবিন্দে উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইব। ২৬শে ফাল্গুন বুধবারে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় ইচ্ছা করিলে তোমাদের পুষ্করিণীতীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।"

গৌরী পত্রখানি কেশে বাঁধিয়া খোঁপার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল। ২৬শে ফাল্গুন

মধ্যাহ্নে স্নানের পূর্বে চুল খুলিবার সময় দেখিল, চিঠিখানি নাই। হঠাৎ সন্দেহ হইল, হয়তো চিঠিখানি কখন বিছানায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা তাহার স্বামীর হস্তগত হইয়াছে। স্বামী সে পত্র-পাঠে ঈর্ষায় দগ্ধ হইতেছে মনে করিয়া গৌরী মনে মনে একপ্রকার জ্বালাময় আনন্দ অনুভব করিল ; কিন্তু তাহার শিরোভূষণ পত্রখানি পাষণ্ডহস্তস্পর্শে লাঞ্ছিত হইতেছে, এ কল্পনাও তাহার সহ্য হইল না। দ্রুতপদে স্বামীগৃহে গেল।

দেখিল, স্বামী ভূতলে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে, মুখ দিয়া ফেনা পড়িতেছে, চক্ষুতারকা কপালে উঠিয়াছে। দক্ষিণ বদ্ধমুষ্টি হইতে পত্রখানি ছাড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইল।

ডাক্তার আসিয়া কহিল, আপোপ্লেক্সি—তখন রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

সেইদিন মফস্বলে পরেশের একটি জরুরি মকদ্দমা ছিল। সন্ন্যাসীর এতদূর পতন হইয়াছিল যে, তিনি সেই সংবাদ লইয়া গৌরীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সদ্যবিধবা গৌরী যেমন বাতায়ন হইতে গুরুদেবকে চোরের মতো পুষ্করিণীর তটে দেখিল, তৎক্ষণাৎ বজ্রচকিতের ন্যায় দৃষ্টি অবনত করিল। গুরু যে কোথা হইতে কোথায় নামিয়াছেন, তাহা যেন বিদ্যুতালোকে সহসা এই মুহূর্তে তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গুরু ডাকিলেন, "গৌরী!"

গৌরী কহিল, "আসিতেছি, গুরুদেব।"

মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পরেশের বন্ধুগণ যখন সৎকারের জন্য উপস্থিত হইল, দেখিল, গৌরীর মৃতদেহ স্বামীর পার্শ্বে শয়ান। সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। আধুনিক কালে এই আশ্চর্য সহমরণের দৃষ্টান্তে সতীমাহাত্ম্যে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রাবণ ১৩০৭

দুর্বুদ্ধি

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া তাহা খোলসা করিয়া বলিব না, আভাস দিব মাত্র।

আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তার, পুলিসের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগাবাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না, সুতরাং নর এবং নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধরকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।

এই-সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোগা ললিত চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু, শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে নূতন পাঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভলগ্নই ব্যর্থ হইল। আমারই চোখের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দোলায় চড়িল, আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহির-বাড়িতে মিষ্টান্ন খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশীর বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সুবিধামত টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব, এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর-একটি শুভকর্মের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে, শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামি পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে পুলিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড়ো অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধুও বটে, কোনোমতে উদ্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনও সদর কখনও খিড়কি-দরজা দিয়া অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "ব্যাপারটা বড়ো গুরুতর।" দুটো-একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম, কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহুল্য, কন্যার অন্ত্যেষ্টি-সংকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশী করুণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।"

আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, "যা যা, তোর এত খবরে দরকার কী।"

এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ, ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গৃহিণী নাই, প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল। সর্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল।

গায়ে-হলুদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশীকে ওলাউঠায় ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর নিষ্ফল ঔষধের শিশিগুলা ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম, "মাপ করো, দাদা, এই পাষণ্ডকে মাপ করো। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেহ নাই।"

হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু, করেন কী, করেন কী। আপনার কাছে আমি চিরঋণী, আমার পায়ে হাত দিবেন না।"

আমি কহিলাম, "নিরপরাধে আমি তোমার সর্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।"

এই বলিয়া সর্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ওগো, আমি এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি; ভগবান আমার শশীকে রক্ষা করুন।"

বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম; বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল।

পরদিন দশটা-বেলায় গায়ে-হলুদের হরিদ্রাচিহ্ন লইয়া শশী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার পরদিনেই দারোগাবাবু কহিলেন, "ওহে, আর কেন, এইবার বিবাহ করিয়া ফেলো। দেখাশুনার তো একজন লোক চাই।"

মানুষের মর্মান্তিক দুঃখশোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা শয়তানকেও শোভা পায় না। কিন্তু, নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে, কোনো কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধুত্ব সেই দিন যেন আমাকে চাবুক মারিয়া অপমান করিল।

হৃদয় যতই ব্যথিত থাক্, কর্মচক্র চলিতেই থাকে। আগেকার মতোই ক্ষুধার আহার, পরিধানের বস্ত্র, এমন-কি চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পর্যন্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কানে সেই করুণ কণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে, "বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।" দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম, আমার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার বন্ধকি জোতজমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

কিছুদিন সদ্যশোকের দুঃসহ বেদনায় নির্জন সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলই মনে হইত, আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্মে পরলোকে কোনোমতেই শান্তি পাইতেছে না। সে যেন ব্যথিত হইয়া কেবলই আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, "বাবা, কেন এমন করিলে।"

কিছুদিন এমনি হইয়াছিল, গরিবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ করিতে

পারিতাম না। কোনো ছোটো মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত, আমার শশীই যেন পল্লির সমস্ত রুগ্না বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তখন পুরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে। ধানের খেত এবং গৃহের অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোররাত্রি হইতে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, এখনও বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারিবাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পান্সির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপূর্বে এরূপ দুর্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়া দেখিত, তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না এবং একটি ব্যগ্র কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট হইতে সযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শূন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহময় মুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। তাহার রুদ্ধ শয়নঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শূন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া বুকের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল। বাহিরে বড়োলোকের ভৃত্যের তর্জনস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সম্বরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি, থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী রে।" উত্তরে শুনিলাম, গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট্ করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূরগ্রাম হইতে বাহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম, সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারি কাছারির অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনও সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে; দারোগাবাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন-অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুঁইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্বার বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনও লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে এই নদী, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো। বারম্বার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্স্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ট্যাঁকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরিব, তাহার কিছু নাই। কন্স্টেবল বলিয়া গেছে, "থাক্ বেটা, তবে এখন বসিয়া থাক্।"

এমন দৃশ্য পূর্বেও অনেকবার দেখিয়াছি, কখনও কিছুই মনে হয় নাই। আজ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশীর করুণাগদ্‌গদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল। ঐ কন্যাহারা বাক্যহীন চাষার

অপরিমেয় দুঃখ আমার বুকের পাঁজরগুলাকে যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

দারোগাবাবু বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়্‌গুড়ি টানিতেছিলেন। তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন ; তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আপনারা মানুষ না পিশাচ?" বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জনের টাকা ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, "টাকা চান তো এই নিন, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন ; এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন, ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক।"

বহু উৎপীড়িতের অশ্রুসেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিভ্রংশ লইয়া অনেক আত্মধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।

ভাদ্র ১৩০৭

ফেল

ন্যাজা এবং মুড়া, রাহু এবং কেতু, পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেইরকম। প্রাচীন হালদার-বংশ দুই খণ্ডে পৃথক হইয়া প্রকাণ্ড বসত-বাড়ির মাঝখানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে; কেহ কাহারও মুখদর্শন করে না।

নবগোপালের ছেলে নলিন এবং ননীগোপালের ছেলে নন্দ একবংশজাত, এক-বয়সি, এক ইস্কুলে যায় এবং পারিবারিক বিদ্বেষ ও রেষারেষিতেও উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য।

নলিনের বাপ নবগোপাল অত্যন্ত কড়া লোক। ছেলেকে হাঁপ ছাড়িতে দিতেন না, পড়াশুনো ছাড়া আর কথা ছিল না। খেলা খাদ্য ও সাজসজ্জা সম্বন্ধে ছেলের সর্বপ্রকার শখ তিনি খাতাপত্র ও ইস্কুল-বইয়ের নীচে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দর বাপ ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল। মা তাহাকে অত্যন্ত ফিট্‌ফাট্‌ করিয়া সাজাইয়া ইস্কুলে পাঠাইতেন, আনা-তিনেক জলপানিও সঙ্গে দিতেন; নন্দ ভাজা মসলা ও কুলপির বরফ, লাঠিম ও মার্বলগুলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

মনে মনে পরাভব অনুভব করিয়া নলিন কেবলই ভাবিত, নন্দর বাবা যদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত, তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।

কিন্তু, সেরূপ সুযোগ ঘটিবার পূর্বে ইতিমধ্যে নন্দ বৎসরে বৎসরে প্রাইজ পাইতে লাগিল; নলিন রিক্তহস্তে বাড়ি আসিয়া ইস্কুলের কর্তৃপক্ষদের নামে পক্ষপাতের অপবাদ দিতে লাগিল। বাপ তাহাকে অন্য ইস্কুলে দিলেন, বাড়িতে অন্য মাস্টার রাখিলেন, ঘুমের সময় হইতে একঘণ্টা কাটিয়া পড়ার সময়ে যোগ করিলেন, কিন্তু ফলের তারতম্য হইল না। নন্দ পাস করিতে করিতে বি. এ. উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নলিন ফেল করিতে করিতে এন্‌ট্রান্স-ক্লাসে জাঁতিকলের ইঁদুরের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।

এমন সময় তাহার পিতা তাহার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি মরিলেন। তিন বৎসর মেয়াদ খাটিয়া এন্‌ট্রান্স্‌-ক্লাস হইতে তাহার মুক্তি হইল এবং স্বাধীন নলিন আংটি, বোতাম, ঘড়ির চেনে আদ্যোপান্ত ঝক্‌মক্‌ করিয়া নন্দকে নিরতিশয় নিষ্প্রভ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এন্‌ট্রান্স্‌-ফেলের জুড়ি চৌঘুড়ি, বি. এ.-পাসের এক-ঘোড়ার গাড়িকে অনায়াসে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ওয়েলার-ঘোড়ার সহিত সমান চালে চলিতে পারিল না।

এ দিকে নলিন এবং নন্দর বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান চলিতেছে। নলিনের প্রতিজ্ঞা, সে এমন কন্যা বিবাহ করিবে যাহার উপমা মেলা ভার, তাহার জুড়ি এবং তাহার স্ত্রীর কাছে নন্দকে হার মানিতেই হইবে।

সবচেয়ে ভালোর জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা, অনেক ভালো তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কাছাকাছি কোনো মেয়েকেই নলিন পছন্দ করিয়া খতম করিতে সাহস করিল না,

পাছে আরও ভালো তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর-কাহারও ভাগ্যে জোটে।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল, রাওলপিণ্ডিতে এক প্রবাসী বাঙালির এক পরমা-সুন্দরী মেয়ে আছে। কাছের-সুন্দরীর চেয়ে দূরের সুন্দরীকে বেশি লোভনীয় বলিয়া মনে হয়। নলিন মাতিয়া উঠিল, খরচপত্র দিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনানো হইল। কন্যাটি সুন্দরী বটে। নলিন কহিল, "যিনি যাই করুন, ফস্ করিয়া রাওলপিণ্ডি ছাড়াইয়া যাইবেন এমন সাধ্য কাহারও নাই। অন্তত এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, এ মেয়ে তো আমরা পূর্বেই দেখিয়াছিলাম, পছন্দ হয় নাই বলিয়া সম্বন্ধ করি নাই।"

কথাবার্তা তো প্রায় একপ্রকার স্থির, পানপত্রের আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একদিন প্রাতে দেখা গেল, ননীগোপালের বাড়ি হইতে বিচিত্র থালার উপর বিবিধ উপঢৌকন লইয়া দাসীচাকরের দল সার বাঁধিয়া চলিয়াছে।

নলিন কহিল, "দেখে এসো তো হে, ব্যাপারখানা কী।"

খবর আসিল, নন্দর ভাবী বধূর জন্য পানপত্র যাইতেছে।

নলিন তৎক্ষণাৎ গুড়্গুড়ি টানা বন্ধ করিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, "খবর নিতে হচ্ছে তো।"

তৎক্ষণাৎ গাড়ি ভাড়া করিয়া ছড়্ছড়্ শব্দে দূত ছুটিল। বিপিন হাজরা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কলকাতার মেয়ে, কিন্তু খাসা মেয়ে।"

নলিনের বুক দমিয়া গেল; কহিল, "বল কী হে!"

হাজরা কেবলমাত্র কহিল, "খাসা মেয়ে।"

নলিন বলিল, "এ তো দেখতে হচ্ছে!"

পারিষদ বলিল, "সে আর শক্তটা কী।" বলিয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে একটা কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

সুযোগ করিয়া নলিন মেয়ে দেখিল। যতই মনে হইল, এ মেয়ে নন্দর জন্য একেবারে স্থির হইয়া গেছে, ততই বোধ হইতে লাগিল, মেয়েটি রাওলপিণ্ডজার চেয়ে ভালো দেখিতে। দ্বিধাপীড়িত হইয়া নলিন পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ঠেকছে হে।"

হাজরা কহিল, "আজ্ঞে, আমাদের চোখে তো ভালোই ঠেকছে।"

নলিন কহিল, "সে ভালো কি এ ভালো।"

হাজরা বলিল, "এই ভালো।"

তখন নলিনের বোধ হইল, ইহার চোখের পল্লব তাহার চেয়ে আরও একটু যেন ঘন; তাহার রঙটা ইহার চেয়ে একটু যেন বেশি ফ্যাকাসে, ইহার গৌরবর্ণে একটু যেন হলদে আভায় সোনা মিশাইয়াছে। ইহাকে তো হাতছাড়া করা যায় না।

নলিন বিমর্ষভাবে চিত হইয়া গুড়্গুড়ি টানিতে টানিতে কহিল, "ওহে হাজরা, কী করা যায় বলো তো।"

হাজরা বলিল, "মহারাজ, শক্তটা কী।" বলিয়া পুনশ্চ অঙ্গুষ্ঠে তর্জনীতে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

টাকাটা যখন সত্যই সশব্দে বাজিয়া উঠিল তখন যথোচিত ফল হইতে বিলম্ব হইল না। কন্যার পিতা একটা অকারণ ছুতা করিয়া বরের পিতার সহিত ঝুম্‌লে

ঝগড়া বাধাইলেন। বরের পিতা বলিলেন, "তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কন্যার পিতা আরও একগুণ অধিক করিয়া বলিলেন, "তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর আর বিলম্বমাত্র না করিয়া নলিন নন্দকে ফাঁকি দিয়া শুভলগ্নে শুভ-বিবাহ সত্বর সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। এবং হাসিতে হাসিতে হাজরাকে বলিল, "বি. এ. পাস করা তো একেই বলে। কী বলো হে হাজরা! এবারে আমাদের ও বাড়ির বড়োবাবু ফেল।"

অনতিকাল পরেই ননীগোপালের বাড়িতে একদিন ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়া উঠিল। নন্দর গায়ে-হলুদ।

নলিন কহিল, "ওহে হাজরা, খবর লও তো পাত্রীটি কে।"

হাজরা আসিয়া খবর দিল, পাত্রীটি সেই রাওলপিণ্ডির মেয়ে।

রাওলপিণ্ডির মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ। নলিন অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। ও বাড়ির বড়োবাবু আর কন্যা পাইলেন না, আমাদেরই পরিত্যক্ত পাত্রীটিকে বিবাহ করিতেছেন। হাজরাও বিস্তর হাসিল।

কিন্তু, উত্তরোত্তর নলিনের হাসির আর জোর রহিল না। তাহার হাসির মধ্যে কীট প্রবেশ করিল। একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্ন স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল, "আহা, হাতছাড়া হইয়া গেল! শেষকালে নন্দর কপালে জুটিল!" ক্ষুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তস্ফীত জোঁকের মতো বড়ো হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বরও মোটা হইল। সে বলিল, "এখন আর কোনোমতেই ইহাকে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু আসলে ইহাকেই দেখিতে ভালো। ভারি ঠকিয়াছ।"'

অন্তঃপুরে নলিন যখন খাইতে গেল তখন তাহার স্ত্রীর ছোটোখাটো সমস্ত খুঁত মস্ত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, স্ত্রীটা তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে।

রাওলপিণ্ডিতে যখন সম্বন্ধ হইতেছিল তখন নলিন সেই কন্যার যে ফোটো পাইয়াছিল সেইখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। "বাহবা, অপরূপ রূপমাধুরী! এমন লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া ঠেলিয়াছি, আমি এতবড়ো গাধা!"

বিবাহসন্ধ্যায় আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া জুড়িতে চড়িয়া বর বাহির হইল। নলিন শুইয়া পড়িয়া গুড়গুড়ি হইতে যৎসামান্য সান্ত্বনা আকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় হাজরা প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া নন্দকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস জমাইবার উপক্রম করিল।

নলিন হাঁকিল, "দারোয়ান!"

হাজরা তটস্থ হইয়া দরোয়ানকে ডাকিয়া দিল।

বাবু হাজরাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "অবি হি ইস্কো কান পকড়্‌কে বাহার নিকাল দো।"

আশ্বিন ১৩০৭

শুভদৃষ্টি

কান্তিচন্দ্রের বয়স অল্প, তথাপি স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় স্ত্রীর অনুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকিয়া পশুপক্ষী-শিকারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘ কৃশ কঠিন লঘু শরীর, তীক্ষ্ম দৃষ্টি, অব্যর্থ লক্ষ্য, সাজসজ্জায় পশ্চিমদেশীর মতো; সঙ্গে সঙ্গে কুস্তিগির হীরা সিং ছক্কনলাল, এবং গাইয়ে বাজিয়ে খাঁসাহেব, মিঞাসাহেব অনেক ফিরিয়া থাকে; অকর্মণ্য অনুচর-পরিচরেরও অভাব নাই।

দুইচারিজন শিকারী বন্ধুবান্ধব লইয়া অঘ্রানের মাঝামাঝি কান্তিচন্দ্র নৈদিঘির বিলের ধারে শিকার করিতে গিয়াছেন। নদীতে দুইটি বড়ো বোটে তাঁহাদের বাস, আরও গোটা-তিনচার নৌকায় চাকরবাকরের দল গ্রামের ঘাট ঘিরিয়া বসিয়া আছে। গ্রামবধূদের জল তোলা, স্নান করা প্রায় বন্ধ। সমস্ত দিন বন্দুকের আওয়াজে জলস্থল কম্পমান, সন্ধ্যাবেলায় ওস্তাদি গলার তানকর্তবে পল্লির নিদ্রাতন্দ্রা তিরোহিত।

একদিন সকালে কান্তিচন্দ্র বোটে বসিয়া বন্দুকের চোঙ সযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময় অনতিদূরে হাঁসের ডাক শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটি বালিকা দুই-হাতে দুইটি তরুণ হাঁস বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ঘাটে আনিয়াছে। নদীটি ছোটো, প্রায় স্রোতহীন, নানাজাতীয় শৈবালে ভরা। বালিকা হাঁস দুইটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া, একেবারে আয়ত্তের বাহিরে না যায় এইভাবে, ত্রস্তসতর্ক স্নেহে তাহাদের আগলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এটুকু বুঝা গেল, অন্য দিন সে তাহার হাঁস জলে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু সম্প্রতি শিকারীর ভয়ে নিশ্চিন্তচিত্তে রাখিয়া যাইতে পারিতেছে না।

মেয়েটির সৌন্দর্য নিরতিশয় নবীন, যেন বিশ্বকর্মা তাহাকে সদ্য নির্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বয়স ঠিক করা শক্ত। শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুখটি এমন কাঁচা যে, সংসার কোথাও যেন তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই। সে যে যৌবনে পা ফেলিয়াছে·এখনও নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পৌঁছে নাই।

কান্তিচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দুক সাফ করায় ঢিল দিলেন। তাঁহার চমক লাগিয়া গেল। এমন জায়গায় এমন মুখ দেখিবেন বলিয়া কখনও আশা করেন নাই। অথচ, রাজার অন্তঃপুরের চেয়ে এই জায়গাতেই এই মুখখানি মানাইয়াছিল। সোনার ফুল-দানির চেয়ে গাছেই ফুলকে সাজে। সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরের বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল। মন্দাকিনীতীরে তরুণ পার্বতী কখনও কখনও এমন হংসশিশু বক্ষে লইয়া আসিতেন, কালিদাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন।

এমন সময় হঠাৎ মেয়েটি ভীতত্রস্ত হইয়া কাঁদো-কাঁদো মুখে তাড়াতাড়ি হাঁস দুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া অব্যক্ত আর্তস্বরে ঘাট ত্যাগ করিয়া চলিল। কান্তিচন্দ্র কারণসন্ধানে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার একটি রসিক পারিষদ কৌতুক করিয়া বালিকাকে ভয় দেখাইবার জন্য হাঁসের দিকে ফাঁকা বন্দুক লক্ষ্য করিয়াছে। কান্তিচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া হঠাৎ তাহার গালে সশব্দে প্রকাণ্ড একটি চপেটাঘাত

করিলেন, অকস্মাৎ রসভঙ্গ হইয়া লোকটা সেইখানে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। কান্তি পুনরায় কামরায় আসিয়া বন্দুক সাফ করিতে লাগিলেন।

সেইদিন বেলা প্রহর-তিনেকের সময় গ্রামপথের ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া শিকারীর দল শস্যক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বন্দুকের আওয়াজ করিয়া দিল। কিছু দূরে বাঁশঝাড়ের উপর হইতে কী-একটা পাখি আহত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভিতরের দিকে পড়িয়া গেল।

কৌতূহলী কান্তিচন্দ্র পাখির সন্ধানে ঝোপঝাড় ভেদ করিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন, একটি সচ্ছল গৃহস্থঘর, প্রাঙ্গণে সারি সারি ধানের গোলা। পরিচ্ছন্ন বৃহৎ গোয়ালঘরের কুলগাছতলায় বসিয়া সকালবেলাকার সেই মেয়েটি একটি আহত ঘুঘু বুকের কাছে তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে এবং গামলার জলে অঞ্চল ভিজাইয়া পাখির চঞ্চুপুটের মধ্যে জল নিংড়াইয়া দিতেছে। পোষা বিড়ালটা তাহার কোলের উপর দুই পা তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে ঘুঘুটির প্রতি উৎসুক দৃষ্টিপাত করিতেছে; বালিকা মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকাগ্রভাগে তর্জনী-আঘাত করিয়া লুব্ধ জন্তুর অতিরিক্ত আগ্রহ দমন করিয়া দিতেছে।

পল্লির নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে একটি গৃহস্থপ্রাঙ্গণের সচ্ছল শান্তির মধ্যে এই করুণ-ছবি এক মুহূর্তেই কান্তিচন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। বিরলপল্লব গাছটির ছায়া ও রৌদ্র বালিকার ক্রোড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; অদূরে আহারপরিতৃপ্ত পরিপুষ্ট গাভী আলস্যে মাটিতে বসিয়া শৃঙ্গ ও পুচ্ছ -আন্দোলনে পিঠের মাছি তাড়াইতেছে; মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়ে ফিস্ ফিস্ কথার মতো নূতন উত্তরবাতাসে খস্ খস্ শব্দ উঠিতেছে। সেদিন প্রভাতে নদীতীরে বনের মধ্যে যাহাকে বনশ্রীর মতো দেখিতে হইয়াছিল, আজ মধ্যাহ্নে নিস্তব্ধ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে স্নেহ-বিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।

কান্তিচন্দ্র বন্দুকহস্তে হঠাৎ এই ব্যথিত বালিকার সম্মুখে আসিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল, 'যেন বমালসুদ্ধ চোর ধরা পড়িলাম।' 'পাখিটি যে আমার গুলিতে আহত হয় নাই' কোনোপ্রকারে এই কৈফিয়তটুকু দিতে ইচ্ছা হইল। কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কুটির হইতে কে ডাকিল, "সুধা।" বালিকা যেন চমকিত হইয়া উঠিল। আবার ডাক পড়িল, "সুধা।" তখন সে-তাড়াতাড়ি পাখিটি লইয়া কুটিরমুখে চলিয়া গেল। কান্তিচন্দ ভাবিলেন, নামটি উপযুক্ত বটে। সুধা!

কান্তি তখন দলের লোকের হাতে বন্দুক রাখিয়া সদর পথ দিয়া সেই কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একটি প্রৌঢ়বয়স্ক মুণ্ডিতমুখ শান্ত-মূর্তি ব্রাহ্মণ দাওয়ায় বসিয়া হরিভক্তিবিলাস পাঠ করিতেছেন। ভক্তিমণ্ডিত তাঁহার মুখের সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাবের সহিত কান্তিচন্দ্র সেই বালিকার দয়ার্দ্র মুখের সাদৃশ্য অনুভব করিলেন।

কান্তি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "তৃষ্ণা পাইয়াছে ঠাকুর, এক ঘটি জল পাইতে পারি কি।"

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ভিতর হইতে পিতলের রেকাবিতে কয়েকটি বাতাসা ও কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া স্বহস্তে অতিথির

সম্মুখে রাখিলেন।

কান্তি জল খাইলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় লইলেন। কান্তি পরিচয় দিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, আপনার যদি কোনো উপকার করিতে পারি তো কৃতার্থ হই।"

নবীন বাঁড়ুজ্জে কহিলেন, "বাবা, আমার আর কী উপকার করিবে। তবে সুধা বলিয়া আমার একটি কন্যা আছে, তাহার বয়স হইতে চলিল, তাহাকে একটি সৎপাত্রে দান করিতে পারিলেই সংসারের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি। কাছে কোথাও ভালো ছেলে দেখি না, দূরে সন্ধান করিবার মতো সামর্থ্যও নাই; ঘরে গোপীনাথের বিগ্রহ আছে, তাঁহাকে ফেলিয়া কোথাও যাই নাই।"

কান্তি কহিলেন, "আপনি নৌকায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।"

এ দিকে কান্তির প্রেরিত চরগণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সুধার কথা যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল সকলেই একবাক্যে কহিল, এমন লক্ষ্মীস্বভাবা কন্যা আর হয় না।

পরদিন নবীন বোটে উপস্থিত হইলে কান্তি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং জানাইলেন, তিনিই ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন। ব্রাহ্মণ এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে রুদ্ধকণ্ঠে কিছুক্ষণ কথাই কহিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, কিছু-একটা ভ্রম হইয়াছে। কহিলেন, "আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে?"

কান্তি কহিলেন, "আপনার যদি সম্মতি থাকে, আমি প্রস্তুত আছি।"

নবীন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুধাকে?"—উত্তরে শুনিলেন, "হাঁ।"

নবীন স্থিরভাবে কহিলেন, "তা দেখাশোনা—"

কান্তি, যেন দেখেন নাই, ভাণ করিয়া কহিলেন, "সেই একেবারে শুভদৃষ্টির সময়।"

নবীন গদ্গদকণ্ঠে কহিলেন, "আমার সুধা বড়ো সুশীলা মেয়ে, রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজে অদ্বিতীয়। তুমি যেমন না দেখিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ তেমনি আশীর্বাদ করি, আমার সুধা পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী হইয়া চিরকাল তোমার মঙ্গল করুক। কখনও মুহূর্তের জন্য তোমার পরিতাপের কারণ না ঘটুক।"

কান্তি আর বিলম্ব করিতে চাহিলেন না, মাঘ মাসেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

পাড়ার মজুমদারদের পুরাতন কোঠাবাড়িতে বিবাহের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বর হাতি চড়িয়া মশাল জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত।

শুভদৃষ্টির সময় বর কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। নতশির টোপর-পরা চন্দনচর্চিত সুধাকে ভালো করিয়া যেন দেখিতে পাইলেন না। উদ্বেলিত হৃদয়ের আনন্দে চোখে যেন ধাঁধা লাগিল।

বাসরঘরে পাড়ার সরকারি ঠানদিদি যখন বরকে দিয়া জোর করিয়া মেয়ের ঘোমটা খোলাইয়া দিলেন তখন কান্তি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন।

এ তো সেই মেয়ে নয়! হঠাৎ বুকের কাছ হইতে একটা কালো বজ্র উঠিয়া তাঁহার মস্তিষ্ককে যেন আঘাত করিল, মুহূর্তে বাসরঘরের সমস্ত প্রদীপ যেন অন্ধকার হইয়া গেল এবং সেই অন্ধকারপ্লাবনে নববধূর মুখখানিকেও যেন কালিমালিপ্ত করিয়া দিল।

কান্তিচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলেন; সেই প্রতিজ্ঞা কি এমনি একটা অদ্ভুত পরিহাসে অদৃষ্ট তুড়ি দিয়া ভাঙিয়া দিল! কত ভালো ভালো বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের সানুনয় অনুরোধ অবহেলা করিয়াছেন; উচ্চকুটুম্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপখ্যাতির মোহ, সমস্ত কাটাইয়া অবশেষে কোন্‌-এক অজ্ঞাত পল্লিগ্রামে বিলের ধারে এক অজ্ঞাত দরিদ্রের ঘরে এতবড়ো বিড়ম্বনা, লোকের কাছে মুখ দেখাইবেন কী করিয়া।

শ্বশুরের উপরে প্রথমটা রাগ হইল। 'প্রতারক এক মেয়ে দেখাইয়া আর-এক মেয়ের সহিত আমার বিবাহ দিল।' কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, নবীন তো তাঁহাকে বিবাহের পূর্বে কন্যা দেখাইতে চান নাই এমন নয়, তিনি নিজেই দেখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। বুদ্ধির দোষে যে এতবড়ো ঠকাটা ঠকিয়াছেন সে লজ্জার কথাটা কাহারও কাছে প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

ঔষধ যেন গিলিলেন কিন্তু মুখের তারটা বিগড়াইয়া গেল। বাসরঘরের ঠাট্টা আমোদ কিছুই তাহার কাছে রুচিল না। নিজের এবং সর্বসাধারণের প্রতি রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী বধূ অব্যক্ত ভীত স্বরে চমকিয়া উঠিল। সহসা তাহার কোলের কাছ দিয়া একটা খরগোসের বাচ্ছা ছুটিয়া গেল। পরক্ষণেই সেদিনকার সেই মেয়েটি শশকশিশুর অনুসরণ-পূর্বক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া একান্ত স্নেহে আদর করিতে লাগিল। "ঐ রে, পাগলি আসিয়াছে" বলিয়া সকলে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। সে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ঠিক বর-কন্যার সম্মুখে বসিয়া শিশুর মতো কৌতূহলে কী হইতেছে দেখিতে লাগিল। বাড়ির কোনো দাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আহা, থাক্‌-না, বসুক।"

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কী।"

সে উত্তর না দিয়া দুলিতে লাগিল।

ঘরসুদ্ধ রমণী হাসিয়া উঠিল।

কান্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাঁসদুটি কতবড়ো হইল।"

অসংকোচে মেয়েটি নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হতবুদ্ধি কান্তি সাহসপূর্বক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই ঘুঘু আরাম হইয়াছে তো?" কোনো ফল পাইলেন না। মেয়েরা এমনভাবে হাসিতে লাগিল যেন বর ভারি ঠকিয়াছেন।

অবশেষে প্রশ্ন করিয়া খবর পাইলেন, মেয়েটি কালা এবং বোবা, পাড়ার যত পশুপক্ষীর প্রিয়সঙ্গিনী। সেদিন সে যে সুধা ডাক শুনিয়া উঠিয়া ঘরে গিয়াছিল সে তাঁহার অনুমানমাত্র, তাহার আর-কোনো কারণ ছিল।

কান্তি তখন মনে মনে চমকিয়া উঠিলেন। যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে তাঁহার কোনো সুখ ছিল না, শুভদৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন, 'যদি এই মেয়েটির বাপের কাছে যাইতাম এবং সে ব্যক্তি আমার প্রার্থনা-অনুসারে কন্যাটিকে কোনোমতে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিত!'

যতক্ষণ আয়ত্তচ্যুত এই মেয়েটির মোহ তাঁহার মনটিকে আলোড়িত করিতেছিল ততক্ষণ নিজের বধূটি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়াছিলেন। নিকটেই আর কোথাও কিছু সান্ত্বনার কারণ ছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। যেই শুনিলেন মেয়েটি বোবা ও কালা অমনি সমস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। দূরের আশা দূর হইয়া নিকটের জিনিসগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সুগভীর পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলিয়া কান্তি লজ্জাবনত বধূর মুখের দিকে কোনো-এক সুযোগে চাহিয়া দেখিলেন। এতক্ষণে যথার্থ শুভদৃষ্টি হইল। চর্মচক্ষুর অন্তরালবর্তী মনোনেত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল। হৃদয় হইতে এবং প্রদীপ হইতে সমস্ত আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া একটিমাত্র কোমল সুকুমার মুখের উপরে প্রতিফলিত হইল; কান্তি দেখিলেন, একটি স্নিগ্ধ শ্রী, একটি শান্ত লাবণ্যে মুখখানি মণ্ডিত। বুঝিলেন, নবীনের আশীর্বাদ সার্থক হইবে।

আশ্বিন ১৩০৭

যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ

এক সময় যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালোই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙা কোঠাবাড়িটাকে সাপ-ব্যাঙ-বাদুড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খোড়ো ঘরে ভগবদ্গীতা লইয়া কালযাপন করিতেছেন।

এগারো বৎসর পূর্বে তাঁহার মেয়েটি যখন জন্মিয়াছিল তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেইজন্য সাধ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কমলা। ভাবিয়াছিলেন, যদি এই কৌশলে ফাঁকি দিয়া চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কন্যারূপে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারেন। লক্ষ্মী সে ফন্দিতে ধরা দিলেন না, কিন্তু মেয়েটির মুখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড়ো সুন্দরী মেয়ে।

মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বরের যে খুব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে-কোনো একটি সৎপাত্রে বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যাঠাইমা তাঁহার বড়ো আদরের কমলাকে বড়ো ঘর না হইলে দিবেন না, পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নিজের হাতে অল্প-কিছু সংগতি ছিল, ভালো পাত্র পাইলে তাহা বাহির করিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছেন।

অবশেষে জ্যাঠাইমার উত্তেজনায় শাস্ত্রাধ্যয়নগুঞ্জিত শান্ত পল্লিগৃহ ছাড়িয়া যজ্ঞেশ্বর পাত্রসন্ধানে বাহির হইলেন। রাজশাহিতে তাঁহার এক আত্মীয়-উকিলের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকিলের মক্কেল ছিলেন জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিভূতিভূষণ এই উকিলের অভিভাবকতায় কালেজে পড়াশুনা করিত। ছেলেটি কখন যে মেয়েটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানিতেন।

কিন্তু প্রজাপতির চক্রান্ত যজ্ঞেশ্বরের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। তাই বিভূতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনোপ্রকার দুরাশা স্থান পায় নাই। নিরীহ যজ্ঞেশ্বরের অল্প আশা, অল্প সাহস ; বিভূতির মতো ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে এ তাঁহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

উকিলের যত্নে একটি চলনসই পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি না থাক বিষয়-আশয় আছে। পাস একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টরিতে ৩২৭৫৲ টাকা খাজনা দিয়া থাকে।

পাত্রের দল একদিন আসিয়া মেয়েটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিস্টান্ন ও নাটোরের কাঁচাগোল্লা খাইয়া গেল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শুনিলেন। যজ্ঞেশ্বর মনের আনন্দে তাঁহাকেও কাঁচাগোল্লা খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছু খাইল না। কাহারও সহিত ভালো করিয়া কথাই কহিল না, বাড়ি চলিয়া গেল।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় উকিলবাবু বিভূতির কাছ হইতে এক পত্র পাইলেন। মর্মটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড়ো পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ করিতে উৎসুক।

উকিল ভাবিলেন, 'এ তো বিষম মুশকিলে পড়িলাম। গৌরসুন্দরবাবু ভাবিবেন,

আমিই আমার আত্মীয়কন্যার সহিত তাঁহার ছেলের বিবাহের চক্রান্ত করিতেছি।'

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং পূর্বোক্ত পাত্রটির সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবর্তী করিয়া দিলেন। বিভূতিকে ডাকিয়া অভিভাবকমহাশয় পড়াশুনা ছাড়া আর-কোনো দিকে মন দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। শুনিয়া রাগে বিভূতির জেদ চার গুণ বাড়িয়া গেল।

বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে এমন সময় একদিন যজ্ঞেশ্বরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "এসো, বাবা, এসো।" কিন্তু কোথায় বসাইবেন, কী খাওয়াইবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এখানে নাটোরের কাঁচাগোল্লা কোথায়।

বিভূতিভূষণ যখন স্নানের পূর্বে রোয়াকে বসিয়া তেল মাখিতেছেন তখন জ্যাঠাইমা তাঁহার রজতগিরিনিভ গৌর পুষ্ট দেহটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। যজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের কমলের বিবাহ হয় না কি।"

ভীরু যজ্ঞেশ্বর বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "সে কি হয়।"

জ্যাঠাইমা কহিলেন, "কেন হইবে না। চেষ্টা করিলেই হয়।" এই বলিয়া তিনি বাথানপাড়ার গোয়ালাদের ঘর হইতে ভালো ছানা ও ক্ষীর আনাইয়া বিবিধ আকার ও আয়তনের মোদক-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাহারের পর বিভূতিভূষণ সলজ্জে সসংকোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। যজ্ঞেশ্বর আনন্দে ব্যাকুল হইয়া জ্যাঠাইমাকে সুসংবাদ দিলেন।

জ্যাঠাইমা শান্ত মুখে কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে, বাপু, কিন্তু তুমি একটু ঠাণ্ডা হও।" তাঁহার পক্ষে এটা কিছুই আশাতীত হয় নাই। যদি কমলার জন্য এক দিক হইতে কাবুলের আমীর ও অন্য দিক হইতে চীনের সম্রাট তাঁহার দ্বারস্থ হইত তিনি আশ্চর্য হইতেন না।

ক্ষীণাশ্বাস যজ্ঞেশ্বর বিভূতিভূষণের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখো বাবা, আমার সকল দিক যেন নষ্ট না হয়।"

বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাঁহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৌরসুন্দর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত ছেলেটিকে মনে মনে বিশেষ খাতির করিতেন। তাঁহার কোনো আচরণে বা মতে পাছে তাঁহার ছেলের কাছে সুশিক্ষা বা শিষ্টতার অভাব ধরা পড়ে এই সংকোচ তিনি দূর করিতে পারিতেন না। তাঁহার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র যেন বাপকে মনে মনে ধিক্কার না দেয়, যেন অশিক্ষিত বাপের জন্য তাহাকে লজ্জিত না হইতে হয়, এ চেষ্টা তাঁহার সর্বদা ছিল। কিন্তু তবু যখন শুনিলেন, বিভূতি দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত, তখন প্রথমটা রাগ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। বিভূতি নতশিরে চুপ করিয়া রহিল। তখন গৌরসুন্দর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া কহিলেন, "আমি কি পণের লোভে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি। তা মনে করিয়ো না। নিজের ছেলেকে লইয়া বেহাইয়ের সঙ্গে দরদস্তুর করিতে বসিব, আমি তেমন ছোটোলোক নই। কিন্তু বড়োঘরের মেয়ে চাই।"

বিভূতিভূষণ বুঝাইয়া দিলেন, যজ্ঞেশ্বর সম্ভ্রান্তবংশীয়, সম্প্রতি গরিব হইয়াছেন।

গৌরসুন্দর দায়ে পড়িয়া মত দিলেন কিন্তু মনে মনে যজ্ঞেশ্বরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন।

তখন দুই পক্ষে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আর-সব ঠিক হইল কিন্তু বিবাহ হইবে কোথায় তাহা লইয়া কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না। গৌরসুন্দর এক ছেলের বিবাহে খুব ধুমধাম করিতে চান, কিন্তু বুড়াশিবতলার সেই খোড়ো ঘরে সমস্ত ধুমধাম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি জেদ করিলেন, তাঁহারই বাড়িতে বিবাহসভা হইবে।

শুনিয়া মাতৃহীনা কন্যার দিদিমা কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদেরও তো এক সময় সুদিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া কি সমস্ত সাধ জলাঞ্জলি দিতে হইবে, পিতৃপুরুষের মান বজায় থাকিবে না? সে হইবে না; আমাদের ঘর খোড়ো হউক আর যাই হউক, এইখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

নিরীহপ্রকৃতি যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণের চেষ্টায় কন্যাগৃহেই বিবাহ স্থির হইল।

ইহাতে গৌরসুন্দর এবং তাঁহার দলবল কন্যাকর্তার উপর আরও চটিয়া গেলেন। সকলেই স্থির করিলেন, স্পর্ধিত দরিদ্রকে অপদস্থ করিতে হইবে। বরযাত্র যাহা জোটানো হইল তাহা পল্টনবিশেষ। এ সম্বন্ধে গৌরসুন্দর ছেলের কোনো পরামর্শ লইলেন না।

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। যজ্ঞেশ্বর তাহার স্বল্পাবশিষ্ট যথাসর্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছে। নূতন আটচালা বাঁধিয়াছে, পাবনা হইতে ঘি ময়দা চিনি দধি প্রভৃতি আনাইয়াছে। জ্যাঠাইমা তাঁহার যে গোপন পুঁজির বলে স্বগৃহেই বিবাহপ্রস্তাবে জেদ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় শেষ পয়সাটি পর্যন্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় দুর্ভাগার অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দুইদিন আগে হইতে প্রচণ্ড দুর্যোগ আরম্ভ হইল। ঝড় যদি-বা থামে তো বৃষ্টি থামে না, কিছু ক্ষণের জন্য যদি-বা নরম পড়িয়া আসে আবার দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

গৌরসুন্দর পূর্ব হইতেই গুটিকতক হাতি ও পাল্‌কি স্টেশনে হাজির রাখিয়াছিলেন। আশপাশের গ্রাম হইতে যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গোরুর গাড়ির জোগাড় করিতে লাগিলেন। দুর্দিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না, হাতে পায়ে ধরিয়া দ্বিগুণ মূল্যে কবুল করিয়া যজ্ঞেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরযাত্রের মধ্যে যাহাদিগকে গোরুর গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আগুন হইল।

গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতির পা বসিয়া যায়, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনও বৃষ্টির বিরাম নাই। বরযাত্রগণ ভিজিয়া, কাদা মাখিয়া, বিধিবিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

বর সদলবলে কন্যাকর্তার কুটিরে আসিয়া পৌঁছিলেন। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল। ব্যাকুল যজ্ঞেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলই বলিতে থাকেন, "বড়ো কষ্ট দিলাম, বড়ো কষ্ট দিলাম।" যে আটচালা বানাইয়াছিলেন তাহার চারি দিক হইতে জল

পড়িতেছে। বৈশাখ মাসে যে এমন শ্রাবণধারা বহিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও আশঙ্কা করেন নাই। গণ্ডগ্রামের ভদ্র অভদ্র সমস্ত লোকই যজ্ঞেশ্বরকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিল ; সংকীর্ণ স্থানকে তাহারা আরও সংকীর্ণ করিয়া তুলিল এবং বৃষ্টির কল্লোলের উপর তাহাদের কলরব যোগ হইয়া একটা সমুদ্রমন্থনের মতো গোলমালের উৎপত্তি হইল। পল্লিবৃদ্ধগণ ধনী অতিথিদের সম্মাননার উপযুক্ত উপায় না দেখিয়া যাহাকে-তাহাকে ক্রমাগতই জোড়হস্তে বিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বরকে যখন অন্তঃপুরে লইয়া গেল তখন ক্রুদ্ধ বরযাত্রীর দল রব তুলিল, তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে, আহার চাই। মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর গলায় কাপড় দিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার সাধ্যমত যাহা-কিছু আয়োজন করিয়াছিলাম সব জলে ভাসিয়া গেছে।"

দ্রব্যসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে কতক-বা ভগ্নপ্রায় পাকশালায় গলিয়া গুলিয়া উনান নিবিয়া একাকার হইয়া গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে বুড়াশিবতলা এমন গ্রামই নহে।

গৌরসুন্দর যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতিতে খুশি হইলেন। কহিলেন, "এতগুলা মানুষকে তো অনাহারে রাখা যায় না, কিছু তো উপায় করিতে হইবে।"

বরযাত্রগণ খেপিয়া উঠিয়া মহা হাঙ্গামা করিতে লাগিল। কহিল, "আমরা স্টেশনে গিয়া ট্রেন ধরিয়া এখনই বাড়ি ফিরিয়া যাই।"

যজ্ঞেশ্বর হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "একেবারে উপবাস নয়। শিবতলার ছানা বিখ্যাত। উপযুক্ত পরিমাণে ছানা কদমা সংগ্রহ আছে। আমার অন্তরের মধ্যে যাহা হইতেছে তাহা অন্তর্যামীই জানেন।"

যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতি দেখিয়া বাথানপাড়ার গোয়ালারা বলিয়াছিল, "ভয় কী ঠাকুর, ছানা যিনি যত খাইতে পারেন আমরা জোগাইয়া দিব।" বিদেশের বরযাত্রীগণ না খাইয়া ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান ; সেই অপমান ঠেকাইবার জন্য গোয়ালারা প্রচুর ছানার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

বরযাত্রগণ পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যত আবশ্যক ছানা জোগাইতে পারিবে তো?"

যজ্ঞেশ্বর কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিল, "তা পারিব।" "আচ্ছা, তবে আনো" বলিয়া বরযাত্রগণ বসিয়া গেল। গৌরসুন্দর বসিলেন না, তিনি নীরবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

আহারস্থানের চারি দিকেই পুষ্করিণী ভরিয়া উঠিয়া জলে কাদায় একাকার হইয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন-যেমন পাতে ছানা দিয়া যাইতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ বরযাত্রগণ তাহা কাঁধ ডিঙাইয়া পশ্চাতে কাদার মধ্যে টপ্‌টপ্ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহীন যজ্ঞেশ্বরের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বারম্বার সকলের কাছে জোড়হাত করিতে লাগিলেন ; কহিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের নির্যাতনের যোগ্য নই।"

একজন শুষ্কহাস্য হাসিয়া উত্তর করিল, "মেয়ের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায়।" যজ্ঞেশ্বরের স্বগ্রামের বৃদ্ধগণ বারবার ধিক্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার যেমন অবস্থা সেইমত ঘরে কন্যাদান করিলেই এ দুর্গতি ঘটিত না।"

এ দিকে অন্তঃপুরে মেয়ের দিদিমা অকল্যাণশঙ্কাসত্ত্বেও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন, "ভাই, অপরাধ যা হইবার তা তো হইয়া গেছে, এখন মাপ করো, আজিকার মতো শুভকর্ম সম্পন্ন হইতে দাও।"

এ দিকে ছানার অন্যায় অপব্যয় দেখিয়া গোয়ালার দল রাগিয়া হাঙ্গামা করিতে উদ্যত। পাছে বরযাত্রদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশঙ্কায় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত। বরযাত্ররা ভাবিল, বর বুঝি রাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন ; তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, আমাদের এ কীরকম ব্যবহার।" বলিয়া একটা ছানার থালা স্বহস্তে লইয়া তিনি পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোয়ালাদিগকে বলিলেন, "তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও, কাহারও ছানা যদি পাঁকে পড়ে তো সেগুলা আবার পাতে তুলিয়া দিতে হইবে।"

গৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া দুই-একজন উঠিবে কি না ইতস্তত করিতেছিল— বিভূতি কহিলেন, "বাবা, তুমিও বসিয়া যাও, অনেক রাত হইয়াছে।"

গৌরসুন্দর বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পৌঁছিতে লাগিল।

উলুখড়ের বিপদ

বাবুদের নায়েব গিরিশ বসুর অন্তঃপুরে প্যারী বলিয়া একটি নূতন দাসী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার বয়স অল্প ; চরিত্র ভালো। দূর বিদেশ হইতে আসিয়া কিছুদিন কাজ করার পরেই একদিন সে বৃদ্ধ নায়েবের অনুরাগদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহিণীর নিকট কাঁদিয়া গিয়া পড়িল। গৃহিণী কহিলেন, "বাছা, তুমি অন্য কোথাও যাও ; তুমি ভালোমানুষের মেয়ে, এখানে থাকিলে তোমার সুবিধা হইবে না।" বলিয়া গোপনে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

কিন্তু পালানো সহজ ব্যাপার নহে, হাতে পথখরচও সামান্য, সেইজন্য প্যারী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্যমহাশয়ের নিকট গিয়া আশ্রয় লইল। বিবেচক ছেলেরা কহিল, "বাবা, কেন বিপদ ঘরে আনিতেছেন।" হরিহর কহিলেন, "বিপদ স্বয়ং আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না।"

গিরিশ বসু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, "ভট্টাচার্যমহাশয়, আপনি আমার ঝি ভাঙাইয়া আনিলেন কেন। ঘরে কাজের ভারি অসুবিধা হইতেছে।" ইহার উত্তরে হরিহর দু-চারটে সত্য কথা খুব শক্ত করিয়াই বলিলেন। তিনি মানী লোক ছিলেন, কাহারও খাতিরে কোনো কথা ঘুরাইয়া বলিতে জানিতেন না। নায়েব মনে মনে উদ্গতপক্ষ পিপীলিকার সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় খুব ঘটা করিয়া পায়ের ধুলা লইল। দুই-চারিদিনের মধ্যেই ভট্টাচার্যের বাড়িতে পুলিসের সমাগম হইল। গৃহিণীঠাকুরানীর বালিশের নীচে হইতে নায়েবের স্ত্রীর একজোড়া ইয়ারিং বাহির হইল। ঝি প্যারী চোর সাব্যস্ত হইয়া জেলে গেল। ভট্টাচার্যমহাশয় দেশবিখ্যাত প্রতিপত্তির জোরে চোরাই-মাল-রক্ষার অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। নায়েব পুনশ্চ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, হতভাগিনীকে তিনি আশ্রয় দেওয়াতেই প্যারীর সর্বনাশ ঘটিল। তাঁহার মনে শেল বিঁধিয়া রহিল। ছেলেরা কহিল, "জমিজমা বেচিয়া কলিকাতায় যাওয়া যাক, এখানে বড়ো মুশকিল দেখিতেছি।" হরিহর কহিলেন, "পৈতৃক ভিটা ছাড়িতে পারিব না ; অদৃষ্টে থাকিলে বিপদ কোথায় না ঘটে।"

ইতিমধ্যে নায়েব গ্রামে অতিমাত্রায় খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইল। হরিহরের সমস্ত ব্রহ্মোত্তর জমা, জমিদারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই। নায়েব তাহার প্রভুকে জানাইল, হরিহরই প্রজাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার কহিলেন, "যেমন করিয়া পার ভট্টাচার্যকে শাসন করো।" নায়েব ভট্টাচার্যের পদধূলি লইয়া কহিল, "সামনের ঐ জমিটা পরগনার ভিটার মধ্যে পড়িতেছে ; ওটা তো ছাড়িয়া দিতে হয়।" হরিহর কহিলেন, "সে কী কথা। ও যে আমার বহুকালের ব্রহ্মত্র।" হরিহরের গৃহপ্রাঙ্গণের সংলগ্ন পৈতৃক জমি জমিদারের পরগনার অন্তর্গত বলিয়া নালিশ রুজু হইল। হরিহর বলিলেন, "এ জমিটা তো তবে ছাড়িয়া দিতে হয়, আমি তো বৃদ্ধ বয়সে আদালতে সাক্ষি দিতে পারিব না।" ছেলেরা বলিল, "বাড়ির সংলগ্ন জমিটাই যদি ছাড়িয়া দিতে হয় তবে ভিটায় টিঁকিব কী করিয়া।"

প্রাণাধিক পৈতৃক ভিটার মায়ায় বৃদ্ধ কম্পিতপদে আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে গিয়া

দাঁড়াইলেন। মুন্সেফ নবগোপালবাবু তাঁহার সাক্ষ্যই প্রামাণ্য করিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দিলেন। ভট্টাচার্যের খাস প্রজারা ইহা লইয়া গ্রামে ভারি উৎসব সমারোহ আরম্ভ করিয়া দিল। হরিহর তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন। নায়েব আসিয়া পরম আড়ম্বরে ভট্টাচার্যের পদধূলি লইয়া গায়ে মাথায় মাখিল এবং আপিল রুজু করিল। উকিলরা হরিহরের নিকট হইতে টাকা লন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বারম্বার আশ্বাস দিলেন, এ মকদ্দমায় হারিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। দিন কি কখনও রাত হইতে পারে। শুনিয়া হরিহর নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন।

একদিন জমিদারি কাছারিতে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল, পাঁঠা কাটিয়া নায়েবের বাসায় কালীপূজা হইবে। ব্যাপারখানা কী। ভট্টাচার্য খবর পাইলেন, আপিলে তাঁহার হার হইয়াছে।

ভট্টাচার্য মাথা চাপড়াইয়া উকিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসন্তবাবু, করিলেন কী। আমার কী দশা হইবে।"

দিন যে কেমন করিয়া রাত হইল বসন্তবাবু তাহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত বলিলেন, "সম্প্রতি যিনি নূতন অ্যাডিশনাল জজ হইয়া আসিয়াছেন তিনি মুন্সেফ থাকা কালে মুন্সেফ নবগোপালবাবুর সহিত তাঁহার ভারি খিটিমিটি বাধিয়াছিল। তখন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপালবাবুর রায় পাইবামাত্র উলটাইয়া দিতেছেন; আপনি হারিলেন সেইজন্য।" ব্যাকুল হরিহর কহিলেন, "হাইকোর্টে ইহার কোনো আপিল নাই?" বসন্ত কহিলেন, "জজবাবু আপিলে ফল পাইবার সম্ভাবনামাত্র রাখেন নাই। তিনি আপনাদের সাক্ষীকে সন্দেহ করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন; হাইকোর্টে তো সাক্ষীর বিচার হইবে না।"

বৃদ্ধ সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, "তবে আমার উপায়?"

উকিল কহিলেন, "উপায় কিছুই দেখি না।"

গিরিশ বসু পরদিন লোকজন সঙ্গে লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল এবং বিদায়কালে উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসে কহিল, "প্রভু, তোমারই ইচ্ছা।"

প্রতিবেশিনী

আমার প্রতিবেশিনী বালবিধবা। যেন শরতের শিশিরাপ্লুত শেফালির মতো বৃন্তচ্যুত ; কোনো বাসরগৃহের ফুলশয্যার জন্য সে নহে, সে কেবল দেবপূজার জন্যই উৎসর্গ-করা।

তাহাকে আমি মনে মনে পূজা করিতাম। তাহার প্রতি আমার মনের ভাবটা যে কী ছিল পূজা ছাড়া তাহা অন্য কোনো সহজ ভাষায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না— পরের কাছে তো নয়ই, নিজের কাছেও না।

আমার অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু নবীনমাধব, সেও কিছু জানিত না। এইরূপে এই-যে আমার গভীরতম আবেগটিকে গোপন করিয়া নির্মল করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহাতে আমি কিছু গর্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু মনের বেগ পার্বতী নদীর মতো নিজের জন্মশিখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। কোনো-একটা উপায়ে বাহির হইবার চেষ্টা করে। অকৃতকার্য হইলে বক্ষের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই ভাবিতেছিলাম, কবিতায় ভাব প্রকাশ করিব। কিন্তু কুণ্ঠিতা লেখনী কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না।

পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়েই আমার বন্ধু নবীনমাধবের অকস্মাৎ বিপুল বেগে কবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল, যেন হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো।

সে বেচারার এরূপ দৈববিপত্তি পূর্বে কখনও হয় নাই, সুতরাং সে এই অভিনব আন্দোলনের জন্য লেশমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তাহার হাতের কাছে ছন্দ মিল কিছুরই জোগাড় ছিল না, তবু সে দমিল না দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কবিতা যেন বৃদ্ধ বয়সের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মতো তাহাকে পাইয়া বসিল। নবীনমাধব ছন্দ মিল সম্বন্ধে সহায়তা ও সংশোধনের জন্য আমার শরণাপন্ন হইল।

কবিতার বিষয়গুলি নূতন নহে ; অথচ পুরাতনও নহে। অর্থাৎ তাহাকে চিরনূতনও বলা যায়, চিরপুরাতন বলিলেও চলে। প্রেমের কবিতা, প্রিয়তমার প্রতি। আমি তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে হে, ইনি কে।"

নবীন হাসিয়া কহিল, "এখনও সন্ধান পাই নাই।"

নবীন রচয়িতার সহায়তাকার্যে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম। নবীনের কাল্পনিক প্রিয়তমার প্রতি আমার রুদ্ধ আবেগ প্রয়োগ করিলাম। শাবকহীন মুরগি যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীনমাধবের ভাবের উপরে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। আনাড়ির লেখা এমনি প্রবল বেগে সংশোধন করিতে লাগিলাম যে, প্রায় পনেরো-আনা আমারই লেখা দাঁড়াইল।

নবীন বিস্মিত হইয়া বলে, "ঠিক এই কথাই আমি বলিতে চাই, কিন্তু বলিতে পারি না। অথচ তোমার এ-সব ভাব জোগায় কোথা হইতে।"

আমি কবির মতো উত্তর করি, "কল্পনা হইতে। কারণ, সত্য নীরব, কল্পনাই মুখরা। সত্য ঘটনা ভাবস্রোতকে পাথরের মতো চাপিয়া থাকে, কল্পনাই তাহার পথ মুক্ত করিয়া দেয়।"

নবীন গম্ভীর মুখে একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "তাই তো দেখিতেছি। ঠিক বটে।" আবার খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "ঠিক, ঠিক।"

পূর্বেই বলিয়াছি আমার ভালোবাসার মধ্যে একটি কাতর সংকোচ ছিল, তাই নিজের জবানিতে কোনোমতে লিখিতে পারিলাম না। নবীনকে পর্দার মতো মাঝখানে রাখিয়া তবেই আমার লেখনী মুখ খুলিতে পারিল। লেখাগুলো যেন রসে ভরিয়া উত্তাপে ফাটিয়া উঠিতে লাগিল।

নবীন বলিল, "এ তো তোমারই লেখা। তোমারই নামে বাহির করি।"

আমি কহিলাম, "বিলক্ষণ। এ তোমারই লেখা, আমি সামান্য একটু বদল করিয়াছি মাত্র।"

ক্রমে নবীনেরও সেইরূপ ধারণা জন্মিল।

জ্যোতির্বিদ্ যেমন নক্ষত্রোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম, সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না। মাঝে মাঝে ভক্তের সেই ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ সার্থকও হইত। সেই কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্য মুখশ্রী হইতে শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন সহসা এ কী দেখিলাম। আমার চন্দ্রলোকেও কি এখনও অগ্ন্যুৎপাত আছে। সেখানকার জনশূন্য সমাধিমগ্ন গিরিগুহার সমস্ত বহ্নিদাহ এখনও সম্পূর্ণ নির্বাণ হইযা যায় নাই কি।

সেদিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে ঈশান কোণে মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই আসন্ন ঝঞ্ঝার মেঘবিচ্ছুরিত রুদ্রদীপ্তিতে আমার প্রতিবেশিনী জানালায় একাকিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সেদিন তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে কী সুদূরপ্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।

আছে, আমার ঐ চন্দ্রলোকে এখনও উত্তাপ আছে! এখনও সেখানে উষ্ণ নিশ্বাস সমীরিত। দেবতার জন্য মানুষ নহে, মানুষের জন্যই সে। তাহার সেই দুটি চক্ষুর বিশাল ব্যাকুলতা সেদিনকার সেই ঝড়ের আলোকে ব্যগ্র পাখির মতো উড়িয়া চলিয়াছিল। স্বর্গের দিকে নহে, মানবহৃদয়নীড়ের দিকে।

সেই উৎসুক আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপ্ত দৃষ্টিপাতটি দেখার পর হইতে অশান্ত চিত্তকে সুস্থির করিয়া রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। তখন কেবল পরের কাঁচা কবিতা সংশোধন করিয়া তৃপ্তি হয় না—একটা যে-কোনোপ্রকার কাজ করিবার জন্য চঞ্চলতা জন্মিল।

তখন সংকল্প করিলাম, বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আমার সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিব। কেবল বক্তৃতা ও লেখা নহে, অর্থসাহায্য করিতেও অগ্রসর হইলাম।

নবীন আমার সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিল ; সে বলিল, "চিরবৈধব্যের মধ্যে একটি পবিত্র শান্তি আছে, একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো একটি বিরাট রমণীয়তা আছে ; বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙিয়া যায় না।"

এ-সব কবিত্বের কথা শুনিলেই আমার রাগ হইত। দুর্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক যদি খাদ্যের স্থূলত্বের প্রতি ঘৃণা

প্রকাশ করিয়া ফুলের গন্ধ এবং পাখির গান দিয়া মুমূর্ষুর পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়।

আমি রাগিয়া কহিলাম, "দেখো নবীন, আর্টিস্ট্ লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির একটা সৌন্দর্য আছে। কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখিলে চলে না, তাহাতে বাস করিতে হয়, অতএব আর্টিস্ট্ যাহাই বলুন, মেরামত আবশ্যক। বৈধব্য লইয়া তুমি তো দূর হইতে দিব্য কবিত্ব করিতে চাও, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানবহৃদয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে, সেটা স্মরণ রাখা কর্তব্য।"

মনে করিয়াছিলাম, নবীনমাধবকে কোনোমতেই দলে টানিতে পারিব না, সেদিন সেইজন্যই কিছু অতিরিক্ত উষ্মার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, আমার বক্তৃতা-অবসানে নবীনমাধব একটিমাত্র গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার সমস্ত কথা মানিয়া লইল ; বাকি আরও অনেক ভালো ভালো কথা বলিবার অবকাশই দিল না।

সপ্তাহখানেক পরে নবীন আসিয়া কহিল, "তুমি যদি সাহায্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।"

এমনি খুশি হইলাম—নবীনকে বুকে টানিয়া কোলাকুলি করিলাম ; কহিলাম ; "যত টাকা লাগে আমি দিব।"

তখন নবীন তাহার ইতিহাস বলিল।

বুঝিলাম, তাহার প্রিয়তমা কাল্পনিক নহে। কিছুকাল ধরিয়া একটি বিধবা নারীকে সে দূর হইতে ভালোবাসিত, কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। যে মাসিক পত্রে নবীনের, ওরফে আমার, কবিতা বাহির হইত সেই পত্রগুলি যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিত। কবিতাগুলি ব্যর্থ হয় নাই। বিনা সাক্ষাৎকারে চিত্ত-আকর্ষণের এই এক উপায় আমার বন্ধু বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নবীন বলেন, তিনি চক্রান্ত করিয়া এই-সকল কৌশল অবলম্বন করেন নাই। এমন-কি, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিধবা পড়িতে জানেন না। বিধবার ভাইয়ের নামে কাগজগুলি বিনা স্বাক্ষরে বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিতেন। এ কেবল মনকে সান্ত্বনা দিবার একটা পাগলামিমাত্র। মনে হইত, দেবতার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দান করা গেল, তিনি জানুন বা না জানুন, গ্রহণ করুন বা নাই করুন।

নানা ছুতায় বিধবার ভাইয়ের সহিত নবীন যে বন্ধুত্ব করিয়া লইয়াছিলেন, নবীন বলেন, তাহারও মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাকে ভালোবাসা যায় তাহার নিকটবর্তী আত্মীয়ের সঙ্গ মধুর বোধ হয়।

অবশেষে ভাইয়ের কঠিন পীড়া উপলক্ষে ভগিনীর সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ হয় সে সুদীর্ঘ কথা। কবির সহিত কবিতার অবলম্বিত বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়া কবিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। আলোচনা যে কেবল ছাপানো কবিতা-কয়টির মধ্যেই বদ্ধ ছিল তাহাও নহে।

সম্প্রতি আমার সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া নবীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছে। প্রথমে কিছুতেই সম্মতি পায় নাই। নবীন তখন আমার মুখের সমস্ত যুক্তিগুলি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের

চোখের দুই-চার ফোঁটা জল মিশাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে। এখন বিধবার অভিভাবক পিসে কিছু টাকা চায়।

আমি বলিলাম, "এখনই লও।"

নবীন বলিল, "তাহা ছাড়া বিবাহের পর প্রথম মাস পাঁচ-ছয় বাবা নিশ্চয় আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন, তখনকার মতো উভয়ের খরচ চালাইবার জোগাড় করিয়া দিতে হইবে।"

আমি কথাটি না কহিয়া চেক লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, "এখন তাঁহার নামটি বলো। আমার সঙ্গে যখন কোনো প্রতিযোগিতা নাই তখন পরিচয় দিতে ভয় করিয়ো না। তোমার গা ছুঁইয়া শপথ করিতেছি, আমি তাঁহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং যদি লিখি তাঁহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব।"

নবীন কহিল, "আরে, সেজন্য আমি ভয় করি না। বিধবাবিবাহের লজ্জায় তিনি অত্যন্ত কাতর, তাই তোমাদের কাছে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর ঢাকিয়া রাখা মিথ্যা। তিনি তোমারই প্রতিবেশিনী, ১৯ নম্বরে থাকেন।"

হৃৎপিণ্ডটা যদি লোহার বয়লার হইত তো এক চমকে ধক্ করিয়া ফাটিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিধবাবিবাহে তাঁহার অমত নাই?"

নবীন হাসিয়া কহিল, "সম্প্রতি তো নাই।"

আমি কহিলাম, "কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মুগ্ধ?"

নবীন কহিল, "কেন, আমার সেই কবিতাগুলি তো মন্দ হয় নাই।"

আমি মনে মনে কহিলাম, 'ধিক্।'

ধিক্ কাহাকে।

তাঁহাকে, না আমাকে, না বিধাতাকে?

কিন্তু ধিক্।

নষ্টনীড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূপতির কাজ করিবার কোনো দরকার ছিল না। তাঁহার টাকা যথেষ্ট ছিল, এবং দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশত তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করিতে হইল। ইহার পরে সময়ের দীর্ঘতার জন্য তাঁহাকে আর বিলাপ করিতে হয় নাই।

ছেলেবেলা হইতে তাঁর ইংরাজি লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার শখ ছিল। কোনো-প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইংরাজি খবরের কাগজে তিনি চিঠি লিখিতেন, এবং বক্তব্য না থাকিলেও সভাস্থলে দু কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না।

তাঁহার মতো ধনী লোককে দলে পাইবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিরা অজস্র স্তুতিবাদ করাতে নিজের ইংরাজি রচনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে তাঁহার উকিল শ্যালক উমাপতি ওকালতি-ব্যবসায়ে হতোদ্যম হইয়া ভগিনীপতিকে কহিল, "ভূপতি, তুমি একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করো। তোমার যেরকম অসাধারণ" ইত্যাদি।

ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরের কাগজে পত্র প্রকাশ করিয়া গৌরব নাই, নিজের কাগজে স্বাধীন কলমটাকে পুরাদমে ছুটাইতে পারিবে। শ্যালককে সহকারী করিয়া নিতান্ত অল্পবয়সেই ভূপতি সম্পাদকের গদিতে আরোহণ করিল।

অল্পবয়সে সম্পাদকি নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা অত্যন্ত জোর করিয়া ধরে। ভূপতিকে মাতাইয়া তুলিবার লোকও ছিল অনেক।

এইরূপে সে যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল ততদিনে তাঁহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না। ভারত-গবর্মেন্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংযমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষের বিষয় ছিল।

ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিন-রাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।

এমন অবস্থায় সুযোগ পাইলে বধূ স্বামীকে লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে, দাম্পত্যলীলার সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চারুলতার সে সুযোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল।

যুবতী স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কোনো আত্মীয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলে ভূপতি একবার সচেতন হইয়া কহিল, "তাই তো, চারুর একজন কেউ সঙ্গিনী থাকা উচিত, ও বেচারার কিছুই করিবার নাই।"

শ্যালক উমাপতিকে কহিল, "তোমার স্ত্রীকে আমাদের এখানে আনিয়া রাখো-না —সমবয়সি স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই, চারুর নিশ্চয়ই ভারি ফাঁকা ঠেকে।"

স্ত্রীসঙ্গের অভাবই চারুর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ, সম্পাদক এইরূপ বুঝিল এবং শ্যালকজায়া মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

যে সময়ে স্বামী স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যূষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।

লেখাপড়ার দিকে চারুলতার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগুলো অত্যন্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই। সে নিজের চেষ্টায় নানা কৌশলে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ভূপতির পিস্‌তুত ভাই অমল থার্ড্ ইয়ারে পড়িতেছিল, চারুলতা তাহাকে ধরিয়া পড়া করিয়া লইত; এই কর্মটুকু আদায় করিয়া লইবার জন্য অমলের অনেক আবদার তাহাকে সহ্য করিতে হইত। তাহাকে প্রায়ই হোটেলে খাইবার খোরাকি এবং ইংরাজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা জোগাইতে হইত। অমল মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, সেই যজ্ঞ-সমাধার ভার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ চারুলতা নিজে গ্রহণ করিত। ভূপতি চারুলতার প্রতি কোনো দাবি করিত না, কিন্তু সামান্য একটু পড়াইয়া পিস্‌তুত ভাই অমলের দাবির অন্ত ছিল না। তাহা লইয়া চারুলতা প্রায় মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ এবং বিদ্রোহ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোনো-একটা লোকের কোনো কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

অমল কহিল, "বৌঠান, আমাদের কালেজের রাজবাড়ির জামাইবাবু রাজ-অন্তঃপুরের খাস হাতের বুনানি কার্পেটের জুতো পরে আসে, আমার তো সহ্য হয় না—একজোড়া কার্পেটের জুতো চাই, নইলে কোনোমতেই পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারছি না।"

চারু। হাঁ, তাই বই-কি। আমি বসে বসে তোমার জুতো সেলাই করে মরি। দাম দিচ্ছি, বাজার থেকে কিনে আনো গে যাও।

অমল বলিল, "সেটি হচ্ছে না।"

চারু জুতা সেলাই করিতে জানে না, এবং অমলের কাছে সে কথা স্বীকার করিতেও চাহে না। কিন্তু তাহার কাছে কেহ কিছু চায় না, অমল চায়—সংসারে সেই একমাত্র প্রার্থীর প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অমল যে সময় কালেজে যাইত সেই সময়ে সে লুকাইয়া বহু যত্নে কার্পেটের সেলাই শিখিতে লাগিল। এবং অমল নিজে যখন তাহার জুতার দরবার সম্পূর্ণ ভুলিয়া বসিয়াছে এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলায় চারু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল।

গ্রীষ্মের সময় ছাদের উপর আসন করিয়া অমলের আহারের জায়গা করা হইয়াছে। বালি উড়িয়া পড়িবার ভয়ে পিতলের ঢাকনায় থালা ঢাকা রহিয়াছে। অমল কালেজের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুখ ধুইয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমল আসনে বসিয়া ঢাকা খুলিল; দেখিল, থালায় একজোড়া নূতন-বাঁধানো পশমের জুতা সাজানো রহিয়াছে। চারুলতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

জুতা পাইয়া অমলের আশা আরও বাড়িয়া উঠিল। এখন গলাবন্ধ চাই, রেশমের রুমালে ফুলকাটা পাড় সেলাই করিয়া দিতে হইবে, তাহার বাহিরের ঘরে বসিবার বড়ো কেদারায় তেলের দাগ নিবারণের জন্য একটা কাজ-করা আবরণ আবশ্যক।

প্রত্যেক বারেই চারুলতা আপত্তি প্রকাশ করিয়া কলহ করে এবং প্রত্যেক বারেই বহু যত্নে ও স্নেহে শৌখিন অমলের শখ মিটাইয়া দেয়। অমল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, "বউঠান, কতদূর হইল।"

চারুলতা মিথ্যা করিয়া বলে, "কিছুই হয় নি।" কখনও বলে, "সে আমার মনেই ছিল না।"

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাত্র নয়। প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া দেয় এবং আবদার করে। নাছোড়বান্দা অমলের সেই-সকল উপদ্রব উদ্রেক করাইয়া দিবার জন্যই চারু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া বিরোধের সৃষ্টি করে এবং হঠাৎ একদিন তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া দিয়া কৌতুক দেখে।

ধনীর সংসারে চারুকে আর কাহারও জন্য কিছুই করিতে হয় না, কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই-সকল ছোটোখাটো শখের খাটুনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।

ভূপতির অন্তঃপুরে যে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যুক্তি করা হয়। সেই বাগানের প্রধান বনস্পতি ছিল একটা বিলাতি আমড়াগাছ।

এই ভূখণ্ডের উন্নতিসাধনের জন্য চারু এবং অমলের মধ্যে একটা কমিটি বসিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া কিছুদিন হইতে ছবি আঁকিয়া, প্ল্যান করিয়া, মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে একটা বাগানের কল্পনা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

অমল বলিল, "বউঠান, আমাদের এই বাগানে সে কালের রাজকন্যার মতো তোমাকে নিজের হাতে গাছে জল দিতে হবে।"

চারু কহিল, "আর ঐ পশ্চিমের কোণটাতে একটা কুঁড়ে তৈরি করে নিতে হবে, হরিণের বাচ্ছা থাকবে।"

অমল কহিল, "আর একটি ছোটোখাটো ঝিলের মতো করতে হবে, তাতে হাঁস চরবে।"

চারু সে প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আর তাতে নীলপদ্ম দেব, আমার অনেক দিন থেকে নীলপদ্ম দেখবার সাধ আছে।"

অমল কহিল, "সেই ঝিলের উপর একটি সাঁকো বেঁধে দেওয়া যাবে, আর ঘাটে একটি বেশ ছোটো ডিঙি থাকবে।"

চারু কহিল, "ঘাট অবশ্য সাদা মার্বেলের হবে।"

অমল পেনসিল কাগজ লইয়া, রুল কাটিয়া, কম্পাস ধরিয়া, মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।

উভয়ে মিলিয়া দিনে দিনে কল্পনার সংশোধন পরিবর্তন করিতে করিতে বিশ-পঁচিশখানা নূতন ম্যাপ আঁকা হইল।

ম্যাপ খাড়া হইলে কত খরচ হইতে পারে তাহার একটা এস্‌টিমেট তৈরি হইতে লাগিল। প্রথমে সংকল্প ছিল—চারু নিজের বরাদ্দ মাসহারা হইতে ক্রমে ক্রমে বাগান

তৈরি করিয়া তুলিবে; ভূপতি তো বাড়িতে কোথায় কী হইতেছে তাহা চাহিয়া দেখে না; বাগান তৈরি হইলে তাহাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য করিয়া দিবে; সে মনে করিবে, আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে জাপান দেশ হইতে একটা আস্ত বাগান তুলিয়া আনা হইয়াছে।

কিন্তু এস্‌টিমেট যথেষ্ট কম করিয়া ধরিলেও চারুর সংগতিতে কুলায় না। অমল তখন পুনরায় ম্যাপ পরিবর্তন করিতে বসিল। কহিল, "তা হলে বউঠান, ঐ ঝিলটা বাদ দেওয়া যাক।"

চারু কহিল, "না না, ঝিল বাদ দিলে কিছুতেই চলবে না, ওতে আমার নীলপদ্ম থাকবে।"

অমল কহিল, "তোমার হরিণের ঘরে টালির ছাদ নাই দিলে। ওটা অমনি একটা সাদাসিধে খোড়ো চাল করলেই হবে।"

চারু অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল, "তা হলে আমার ও ঘরে দরকার নেই— ও থাক্‌।"

মরিশস হইতে লবঙ্গ, কর্নাট হইতে চন্দন, এবং সিংহল হইতে দারচিনির চারা আনাইবার প্রস্তাব ছিল, অমল তাহার পরিবর্তে মানিকতলা হইতে সাধারণ দিশি ও বিলাতি গাছের নাম করিতেই চারু মুখ ভার করিয়া বসিল; কহিল, "তা হলে আমার বাগানে কাজ নেই।"

এস্‌টিমেট কমাইবার এরূপ প্রথা নয়। এস্‌টিমেটের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে খর্ব করা চারুর পক্ষে অসাধ্য, এবং অমল মুখে যাহাই বলুক, মনে মনে তাহারও সেটা রুচিকর নয়।

অমল কহিল, "তবে বউঠান, তুমি দাদার কাছে বাগানের কথাটা পাড়ো; তিনি নিশ্চয় টাকা দেবেন।"

চারু কহিল, "না, তাঁকে বললে মজা কী হল। আমরা দুজনে বাগান তৈরি ক'রে তুলব। তিনি তো সাহেব-বাড়িতে ফরমাস দিয়ে ইডেন গার্ডেন বানিয়ে দিতে পারেন— তা হলে আমাদের প্ল্যানের কী হবে।"

আমড়াগাছের ছায়ায় বসিয়া চারু এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কল্পনাসুখ বিস্তার করিতেছিল। চারুর ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিয়া কহিল, "এত বেলায় বাগানে তোরা কী করছিস।"

চারু কহিল, "পাকা আমড়া খুঁজছি।"

লুব্ধা মন্দা কহিল, "পাস যদি আমার জন্যে আনিস।"

চারু হাসিল, অমল হাসিল। তাহাদের সমস্ত সংকল্পগুলির প্রধান সুখ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগুলি তাহাদের দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ। মন্দার আর যা-কিছু গুণ থাক্‌, কল্পনা ছিল না; সে এ-সকল প্রস্তাবের রস গ্রহণ করিবে কী করিয়া। সে এই দুই সভ্যের সকলপ্রকার কমিটি হইতে একেবারে বর্জিত।

অসাধ্য বাগানের এস্‌টিমেটও কমিল না, কল্পনাও কোনো অংশে হার মানিতে চাহিল না। সুতরাং আমড়াতলার কমিটি এইভাবেই কিছুদিন চলিল। বাগানের যেখানে ঝিল হইবে, যেখানে হরিণের ঘর হইবে, যেখানে পাথরের বেদি হইবে, অমল সেখানে চিহ্ন কাটিয়া রাখিল।

তাহাদের সংকল্পিত বাগানে এই আমড়াতলার চার দিক কীভাবে বাঁধাইতে হইবে অমল একটি ছোটো কোদাল লইয়া তাহারই দাগ কাটিতেছিল— এমন সময় চারু গাছের ছায়ায় বসিয়া বলিল, "অমল, তুমি যদি লিখতে পারতে তা হলে বেশ হত।"

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বেশ হত।"

চারু। তা হলে আমাদের এই বাগানের বর্ণনা করে তোমাকে দিয়ে একটা গল্প লেখাতুম। এই ঝিল, এই হরিণের ঘর, এই আমড়াতলা, সমস্তই তাতে থাকত— আমরা দুজনে ছাড়া কেউ বুঝতে পারত না, বেশ মজা হত। অমল, তুমি একবার লেখবার চেষ্টা করে দেখো-না, নিশ্চয় তুমি পারবে।

অমল কহিল, "আচ্ছা, যদি লিখতে পারি তো আমাকে কী দেবে।"

চারু কহিল, "তুমি কী চাও।"

অমল কহিল, "অমার মশারির চালে আমি নিজে লতা এঁকে দেব, সেইটে তোমাকে আগাগোড়া রেশম দিয়ে কাজ করে দিতে হবে।"

চারু কহিল, "তোমার সমস্ত বাড়াবাড়ি। মশারির চালে আবার কাজ!"

মশারি জিনিসটাকে একটা শ্রীহীন কারাগারের মতো করিয়া রাখার বিরুদ্ধে অমল অনেক কথা বলিল। সে কহিল, সংসারের পনেরো-আনা লোকের যে সৌন্দর্যবোধ নাই এবং কুশ্রীতা তাহাদের কাছে কিছুমাত্র পীড়াকর নহে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

চারু সে কথা তৎক্ষণাৎ মনে মনে মানিয়া লইল এবং 'আমাদের এই দুটি লোকের নিভৃত কমিটি যে সেই পনেরো-আনার অন্তর্গত নহে' ইহা মনে করিয়া সে খুশি হইল।

কহিল, "আচ্ছা বেশ, আমি মশারির চাল তৈরি করে দেব, তুমি লেখো।"

অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল, "তুমি মনে কর, আমি লিখতে পারি নে?"

চারু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তবে নিশ্চয় তুমি কিছু লিখেছ, আমাকে দেখাও।"

অমল। আজ থাক্, বউঠান।

চারু। না, আজই দেখাতে হবে— মাথা খাও, তোমার লেখা নিয়ে এসো গে।

চারুকে তাহার লেখা শোনাইবার অতিব্যগ্রতাতেই অমলকে এতদিন বাধা দিতেছিল। পাছে চারু না বোঝে, পাছে তাহার ভালো না লাগে, এ সংকোচ সে তাড়াইতে পারিতেছিল না।

আজ খাতা আনিয়া একটুখানি লাল হইয়া, একটুখানি কাশিয়া, পড়িতে আরম্ভ করিল। চারু গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

প্রবন্ধের বিষয়টা ছিল 'আমার খাতা'। অমল লিখিয়াছিল— 'হে আমার শুভ্র খাতা, আমার কল্পনা এখনও তোমাকে স্পর্শ করে নাই। সূতিকাগৃহে ভাগ্যপুরুষ প্রবেশ করিবার পূর্বে শিশুর ললাটপট্টের ন্যায় তুমি নির্মল, তুমি রহস্যময়। যেদিন তোমার শেষ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে উপসংহার লিখিয়া দিব সেদিন আজ কোথায়। তোমার এই শুভ্র শিশুপত্রগুলি সেই চিরদিনের জন্য মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা আজ স্বপ্নেও কল্পনা করিতেছে না।'— ইত্যাদি অনেকখানি লিখিয়াছিল।

চারু তরুচ্ছায়ায় বসিয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি আবার লিখতে পার না!"

সেদিন সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল; সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহ্নের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।

চারু বলিল, "অমল, গোটাকতক আমড়া পেড়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে মন্দাকে কী হিসেব দেব।"

মূঢ় মন্দাকে তাহাদের পড়াশুনা এবং আলোচনার কথা বলিতে প্রবৃত্তিই হয় না, সুতরাং আমড়া পাড়িয়া লইয়া যাইতে হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাগানের সংকল্প তাহাদের অন্যান্য অনেক সংকল্পের ন্যায় সীমাহীন কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে কখন হারাইয়া গেল তাহা অমল এবং চারু লক্ষও করিতে পারিল না।

এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল। অমল আসিয়া বলে, "বোঠান, একটা বেশ চমৎকার ভাব মাথায় এসেছে।"

চারু উৎসাহিত হইয়া উঠে; বলে, "চলো, আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়—এখানে এখনই মন্দা পান সাজতে আসবে।"

চারু কাশ্মীরি বারান্দায় একটি জীর্ণ বেতের কেদারায় আসিয়া বসে এবং অমল রেলিঙের নিচেকার উচ্চ অংশের উপর বসিয়া পা ছড়াইয়া দেয়।

অমলের লিখিবার বিষয়গুলি প্রায়ই সুনির্দিষ্ট নহে; তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা শক্ত। গোলমাল করিয়া সে যাহা বলিত তাহা স্পষ্ট বুঝা কাহারও সাধ্য নহে। অমল নিজেই বার বার বলিত, "বোঠান, তোমাকে ভালো বোঝাতে পারছি নে।"

চারু বলিত, "না, আমি অনেকটা বুঝতে পেরেছি; তুমি এইটে লিখে ফেলো, দেরি কোরো না।"

সে খানিকটা বুঝিয়া, খানিকটা না বুঝিয়া, অনেকটা কল্পনা করিয়া, অনেকটা অমলের ব্যক্ত করিবার আবেগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, মনের মধ্যে কী-একটা খাড়া করিয়া তুলিত, তাহাতেই সে সুখ পাইত এবং আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিত।

চারু সেইদিন বিকালেই জিজ্ঞাসা করিত, "কতটা লিখলে।"

অমল বলিত, "এরই মধ্যে কি লেখা যায়।"

চারু পরদিন সকালে ঈষৎ কলহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, "কই, তুমি সেটা লিখলে না?"

অমল বলিত, "রোসো, আর-একটু ভাবি।"

চারু রাগ করিয়া বলিত, "তবে যাও!"

বিকালে সেই রাগ ঘনীভূত হইয়া চারু যখন কথা বন্ধ করিবার জো করিত তখন অমল লেখা কাগজের একটা অংশ রুমাল বাহির করিবার ছলে পকেট হইতে একটুখানি বাহির করিত।

মুহূর্তে চারুর মৌন ভাঙিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিত, "ঐ-যে তুমি লিখেছ! আমাকে ফাঁকি! দেখাও!"

অমল বলিত, "এখনও শেষ হয় নি, আর-একটু লিখে শোনাব।"

চারু। না, এখনই শোনাতে হবে।

অমল এখনই শোনাইবার জন্যই ব্যস্ত; কিন্তু চারুকে কিছুক্ষণ কাড়াকাড়ি না করাইয়া সে শোনাইত না। তার পরে অমল কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া প্রথমটা একটুখানি পাতা ঠিক করিয়া লইত, পেনসিল লইয়া দুই-এক জায়গায় দুটো-একটা সংশোধন করিতে থাকিত, ততক্ষণ চারুর চিত্ত পুলকিত কৌতূহলে জলভারনত মেঘের মতো সেই কাগজ কয়খানির দিকে ঝুঁকিয়া রহিত।

অমল দুই-চারি প্যারাগ্রাফ যখন যাহা লেখে তাহা যতটুকুই হোক চারুকে সদ্য-সদ্য শোনাইতে হয়। বাকি অলিখিত অংশটুকু আলোচনা এবং কল্পনায় উভয়ের মধ্যে মথিত হইতে থাকে।

এতদিন দুজনে আকাশকুসুমের চয়নে নিযুক্ত ছিল, এখন কাব্যকুসুমের চাষ আরম্ভ হইয়া উভয়ে আর সমস্তই ভুলিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্ণে অমল কালেজ হইতে ফিরিলে তাহার পকেটটা কিছু অতিরিক্ত ভরা বলিয়া বোধ হইল। অমল যখন বাড়িতে প্রবেশ করিল, তখনই চারু অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে তাহার পকেটের পূর্ণতার প্রতি লক্ষ করিয়াছিল।

অমল অন্যদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভিতর আসিতে দেরি করিত না; আজ সে তাহার ভরা পকেট লইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল, শীঘ্র আসিবার নাম করিল না।

চারু অন্তঃপুরের সীমান্তদেশে আসিয়া অনেকবার তালি দিল, কেহ শুনিল না। চারু কিছু রাগ করিয়া তাহার বারান্দায় মন্মথ দত্তর এক বই হাতে করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মন্মথ দত্ত নূতন গ্রন্থকার। তাহার লেখার ধরন অনেকটা অমলেরই মতো, এইজন্য অমল তাহাকে কখনও প্রশংসা করিত না; মাঝে মাঝে চারুর কাছে তাহার লেখা বিকৃত উচ্চারণে পড়িয়া বিদ্রূপ করিত। চারু অমলের নিকট হইতে সে বই কাড়িয়া লইয়া অবজ্ঞাভরে দূরে ফেলিয়া দিত।

আজ যখন অমলের পদশব্দ শুনিতে পাইল তখন সেই মন্মথ দত্তর 'কলকণ্ঠ'-নামক বই মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চারু অত্যন্ত একাগ্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমল বারান্দায় প্রবেশ করিল, চারু লক্ষও করিল না। অমল কহিল, "কী বোঠান, কী পড়া হচ্ছে।"

চারুকে নিরুত্তর দেখিয়া অমল চৌকির পিছনে আসিয়া বইটা দেখিল। কহিল, "মন্মথ দত্তর গলগণ্ড।"

চারু কহিল, "আঃ, বিরক্ত কোরো না, আমাকে পড়তে দাও।" পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া অমল ব্যঙ্গস্বরে পড়িতে লাগিল, "আমি তৃণ, ক্ষুদ্র তৃণ; ভাই রক্তাম্বর রাজবেশধারী অশোক, আমি তৃণমাত্র! আমার ফুল নাই, আমার ছায়া নাই, আমার মস্তক আমি আকাশে তুলিতে পারি না, বসন্তের কোকিল আমাকে আশ্রয় করিয়া কুহুস্বরে জগৎ মাতায় না— তবু ভাই অশোক, তোমার ঐ পুষ্পিত উচ্চ শাখা হইতে তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়ো না; তোমার পায়ে পড়িয়া আছি আমি তৃণ, তবু আমাকে তুচ্ছ করিয়ো না।"

অমল এইটুকু বই হইতে পড়িয়া তার পরে বিদ্রূপ করিয়া বানাইয়া বলিতে

লাগিল, "আমি কলার কাঁদি, কাঁচকলার কাঁদি, ভাই কুষ্মাণ্ড, ভাই গৃহচালবিহারী কুষ্মাণ্ড, আমি নিতান্তই কাঁচকলার কাঁদি।"

চারু কৌতূহলের তাড়নায় রাগ রাখিতে পারিল না; হাসিয়া উঠিয়া বই ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তুমি ভারি হিংসুটে, নিজের লেখা ছাড়া কিছু পছন্দ হয় না।"

অমল কহিল, "তোমার ভারি উদারতা, তৃণটি পেলেও গিলে খেতে চাও।"

চারু। আচ্ছা মশায়, ঠাট্টা করতে হবে না; পকেটে কী আছে বের করে ফেলো।

অমল। কী আছে আন্দাজ করো।

অনেকক্ষণ চারুকে বিরক্ত করিয়া অমল পকেট হইতে 'সরোরুহ'-নামক বিখ্যাত মাসিক পত্র বাহির করিল।

চারু দেখিল, কাগজে অমলের সেই 'খাতা'-নামক প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে।

চারু দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অমল মনে করিয়াছিল, তাহার বোঠান খুব খুশি হইবে। কিন্তু খুশির বিশেষ কোনো লক্ষণ না দেখিয়া বলিল, "সরোরুহ পত্রে যে-সে লেখা বের হয় না।"

অমল এটা কিছু বেশি বলিল। যে-কোনোপ্রকার চলনসই লেখা পাইলে সম্পাদক ছাড়েন না। কিন্তু অমল চারুকে বুঝাইয়া দিল, সম্পাদক বড়োই কড়া লোক, এক শো প্রবন্ধের মধ্যে একটা বাছিয়া লন।

শুনিয়া চারু খুশি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু খুশি হইতে পারিল না। কিসে যে সে মনের মধ্যে আঘাত পাইল তাহা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কোনো সংগত কারণ বাহির হইল না।

অমলের লেখা অমল এবং চারু দুজনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চারু পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস। সেই লেখা সকলে পড়িবে এবং অনেকেই প্রশংসা করিবে, ইহাতে চারুকে যে কেন এতটা পীড়া দিতেছিল তাহা সে ভালো করিয়া বুঝিল না।

কিন্তু লেখকের আকাঙ্ক্ষা একটিমাত্র পাঠকে অধিকদিন মেটে না। অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল।

মাঝে মাঝে ভক্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগুলি তাহার বোঠানকে দেখাইত। চারু তাহাতে খুশিও হইল, কষ্টও পাইল। এখন অমলকে লেখায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য একমাত্র তাহারই উৎসাহ ও উত্তেজনার প্রয়োজন রহিল না। অমল মাঝে মাঝে কদাচিৎ নামস্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইয়া চারু তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু সুখ পাইত না। হঠাৎ তাহাদের কমিটির রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া বাংলাদেশের পাঠকমণ্ডলী তাহাদের দুজনকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি একদিন অবসরকালে কহিল, "তাই তো চারু, আমাদের অমল যে এমন ভালো লিখতে পারে তা তো আমি জানতুম না।"

ভূপতির প্রশংসায় চারু খুশি হইল। অমল ভূপতির আশ্রিত, কিন্তু অন্য আশ্রিতদের সহিত তাহার অনেক প্রভেদ আছে, এ কথা তাহার স্বামী বুঝিতে পারিলে চারু যেন গর্ব অনুভব করে। তাহার ভাবটা এই যে, 'অমলকে কেন যে আমি এতটা স্নেহ আদর করি এতদিনে তোমরা তাহা বুঝিলে; আমি অনেকদিন আগেই অমলের মর্যাদা বুঝিয়াছিলাম, অমল কাহারও অবজ্ঞার পাত্র নহে।'

চারু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তার লেখা পড়েছ?"

ভূপতি কহিল, "হাঁ—না, ঠিক পড়ি নি। সময় পাই নি। কিন্তু আমাদের নিশিকান্ত প'ড়ে খুব প্রশংসা করছিল। সে বাংলা লেখা বেশ বোঝে।"

ভূপতির মনে অমলের প্রতি একটি সম্মানের ভাব জাগিয়া উঠে, ইহা চারুর একান্ত ইচ্ছা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমাপদ ভূপতিকে তাহার কাগজের সঙ্গে অন্য পাঁচরকম উপহার দিবার কথা বুঝাইতেছিল। উপহারে যে কী করিয়া লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে তাহা ভূপতি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

চারু একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উমাপদকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, দুইজনে হিসাব লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত।

উমাপদ চারুর অধৈর্য দেখিয়া কোনো ছুতা করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি হিসাব লইয়া মাথা ঘুরাইতে লাগিল।

চারু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এখনও বুঝি তোমার কাজ শেষ হল না? দিনরাত ঐ একখানা কাগজ নিয়ে যে তোমার কী করে কাটে, আমি তাই ভাবি।"

ভূপতি হিসাব সরাইয়া রাখিয়া একটুখানি হাসিল। মনে মনে ভাবিল, 'বাস্তবিক, চারুর প্রতি আমি মনোযোগ দিবার সময়ই পাই না, বড়ো অন্যায়। ও বেচারার পক্ষে সময় কাটাইবার কিছুই নাই।'

ভূপতি স্নেহপূর্ণস্বরে কহিল, "আজ যে তোমার পড়া নেই! মাস্টারটি বুঝি পালিয়েছেন? তোমার পাঠশালার সব উলটো নিয়ম—ছাত্রীটি পুঁথিপত্র নিয়ে প্রস্তুত, মাস্টার পলাতক! আজকাল অমল তোমাকে আগেকার মতো নিয়মিত পড়ায় ব'লে তো বোধ হয় না।"

চারু কহিল, "আমাকে পড়িয়ে অমলের সময় নষ্ট করা কি উচিত। অমলকে তুমি বুঝি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটার পেয়েছ?"

ভূপতি চারুর কটিদেশ ধরিয়া কাছে টানিয়া কহিল, "এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হল। তোমার মতো বউঠানকে যদি পড়াতে পেতুম তা হলে—"

চারু। ইস্ ইস্ তুমি আর বোলো না! স্বামী হয়েই রক্ষে নেই তো আরও কিছু!

ভূপতি ঈষৎ একটু আহত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, কাল থেকে আমি নিশ্চয় তোমাকে পড়াব। তোমার বইগুলো আনো দেখি, কী তুমি পড় একবার দেখে নিই।"

চারু। ঢের হয়েছে, তোমার আর পড়াতে হবে না। এখনকার মতো তোমার খবরের কাগজের হিসেবটা একটু রাখবে? এখন আর-কোনো দিকে মন দিতে পারবে কি না বলো।

ভূপতি কহিল, "নিশ্চয় পারব। এখন তুমি আমার মনকে যে দিকে ফেরাতে চাও সেই দিকেই ফিরবে।"

চারু। আচ্ছা বেশ, তা হলে অমলের এই লেখাটা একবার পড়ে দেখো কেমন চমৎকার হয়েছে। সম্পাদক অমলকে লিখেছে এই লেখা পড়ে নবগোপালবাবু তাকে

বাংলার রাস্কিন নাম দিয়েছেন।

শুনিয়া ভূপতি কিছু সংকুচিতভাবে কাগজখানা হাতে করিয়া লইল। খুলিয়া দেখিল, লেখাটির নাম 'আষাঢ়ের চাঁদ'। গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া ভূপতি ভারত-গবর্মেণ্টের বাজেট-সমালোচনা লইয়া বড়ো বড়ো অঙ্কপাত করিতেছিল, সেই-সকল অঙ্ক বহুপদ কীটের মতো তাহার মস্তিষ্কের নানা বিবরের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল—এমন সময়ে হঠাৎ বাংলা ভাষায় 'আষাঢ়ের চাঁদ' প্রবন্ধ আগাগোড়া পড়িবার জন্য তাহার মন প্রস্তুত ছিল না। প্রবন্ধটিও নিতান্ত ছোটো নহে।

লেখাটা এইরূপে শুরু হইয়াছে—'আজ কেন আষাঢ়ের চাঁদ সারারাত মেঘের মধ্যে এমন করিয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে! যেন স্বর্গলোক হইতে সে কী চুরি করিয়া আনিয়াছে, যেন তাহার কলঙ্ক ঢাকিবার স্থান নাই। ফাল্গুন মাসে যখন আকাশের একটি কোণেও মুষ্টিপরিমাণ মেঘ ছিল না তখন তো জগতের চক্ষের সম্মুখে সে নির্লজ্জের মতো উন্মুক্ত আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল—আর আজ তাহার সেই ঢলঢল হাসিখানি—শিশুর স্বপ্নের মতো, প্রিয়ার স্মৃতির মতো, সুরেশ্বরী শচীর অলকবিলম্বিত মুক্তার মালার মতো—'

ভূপতি মাথা চুলকাইয়া কহিল, "বেশ লিখেছে। কিন্তু আমাকে কেন। এ-সব কবিত্ব কি আমি বুঝি।"

চারু সংকুচিত হইয়া ভূপতির হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "তুমি তবে কী বোঝ।"

ভূপতি কহিল, "আমি সংসারের লোক, আমি মানুষ বুঝি।"

চারু কহিল, "মানুষের কথা বুঝি সাহিত্যের মধ্যে লেখে না?"

ভূপতি। ভুল লেখে। তা ছাড়া মানুষ যখন সশরীরে বর্তমান তখন বানানো কথার মধ্যে তাকে খুঁজে বেড়াবার দরকার?

বলিয়া চারুলতার চিবুক ধরিয়া কহিল, "এই যেমন আমি তোমাকে বুঝি, কিন্তু সেজন্য কি 'মেঘনাদবধ' 'কবিকঙ্কণচন্ডী' আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে।"

ভূপতি কাব্য বোঝে না বলিয়া অহংকার করিত। তবু অমলের লেখা ভালো করিয়া না পড়িয়াও তাহার প্রতি মনে মনে ভূপতির একটা শ্রদ্ধা ছিল। ভূপতি ভাবিত, 'বলিবার কথা কিছুই নাই অথচ এত কথা অনর্গল বানাইয়া বলা সে তো আমি মাথা কুটিয়া মরিলেও পারিতাম না। অমলের পেটে যে এত ক্ষমতা ছিল তাহা কে জানিত।'

ভূপতি নিজের রসজ্ঞতা অস্বীকার করিত কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাহার কৃপণতা ছিল না। দরিদ্র লেখক তাহাকে ধরিয়া পড়িলে বই ছাপিবার খরচ ভূপতি দিত, কেবল বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, "আমাকে যেন উৎসর্গ করা না হয়।" বাংলা ছোটো বড়ো সমস্ত সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্র, খ্যাত অখ্যাত পাঠ্য অপাঠ্য সমস্ত বই সে কিনিত। বলিত, "একে পড়ি না, তার পরে যদি না কিনি তবে পাপও করিব প্রায়শ্চিত্তও হইবে না।" পড়িত না বলিয়াই মন্দ বইয়ের প্রতি তাহার লেশমাত্র বিদ্বেষ ছিল না, সেইজন্য তাহার বাংলা লাইব্রেরি গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল।

অমল ভূপতির ইংরাজি প্রুফ-সংশোধনকার্যে সাহায্য করিত; কোনো-একটা কাপির দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর দেখাইয়া লইবার জন্য সে একতাড়া কাগজপত্র লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "অমল, তুমি আষাঢ়ের চাঁদ আর ভাদ্র মাসের পাকা

তালের উপর যত-খুশি লেখো, আমি তাতে কোনো আপত্তি করি নে— আমি কারও স্বাধীনতায় হাত দিতে চাই নে— কিন্তু আমার স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ। সেগুলো আমাকে না পড়িয়ে ছাড়বেন না, তোমার বোঠানের এ কী অত্যাচার।"

অমল হাসিয়া কহিল, "তাই তো বোঠান, আমার লেখাগুলো নিয়ে তুমি যে দাদাকে জুলুম করবার উপায় বের করবে, এমন জানলে আমি লিখতুম না।"

সাহিত্যরসে বিমুখ ভূপতির কাছে আনিয়া তাহার অত্যন্ত দরদের লেখাগুলিকে অপদস্থ করাতে অমল মনে মনে চারুর উপর রাগ করিল এবং চারু তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া বেদনা পাইল। কথাটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইবার জন্য ভূপতিকে কহিল, "তোমার ভাইটির একটি বিয়ে দিয়ে দাও দেখি, তা হলে আর লেখার উপদ্রব সহ্য করতে হবে না।"

ভূপতি কহিল, "এখনকার ছেলেরা আমাদের মতো নির্বোধ নয়। তাদের যত কবিত্ব লেখায়, কাজের বেলায় সেয়ানা। কই, তোমার দেওরকে তো বিয়ে করতে রাজি করাতে পারলে না।"

চারু চলিয়া গেলে ভূপতি অমলকে কহিল, "অমল, আমাকে এই কাগজের হাঙ্গামে থাকতে হয়, চারু বেচারা বড়ো একলা পড়েছে। কোনো কাজকর্ম নেই, মাঝে মাঝে আমার এই লেখবার ঘরে উঁকি মেরে চলে যায়। কী করব বলো। তুমি, অমল, ওকে একটু পড়াশুনোয় নিযুক্ত রাখতে পারলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে চারুকে যদি ইংরাজি কাব্য থেকে তর্জমা করে শোনাও তা হলে ওর উপকারও হয়, ভালোও লাগে। চারুর সাহিত্যে বেশ রুচি আছে।"

অমল কহিল, "তা আছে। বোঠান যদি আরও একটু পড়াশুনো করেন তা হলে আমার বিশ্বাস উনি নিজে বেশ ভালো লিখতে পারবেন।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ততটা আশা করি নে, কিন্তু চারু বাংলা লেখার ভালো-মন্দ আমার চেয়ে ঢের বুঝতে পারে।"

অমল। ওঁর কল্পনাশক্তি বেশ আছে, স্ত্রীলোকের মধ্যে এমন দেখা যায় না।

ভূপতি। পুরুষের মধ্যেও কম দেখা যায়, তার সাক্ষী আমি। আচ্ছা, তুমি তোমার বউঠাকরুনকে যদি গড়ে তুলতে পার আমি তোমাকে পারিতোষিক দেব।

অমল। কী দেবে শুনি।

ভূপতি। তোমার বউঠাকরুনের জুড়ি একটি খুঁজে-পেতে এনে দেব।

অমল। আবার তাকে নিয়ে পড়তে হবে! চিরজীবন কি গড়ে তুলতেই কাটাব।

দুটি ভাই আজকালকার ছেলে, কোনো কথা তাহাদের মুখে বাধে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমল এখন মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। আগে সে স্কুলের ছাত্রটির মতো থাকিত, এখন সে যেন সমাজের গণ্যমান্য মানুষের মতো হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে সভায় সাহিত্যপ্রবন্ধ পাঠ করে— সম্পাদক ও সম্পাদকের দূত তাহার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়, নানা সভার সভ্য ও সভাপতি হইবার জন্য তাহার নিকট অনুরোধ আসে, ভূপতির ঘরে দাসদাসী-

আত্মীয়স্বজনের চক্ষে তাহার প্রতিষ্ঠাস্থান অনেকটা উপরে উঠিয়া গেছে।

মন্দাকিনী এতদিন তাহাকে বিশেষ একটা-কেহ বলিয়া মনে করে নাই। অমল ও চারুর হাস্যালাপ-আলোচনাকে সে ছেলেমানুষি বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পান সাজিত ও ঘরের কাজকর্ম করিত; নিজেকে সে উহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সংসারের পক্ষে আবশ্যক বলিয়াই জানিত।

অমলের পান খাওয়া অপরিমিত ছিল। মন্দার উপর পান সাজিবার ভার থাকাতে সে পানের অযথা অপব্যয়ে বিরক্ত হইত। অমলে চারুতে ষড়যন্ত্র করিয়া মন্দার পানের ভাণ্ডার প্রায়ই লুঠ করিয়া আনা তাহাদের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই শৌখিন চোরদুটির চৌর্যপরিহাস মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।

আসল কথা, একজন আশ্রিত অন্য আশ্রিতকে প্রসন্নচক্ষে দেখে না। অমলের জন্য মন্দাকে যেটুকু গৃহকর্ম অতিরিক্ত করিতে হইত সেটুকুতে সে যেন কিছু অপমান বোধ করিত। চারু অমলের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না, কিন্তু অমলকে অবহেলা করিবার চেষ্টা তাহার সর্বদাই ছিল। সুযোগ পাইলেই দাসদাসীদের কাছেও গোপনে অমলের নামে খোঁচা দিতে সে ছাড়িত না। তাহারাও যোগ দিত।

কিন্তু অমলের যখন অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল তখন মন্দার একটু চমক লাগিল। সে অমল এখন আর নাই। এখন তাহার সংকুচিত নম্রতা একেবারে ঘুচিয়া গেছে, অপরকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার এখন যেন তাহারই হাতে। সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ অসংশয়ে অকুণ্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে, যে লোক একটা নিশ্চিত অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। মন্দা যখন দেখিল অমল চারি দিক হইতেই শ্রদ্ধা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মুখে নবগৌরবের গর্বোজ্জ্বল দীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল; সে যেন অমলকে নূতন করিয়া দেখিল।

এখন আর পান চুরি করিবার প্রয়োজন রহিল না। অমলের খ্যাতিলাভে চারুর এই আর-একটা লোকসান; তাহাদের ষড়যন্ত্রের কৌতুকবন্ধনটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; পান এখন অমলের কাছে আপনি আসিয়া পড়ে, কোনো অভাব হয় না।

তাহা ছাড়া তাহাদের দুইজনে-গঠিত দল হইতে মন্দাকিনীকে নানা কৌশলে দূরে রাখিয়া তাহারা যে আমোদ বোধ করিত তাহাও নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল। অমল যে মনে করিবে চারুই তাহার একমাত্র বন্ধু ও সমজদার, ইহা মন্দার ভালো লাগিত না। পূর্বকৃত অবহেলা সে সুদে আসলে শোধ দিতে উদ্যত। সুতরাং অমলে চারুতে মুখোমুখি হইলেই মন্দা কোনো ছলে মাঝখানে আসিয়া ছায়া ফেলিয়া গ্রহণ লাগাইয়া দিত। হঠাৎ মন্দার এই পরিবর্তন লইয়া চারু তাহার অসাক্ষাতে যে পরিহাস করিবে সে অবসরটুকু পাওয়া শক্ত হইল।

মন্দার এই অনাহূত প্রবেশ চারুর কাছে যত বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কাছে ততটা বোধ হয় নাই, এ কথা বলা বাহুল্য। বিমুখ রমণীর মন ক্রমশ তাহার দিকে যে ফিরিতেছে, ইহাতে ভিতরে ভিতরে সে একটা আগ্রহ অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু চারু যখন দূর হইতে মন্দাকে দেখিয়া তীব্র মৃদু স্বরে বলিত, 'ঐ আসছেন' তখন অমলও বলিত, 'তাই তো, জ্বালালে দেখছি।' পৃথিবীর অন্য-সকল

সঙ্গের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা তাহাদের একটা দস্তুর ছিল ; অমল সেটা হঠাৎ কী বলিয়া ছাড়ে। অবশেষে মন্দাকিনী নিকটবর্তিনী হইলে অমল যেন বল-পূর্বক সৌজন্য করিয়া বলিত, "তার পরে, মন্দা-বউঠান, আজ তোমার পানের বাটায় বাটপাড়ির লক্ষণ কিছু দেখলে!"

মন্দা। যখন চাইলেই পাও, ভাই, তখন চুরি করবার দরকার!

অমল। চেয়ে পাওয়ার চেয়ে তাতে সুখ বেশি।

মন্দা। তোমরা কী পড়ছিলে পড়ো-না, ভাই। থামলে কেন। পড়া শুনতে আমার বেশ লাগে।

ইতিপূর্বে পাঠানুরাগের জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে মন্দার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় নাই, কিন্তু 'কালোহি বলবত্তরঃ'।

চারুর ইচ্ছা নহে, অরসিকা মন্দার কাছে অমল পড়ে, অমলের ইচ্ছা মন্দাও তাহার লেখা শোনে।

চারু। অমল কমলাকান্তের দপ্তরের সমালোচনা লিখে এনেছে, সে কি তোমার—

মন্দা। হলেমই বা মূর্খ, তবু শুনলে কি একেবারেই বুঝতে পারি নে।

তখন আর-একদিনের কথা অমলের মনে পড়িল। চারুতে মন্দাতে বিন্তি খেলিতেছে, সে তাহার লেখা হাতে করিয়া খেলাসভায় প্রবেশ করিল। চারুকে শুনাইবার জন্য সে অধীর, খেলা ভাঙিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত। অবশেষে বলিয়া উঠিল, "তোমরা তবে খেলো বউঠান, আমি অখিলবাবুকে লেখাটা শুনিয়ে আসি গে।"

চারু অমলের চাদর চাপিয়া কহিল, "আঃ, বোসো-না, যাও কোথায়।" বলিয়া তাড়াতাড়ি হারিয়া খেলা শেষ করিয়া দিল।

মন্দা বলিল, "তোমাদের পড়া আরম্ভ হবে বুঝি? তবে আমি উঠি।"

চারু ভদ্রতা করিয়া কহিল, "কেন, তুমিও শোনো-না, ভাই।"

মন্দা। না ভাই, আমি তোমাদের ও-সব ছাইপাঁশ কিছুই বুঝি নে ; আমার কেবল ঘুম পায়।— বলিয়া সে অকালে খেলাভঙ্গে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সেই মন্দা আজ কমলাকান্তের সমালোচনা শুনিবার জন্য উৎসুক। অমল কহিল, "তা বেশ তো, মন্দা-বউঠান, তুমি শুনবে সে তো আমার সৌভাগ্য।" বলিয়া পাত উল্‌টাইয়া আবার গোড়া হইতে পড়িবার উপক্রম করিল ; লেখার আরম্ভে সে অনেকটা পরিমাণ রস ছড়াইয়াছিল, সেটুকু বাদ দিয়া পড়িতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চারু তাড়াতাড়ি বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি যে বলেছিলে জাহ্নবী লাইব্রেরি থেকে পুরোনো মাসিক পত্র কতকগুলো এনে দেবে।"

অমল। সে তো আজ নয়।

চারু। আজই তো। বেশ! ভুলে গেছ বুঝি?

অমল। ভুলব কেন। তুমি যে বলেছিলে—

চারু। আচ্ছা বেশ, এনো না। তোমরা পড়ো। আমি যাই, পরেশকে লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিই গে।—বলিয়া চারু উঠিয়া পড়িল।

অমল বিপদ আশঙ্কা করিল। মন্দা মনে মনে বুঝিল এবং মুহূর্তের মধ্যেই চারুর প্রতি তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। চারু চলিয়া গেলে অমল যখন উঠিবে কি

না ভাবিয়া ইতস্তত করিতেছিল মন্দা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "যাও ভাই, মান ভাঙাও গে ; চারু রাগ করেছে। আমাকে লেখা শোনালে মুশকিলে পড়বে।"

ইহার পরে অমলের পক্ষে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। অমল চারুর প্রতি কিছু রুষ্ট হইয়া কহিল, "কেন, মুশকিল কিসের।" বলিয়া লেখা বিস্তৃত করিয়া ধরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মন্দা দুই হাতে তাহার লেখা আচ্ছাদন করিয়া বলিল, "কাজ নেই ভাই, পোড়ো না।"

বলিয়া, যেন অশ্রু সম্বরণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চারু নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। মন্দা ঘরে বসিয়া চুলের দড়ি বিনাইতেছিল। "বউঠান" বলিয়া অমল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দা নিশ্চয় জানিত যে, চারুর নিমন্ত্রণে যাওয়ার সংবাদ অমলের অগোচর ছিল না ; হাসিয়া কহিল, "আহা অমলবাবু, কাকে খুঁজতে এসে কার দেখা পেলে। এমনি তোমার অদৃষ্ট।" অমল কহিল, "বাঁ দিকের বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও ঠিক তেমনি, গর্দভের পক্ষে দুইই সমান আদরের।" বলিয়া সেইখানে বসিয়া গেল।

অমল। মন্দা-বোঠান, তোমাদের দেশের গল্প বলো, আমি শুনি।

লেখার বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্য অমল সকলের সব কথা কৌতূহলের সহিত শুনিত। সেই কারণে মন্দাকে এখন সে আর পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিত না। মন্দার মনস্তত্ত্ব, মন্দার ইতিহাস, এখন তাহার কাছে ঔৎসুক্যজনক। কোথায় তাহার জন্মভূমি, তাহাদের গ্রামটি কিরূপ, ছেলেবেলা কেমন করিয়া কাটিত, বিবাহ হইল কবে, ইত্যাদি সকল কথাই সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্দার ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই। মন্দা আনন্দে নিজের কথা বকিয়া যাইতে লাগিল ; মাঝে মাঝে কহিল, "কী বকছি তার ঠিক নাই।"

অমল উৎসাহ দিয়া কহিল, "না, আমার বেশ লাগছে, বলে যাও।" মন্দার বাপের এক কানা গোমস্তা ছিল, সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া এক-একদিন অভিমানে অনশনব্রত গ্রহণ করিত, অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় মন্দাদের বাড়িতে কিরূপে গোপনে আহার করিতে আসিত এবং দৈবাৎ একদিন স্ত্রীর কাছে কিরূপে ধরা পড়িয়াছিল, সেই গল্প যখন হইতেছে এবং অমল মনোযোগের সহিত শুনিতে শুনিতে সকৌতুকে হাসিতেছে এমন সময় চারু ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গল্পের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার আগমনে হঠাৎ একটা জমাট সভা ভাঙিয়া গেল, চারু তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বউঠান, এত সকাল-সকাল ফিরে এলে যে?"

চারু কহিল, "তাই তো দেখছি। বেশি সকাল-সকালই ফিরেছি।" বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অমল কহিল, "ভালোই করেছ, বাঁচিয়েছ আমাকে। আমি ভাবছিলুম, কখন না জানি ফিরবে। মন্মথ দত্তর 'সন্ধ্যার পাখি' বলে নূতন বইটা তোমাকে পড়ে শোনাব বলে এনেছি।"

চারু। এখন থাক্, আমার কাজ আছে।

অমল। কাজ থাকে তো আমাকে হুকুম করো, আমি করে দিচ্ছি।

চারু জানিত অমল আজ বই কিনিয়া আনিয়া তাহাকে শুনাইতে আসিবে; চারু ঈর্ষা জন্মাইবার জন্য মন্মথর লেখার প্রচুর প্রশংসা করিবে এবং অমল সেই বইটাকে বিকৃত করিয়া পড়িয়া বিদ্রূপ করিতে থাকিবে। এই-সকল কল্পনা করিয়াই অধৈর্যবশত সে অকালে নিমন্ত্রণগৃহের সমস্ত অনুনয়বিনয় লঙ্ঘন করিয়া অসুখের ছুতায় গৃহে চলিয়া আসিতেছে। এখন বারবার মনে করিতেছে, 'সেখানে ছিলাম ভালো, চলিয়া আসা অন্যায় হইয়াছে।'

মন্দাও তো কম বেহায়া নয়। একলা অমলের সহিত এক ঘরে বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। লোকে দেখিলে কী বলিবে। কিন্তু মন্দাকে এ কথা লইয়া ভর্ৎসনা করা চারুর পক্ষে বড়ো কঠিন। কারণ, মন্দা যদি তাহারই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া জবাব দেয়। কিন্তু সে হইল এক, আর এ হইল এক। সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দেয়, অমলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে, কিন্তু মন্দার তো সে উদ্দেশ্য আদবেই নয়। মন্দা নিঃসন্দেহই সরল যুবককে মুগ্ধ করিবার জন্য জাল বিস্তার করিতেছে। এই ভয়ংকর বিপদ হইতে বেচারা অমলকে রক্ষা করা তাহারই কর্তব্য। অমলকে এই মায়াবিনীর মতলব্ কেমন করিয়া বুঝাইবে। বুঝাইলে তাহার প্রলোভনের নিবৃত্তি না হইয়া যদি উলটা হয়।

বেচারা দাদা! তিনি তাহার স্বামীর কাগজ লইয়া দিন রাত খাটিয়া মরিতেছেন, আর মন্দা কিনা কোণটিতে বসিয়া অমলকে ভুলাইবার জন্য আয়োজন করিতেছে। দাদা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। মন্দার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এ-সকল ব্যাপার চারু কী করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিবে। ভারি অন্যায়।

কিন্তু আগে অমল বেশ ছিল, যেদিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া নাম করিয়াছে সেইদিন হইতেই যত অনর্থ দেখা যাইতেছে। চারুই তো তাহার লেখার গোড়া। কুক্ষণে সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দিয়াছিল। এখন কি আর অমলের 'পরে তাহার পূর্বের মতো জোর খাটিবে। এখন অমল পাঁচজনের আদরের স্বাদ পাইয়াছে, অতএব একজনকে বাদ দিলে তাহার আসে যায় না।

চারু স্পষ্টই বুঝিল, তাহার হাত হইতে গিয়া পাঁচজনের হাতে পড়িয়া অমলের সমূহ বিপদ। চারুকে অমল এখন নিজের ঠিক সমকক্ষ বলিয়া জানে না; চারুকে সে ছাড়াইয়া গেছে। এখন সে লেখক, চারু পাঠক। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

আহা, সরল অমল, মায়াবিনী মন্দা, বেচারা দাদা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন আষাঢ়ের নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া চারু তাহার খোলা জানালার কাছে একান্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া কী-একটা

লিখিতেছে।

অমল কখন নিঃশব্দপদে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা সে জানিতে পারিল না। বাদলার স্নিগ্ধ আলোকে চারু লিখিয়া গেল, অমল পড়িতে লাগিল। পাশে অমলেরই দুই-একটা ছাপানো লেখা খোলা পড়িয়া আছে ; চারুর কাছে সেইগুলিই রচনার একমাত্র আদর্শ।

"তবে যে বল, তুমি লিখতে পার না!"

হঠাৎ অমলের কণ্ঠ শুনিয়া চারু অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল ; তাড়াতাড়ি খাতা লুকাইয়া ফেলিল ; কহিল, "তোমার ভারি অন্যায়।"

অমল। কী অন্যায় করেছি।

চারু। নুকিয়ে নুকিয়ে দেখছিলে কেন।

অমল। প্রকাশ্যে দেখতে পাই নে ব'লে।

চারু তাহার লেখা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। অমল ফস্ করিয়া তাহার হাত হইতে খাতা কাড়িয়া লইল। চারু কহিল, "তুমি যদি পড় তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।"

অমল। যদি পড়তে বারণ কর তা হলে তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।

চারু। আমার মাথা খাও, ঠাকুরপো, পোড়ো না।

অবশেষে চারুকেই হার মানিতে হইল। কারণ, অমলকে তাহার লেখা দেখাইবার জন্য মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল, অথচ দেখাইবার বেলায় যে তাহার এত লজ্জা করিবে তাহা সে ভাবে নাই। অমল যখন অনেক অনুনয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল তখন লজ্জায় চারুর হাত-পা বরফের মতো হিম হইয়া গেল। কহিল, "আমি পান নিয়ে আসি গে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পান সাজিবার উপলক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

অমল পড়া সাঙ্গ করিয়া চারুকে গিয়া কহিল, "চমৎকার হয়েছে।"

চারু পানে খয়ের দিতে ভুলিয়া কহিল, "যাও! আর ঠাট্টা করতে হবে না। দাও, আমার খাতা দাও।"

অমল কহিল, "খাতা এখন দেব না, লেখাটা কপি করে নিয়ে কাগজে পাঠাব।"

চারু। হাঁ, কাগজে পাঠাবে বই-কি! সে হবে না।

চারু ভারি গোলমাল করিতে লাগিল। অমলও কিছুতে ছাড়িল না। সে যখন বারবার শপথ করিয়া কহিল, "কাগজে দিবার উপযুক্ত হইয়াছে" তখন চারু যেন নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে তো পেরে ওঠবার জো নেই! যেটা ধরবে সে আর কিছুতেই ছাড়বে না!"

অমল কহিল, "দাদাকে একবার দেখাতে হবে।"

শুনিয়া চারু পান সাজা ফেলিয়া আসন হইতে বেগে উঠিয়া পড়িল ; খাতা কাড়িবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "না, তাঁকে শোনাতে পাবে না। তাঁকে যদি আমার লেখার কথা বল তা হলে আমি আর এক অক্ষর লিখব না।"

অমল। বউঠান, তুমি ভারি ভুল বুঝছ। দাদা মুখে যাই বলুন, তোমার লেখা দেখলে খুব খুশি হবেন।

চারু। তা হোক, আমার খুশিতে কাজ নেই।

চারু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল সে লিখিবে— অমলকে আশ্চর্য করিয়া দিবে ; মন্দার সহিত তাহার যে অনেক প্রভেদ এ কথা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না। এ কয়দিন বিস্তর লিখিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। যাহা লিখিতে যায় তাহা নিতান্ত অমলের লেখার মতো হইয়া উঠে ; মিলাইতে গিয়া দেখে এক-একটা অংশ অমলের রচনা হইতে প্রায় অবিকল উদ্‌ধৃত হইয়া আসিয়াছে। সেইগুলিই ভালো, বাকিগুলা কাঁচা। দেখিলে অমল নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, ইহাই কল্পনা করিয়া চারু সে-সকল লেখা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, পাছে তাহার একটা খণ্ডও দৈবাৎ অমলের হাতে আসিয়া পড়ে।

প্রথমে সে লিখিয়াছিল 'শ্রাবণের মেঘ'। মনে করিয়াছিল, 'ভাবাশ্রুজলে অভিষিক্ত খুব-একটা নূতন লেখা লিখিয়াছি।' হঠাৎ চেতনা পাইয়া দেখিল, জিনিসটা অমলের 'আষাঢ়ের চাঁদ'-এর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। অমল লিখিয়াছে, 'ভাই চাঁদ, তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।' চারু লিখিয়াছিল, 'সখী কাদম্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্চলের তলে চাঁদকে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ' ইত্যাদি।

কোনোমতেই অমলের গণ্ডি এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চারু রচনার বিষয় পরিবর্তন করিল। চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ-কথা-কও এ-সমস্ত ছাড়িয়া সে 'কালীতলা' বলিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায়-অন্ধকার পুকুরটির ধারে কালীর মন্দির ছিল ; সেই মন্দিরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা ভয় ঔৎসুক্য, সেই সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জাগ্রত ঠাকুরানীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প— এই-সমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ-ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং পল্লিগ্রামের ভাষা-ভঙ্গী-আভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই লেখাটা অমল কাড়িয়া লইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, গোড়ার দিকটা বেশ সরস হইয়াছে, কিন্তু কবিত্ব শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, প্রথম রচনার পক্ষে লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়।

চারু কহিল, "ঠাকুরপো, এসো আমরা একটা মাসিক কাগজ বের করি। কী বল।"

অমল। অনেকগুলি রৌপ্যচক্র না হলে সে কাগজ চলবে কী করে।

চারু। আমাদের এ কাগজে কোনো খরচ নেই। ছাপা হবে না তো— হাতের অক্ষরে লিখব। তাতে তোমার আমার ছাড়া আর কারও লেখা বেরোবে না, কাউকে পড়তে দেওয়া হবে না। কেবল দু কপি ক'রে বের হবে ; একটি তোমার জন্যে, একটি আমার জন্যে।

কিছুদিন পূর্বে হইলে অমল এ প্রস্তাবে মাতিয়া উঠিত ; এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিয়া গেছে। এখন দশজনকে উদ্দেশ না করিয়া কোনো রচনায় সে সুখ পায় না। তবু সাবেক কালের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল। কহিল, "সে বেশ মজা হবে।"

চারু কহিল, "কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের কাগজ ছাড়া আর কোথাও তুমি লেখা বের করতে পারবে না।"

অমল। তা হলে সম্পাদকেরা যে মেরেই ফেলবে।

চারু। আর আমার হাতে বুঝি মারের অস্ত্র নেই?

সেইরূপ কথা হইল। দুই সম্পাদক, দুই লেখক এবং দুই পাঠকে মিলিয়া কমিটি বসিল। অমল কহিল, "কাগজের নাম দেওয়া যাক চারুপাঠ।" চারু কহিল, "না, এর নাম অমলা।"

এই নূতন বন্দোবস্তে চারু মাঝের কয়দিনের দুঃখবিরক্তি ভুলিয়া গেল। তাহাদের মাসিক পত্রটিতে তো মন্দার প্রবেশ করিবার কোনো পথ নাই এবং বাহিরের লোকেরও প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূপতি একদিন আসিয়া কহিল, "চারু, তুমি যে লেখিকা হয়ে উঠবে, পূর্বে এমন তো কোনো কথা ছিল না!"

চারু চমকিয়া লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমি লেখিকা! কে বললে তোমাকে। কখ্খনো না।"

ভূপতি। বামালসুদ্ধ গ্রেফ্তার। প্রমাণ হাতে হাতে!—বলিয়া ভূপতি একখণ্ড সরোরুহ বাহির করিল। চারু দেখিল, যে-সকল লেখা সে তাহাদের গুপ্ত সম্পত্তি মনে করিয়া নিজেদের হস্তলিখিত মাসিক পত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল তাহাই লেখক-লেখিকার নামসুদ্ধ সরোরুহে প্রকাশ হইয়াছে।

কে যেন তাহার খাঁচার বড়ো সাধের পোষা পাখিগুলিকে দ্বার খুলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, এমনি তাহার মনে হইল। ভূপতির নিকটে ধরা পড়িবার লজ্জা ভুলিয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

"আর এইটে দেখো দেখি!" বলিয়া বিশ্ববন্ধু খবরের কাগজ খুলিয়া ভূপতি চারুর সম্মুখে ধরিল। তাহাতে 'হাল বাংলা লেখার ঢঙ' বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

চারু হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "এ প'ড়ে আমি কী করব।" তখন অমলের উপর অভিমানে আর কোনো দিকে সে মন দিতে পারিতেছিল না। ভূপতি জোর করিয়া কহিল, "একবার পড়ে দেখোই-না।"

চারু অগত্যা চোখ বুলাইয়া গেল। আধুনিক কোনো কোনো লেখকশ্রেণীর ভাবাড়ম্বরে-পূর্ণ গদ্য লেখাকে গালি দিয়া লেখক খুব কড়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে অমল এবং মন্মথ দত্তর লেখার ধারাকে সমালোচক তীব্র উপহাস করিয়াছে, এবং তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়া নবীনা লেখিকা শ্রীমতী চারুবালার ভাষার অকৃত্রিম সরলতা, অনায়াস সরসতা এবং চিত্ররচনানৈপুণ্যের বহুল প্রশংসা করিয়াছে। লিখিয়াছে, এইরূপ রচনাপ্রণালীর অনুকরণ করিয়া সফলতা লাভ করিলে তবেই অমল-কোম্পানির নিস্তার, নচেৎ তাহারা সম্পূর্ণ ফেল করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "একেই বলে গুরুমারা বিদ্যে।"

চারু তাহার লেখার এই প্রথম প্রশংসায় এক-একবার খুশি হইতে গিয়া তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইতে লাগিল। তাহার মন যেন কোনোমতেই খুশি হইতে চাহিল না। প্রশংসার লোভনীয় সুধাপাত্র মুখের কাছ পর্যন্ত আসিতেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে

লাগিল।

সে বুঝিতে পারিল, তাহার লেখা কাগজে ছাপাইয়া অমল হঠাৎ তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিল। অবশেষে ছাপা হইলে পর স্থির করিয়াছিল কোনো-একটা কাগজে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইলে দুইটা একসঙ্গে দেখাইয়া চারুর রোষশান্তি ও উৎসাহবিধান করিবে। যখন প্রশংসা বাহির হইল তখন অমল কেন আগ্রহের সহিত তাহাকে দেখাইতে আসিল না। এ সমালোচনায় অমল আঘাত পাইয়াছে এবং চারুকে দেখাইতে চাহে না বলিয়াই এ কাগজগুলি সে একেবারে গোপন করিয়া গেছে। চারু আরামের জন্য অতিনিভৃতে যে-একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল হঠাৎ প্রশংসা-শিলাবৃষ্টির একটা বড়োরকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে স্খলিত করিবার জো করিল। চারুর ইহা একেবারেই ভালো লাগিল না।

ভূপতি চলিয়া গেলে চারু তাহার শোবার ঘরের খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; সম্মুখে সরোরুহ এবং বিশ্ববন্ধু খোলা পড়িয়া আছে।

খাতা-হাতে অমল চারুকে সহসা চকিত করিয়া দিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দ-পদে প্রবেশ করিল। কাছে আসিয়া দেখিল, বিশ্ববন্ধুর সমালোচনা খুলিয়া চারু নিমগ্নচিত্তে বসিয়া আছে।

পুনরায় নিঃশব্দপদে অমল বাহির হইয়া গেল। 'আমাকে গালি দিয়া চারুর লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনন্দে চারুর আর চৈতন্য নাই।' মুহূর্তের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন তিক্তস্বাদ হইয়া উঠিল। চারু যে মূর্খের সমালোচনা পড়িয়া নিজেকে আপন গুরুর চেয়ে মস্ত মনে করিয়াছে, ইহা নিশ্চয় স্থির করিয়া অমল চারুর উপর ভারি রাগ করিল। চারুর উচিত ছিল কাগজখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া আগুনে ছাই করিয়া পুড়াইয়া ফেলা।

চারুর উপর রাগ করিয়া অমল মন্দার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সশব্দে ডাকিল, "মন্দা-বউঠান।"

মন্দা। এসো ভাই, এসো। না চাইতেই যে দেখা পেলুম! আজ আমার কী ভাগ্যি।

অমল। আমার নূতন লেখা দু-একটা শুনবে?

মন্দা। কতদিন থেকে 'শোনাব শোনাব' করে আশা দিয়ে রেখেছ কিন্তু শোনাও না তো। কাজ নেই ভাই—আবার কে কোন্‌ দিক থেকে রাগ করে বসলে তুমিই বিপদে পড়বে—আমার কী।

অমল কিছু তীব্রস্বরে কহিল, "রাগ করবেন কে। কেনই-বা রাগ করবেন। আচ্ছা সে দেখা যাবে, তুমি এখন শোনোই তো।"

মন্দা যেন অত্যন্ত আগ্রহে তাড়াতাড়ি সংযত হইয়া বসিল। অমল সুর করিয়া সমারোহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমলের লেখা মন্দার পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, তাহার মধ্যে কোথাও সে কোনো কিনারা দেখিতে পায় না। সেইজন্যই সমস্ত মুখে আনন্দের হাসি আনিয়া অতিরিক্ত ব্যগ্রতার ভাবে সে শুনিতে লাগিল। উৎসাহে অমলের কণ্ঠ উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া উঠিল।

সে পড়িতেছিল—'অভিমন্যু যেমন গর্ভবাসকালে কেবল ব্যূহপ্রবেশ করিতে

শিখিয়াছিল, ব্যূহ হইতে নির্গমন শেখে নাই— নদীর স্রোত সেইরূপ গিরিদরীর পাষাণ-জঠরের মধ্যে থাকিয়া কেবল সম্মুখেই চলিতে শিখিয়াছিল, পশ্চাতে ফিরিতে শেখে নাই। হায় নদীর স্রোত, হায় যৌবন, হায় কাল, হায় সংসার, তোমরা কেবল সম্মুখেই চলিতে পার— যে পথে স্মৃতির স্বর্ণমণ্ডিত উপলখণ্ড ছড়াইয়া আস সে পথে আর কোনোদিন ফিরিয়া যাও না। মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়, অনন্ত জগৎসংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।'

এমন সময় মন্দার দ্বারের কাছে একটি ছায়া পড়িল, সে ছায়া মন্দা দেখিতে পাইল। কিন্তু যেন দেখে নাই এইরূপ ভাণ করিয়া অনিমেষদৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া নিবিড় মনোযোগের সহিত পড়া শুনিতে লাগিল।

ছায়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল।

চারু অপেক্ষা করিয়া ছিল, অমল আসিলেই তাহার সম্মুখে বিশ্ববন্ধু কাগজটিকে যথোচিত লাঞ্ছিত করিবে, এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া তাহাদের লেখা মাসিক পত্রে বাহির করিয়াছে বলিয়া অমলকেও ভর্ৎসনা করিবে।

অমলের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল তবু তাহার দেখা নাই। চারু একটা লেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; অমলকে শুনাইবার ইচ্ছা; তাহাও পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে কোথা হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শুনা যায়! এ যেন মন্দার ঘরে! শরবিদ্ধের মতো সে উঠিয়া পড়িল। পায়ের শব্দ না করিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমল যে-লেখা মন্দাকে শুনাইতেছে এখনও চারু তাহা শোনে নাই। অমল পড়িতেছিল— 'মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়— অনন্ত জগৎসংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।'

চারু যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমন নিঃশব্দে আর ফিরিয়া যাইতে পারিল না। আজ পরে পরে দুই তিনটা আঘাতে তাহাকে একেবারে ধৈর্যচ্যুত করিয়া দিল। মন্দা যে একবর্ণও বুঝিতেছে না এবং অমল যে নিতান্ত নির্বোধ মূঢ়ের মতো তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে, এ কথা তাহার চীৎকার করিয়া বলিয়া আসিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু না বলিয়া সক্রোধ পদশব্দে তাহা প্রচার করিয়া আসিল। শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া চারু দ্বার সশব্দে বন্ধ করিল।

অমল ক্ষণকালের জন্য পড়ায় ক্ষান্ত দিল। মন্দা হাসিয়া চারুর উদ্দেশে ইঙ্গিত করিল। অমল মনে মনে কহিল, 'বউঠানের এ কী দৌরাত্ম্য। তিনি কি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাঁহারই ক্রীতদাস। তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পড়া শুনাইতে পারিব না। এ যে ভয়ানক জুলুম।' এই ভাবিয়া সে আরও উচ্চৈঃস্বরে মন্দাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

পড়া হইয়া গেলে চারুর ঘরের সম্মুখ দিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একবার চাহিয়া দেখিল, ঘরের দ্বার রুদ্ধ।

চারু পদশব্দে বুঝিল, অমল তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল— একবারও থামিল না। রাগে ক্ষোভে তাহার কান্না আসিল না। নিজের নূতন-লেখা খাতাখানি বাহির করিয়া তাহার প্রত্যেক পাতা বসিয়া বসিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া স্তূপাকার করিল। হায়, কী কুক্ষণেই এই-সমস্ত লেখালেখি আরম্ভ হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় বারান্দার টব হইতে জুঁইফুলের গন্ধ আসিতেছিল। ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া স্নিগ্ধ আকাশে তারা দেখা যাইতেছিল। আজ চারু চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই। জানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া আছে, মৃদু বাতাসে আস্তে আস্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে, এবং তাহার চোখ দিয়া এমন ঝর্ ঝর্ করিয়া কেন জল বহিয়া যাইতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না।

এমন সময় ভূপতি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান, হৃদয় ভারাক্রান্ত। ভূপতির আসিবার সময় এখন নহে। কাগজের জন্য লিখিয়া, প্রুফ দেখিয়া অন্তঃপুরে আসিতে প্রায়ই তাহার বিলম্ব হয়। আজ সন্ধ্যার পরেই যেন কোন্ সান্ত্বনা-প্রত্যাশায় চারুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল না। খোলা জালনার ক্ষীণ আলোকে ভূপতি চারুকে বাতায়নের কাছে অস্পষ্ট দেখিতে পাইল; ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দ শুনিতে পাইয়াও চারু মুখ ফিরাইল না—মূর্তিটির মতো স্থির হইয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

ভূপতি কিছু আশ্চর্য হইয়া ডাকিল, "চারু।"

ভূপতির কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ভূপতি আসিয়াছে সে তাহা মনে করে নাই। ভূপতি চারুর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে তুমি যে একলাটি ব'সে আছ, চারু? মন্দা কোথায় গেল।"

চারু যেমনটি আশা করিয়াছিল আজ সমস্ত দিন তাহার কিছুই হইল না। সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল অমল আসিয়া ক্ষমা চাহিবে—সেজন্য প্রস্তুত হইয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় ভূপতির অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে সে যেন আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপতি ব্যস্ত হইয়া ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, কী হয়েছে, চারু।"

কী হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। এমনই কী হয়েছে। বিশেষ তো কিছুই হয় নাই। অমল নিজের নূতন লেখা প্রথমে তাহাকে না শুনাইয়া মন্দাকে শুনাইয়াছে, এ কথা লইয়া ভূপতির কাছে কী নালিশ করিবে। শুনিলে কি ভূপতি হাসিবে না। এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে গুরুতর নালিশের বিষয় যে কোন্‌খানে লুকাইয়া আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা চারুর পক্ষে অসাধ্য। অকারণে সে যে কেন এত অধিক কষ্ট পাইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কষ্টের বেদনা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ভূপতি। বলো-না চারু, তোমার কী হয়েছে। আমি কি তোমার উপর কোনো অন্যায় করেছি। তুমি তো জানই, কাগজের ঝঞ্ঝাট নিয়ে আমি কীরকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি, যদি তোমার মনে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি সে আমি ইচ্ছে করে দিই নি।

ভূপতি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে যাহার একটিও জবাব দিবার নাই, সেজন্য চারু ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল, ভূপতি এখন তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়া ছাড়িয়া গেলে সে বাঁচে।

ভূপতি দ্বিতীয়বার কোনো উত্তর না পাইয়া পুনর্বার স্নেহাসক্ত স্বরে কহিল, "আমি সর্বদা তোমার কাছে আসতে পারি নে চারু, সেজন্যে আমি অপরাধী, কিন্তু আর হবে না। এখন থেকে দিনরাত কাগজ নিয়ে থাকব না। আমাকে তুমি যতটা চাও ততটাই পাবে।"

চারু অধীর হইয়া বলিল, "সেজন্যে নয়।"

ভূপতি কহিল, "তবে কী জন্যে।" বলিয়া খাটের উপর বসিল।

চারু বিরক্তির স্বর গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, "সে এখন থাক্, রাত্রে বলব।"

ভূপতি মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, এখন থাক্।" বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার নিজের একটা-কী কথা বলিবার ছিল, সে আর বলা হইল না।

ভূপতি যে একটা ক্ষোভ পাইয়া গেল, চারুর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। মনে হইল, "ফিরিয়া ডাকি।" কিন্তু ডাকিয়া কী কথা বলিবে। অনুতাপে তাহাকে বিদ্ধ করিল, কিন্তু কোনো প্রতিকার সে খুঁজিয়া পাইল না।

রাত্রি হইল। চারু আজ সবিশেষ যত্ন করিয়া ভূপতির রাত্রের আহার সাজাইল এবং নিজে পাখা হাতে করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় শুনিতে পাইল মন্দা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, "ব্রজ, ব্রজ।" ব্রজ-চাকর সাড়া দিলে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলবাবুর খাওয়া হয়েছে কি।" ব্রজ উত্তর করিল, "হয়েছে।" মন্দা কহিল, "খাওয়া হয়ে গেছে অথচ পান নিয়ে গেলি নে যে?" মন্দা ব্রজকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভূপতি অন্তঃপুরে আসিয়া আহারে বসিল, চারু পাখা করিতে লাগিল।

চারু আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ভূপতির সঙ্গে প্রফুল্ল স্নিগ্ধভাবে নানা কথা কহিবে। কথাবার্তা আগে হইতে ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু মন্দার কণ্ঠস্বরে তাহার বিস্তৃত আয়োজন সমস্ত ভাঙিয়া দিল, আহারকালে ভূপতিকে সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। ভূপতিও অত্যন্ত বিমর্ষ অন্যমনস্ক হইয়া ছিল। সে ভালো করিয়া খাইল না, চারু একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু খাচ্ছ না যে?"

ভূপতি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কেন। কম খাই নি তো।"

শয়নঘরে উভয়ে একত্র হইলে ভূপতি কহিল, "আজ রাত্রে তুমি কী বলবে বলেছিলে।"

চারু কহিল, "দেখো, কিছুদিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। ওকে এখানে রাখতে আমার আর সাহস হয় না।"

ভূপতি। কেন, কী করেছে।

চারু। অমলের সঙ্গে ও এমনি ভাবে চলে যে, সে দেখলে লজ্জা হয়।

ভূপতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "হাঃ, তুমি পাগল হয়েছ! অমল ছেলেমানুষ। সেদিনকার ছেলে—"

চারু। তুমি তো ঘরের খবর কিছুই রাখ না, কেবল বাইরের খবর কুড়িয়ে বেড়াও।

যাই হোক, বেচারা দাদার জন্যে আমি ভাবি। তিনি কখন খেলেন, না খেলেন, মন্দা তার কোনো খোঁজও রাখে না, অথচ অমলের পান থেকে চুন খসে গেলেই চাকর-বাকরদের সঙ্গে বকাবকি করে অনর্থ করে।

ভূপতি। তোমরা মেয়েরা কিন্তু ভারি সন্দিগ্ধ, তা বলতে হয়।

চারু রাগিয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ, আমরা সন্দিগ্ধ, কিন্তু বাড়িতে আমি এ-সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না তা বলে রাখছি।"

চারুর এই-সমস্ত অমূলক আশঙ্কায় ভূপতি মনে মনে হাসিল, খুশিও হইল। গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্যধর্মে আনুমানিক কাল্পনিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্শ না করে, এজন্য সাধ্বী স্ত্রীদের যে অতিরিক্ত সতর্কতা, যে সন্দেহাকুল দৃষ্টিক্ষেপ, তাহার মধ্যে একটি মাধুর্য এবং মহত্ত্ব আছে।

ভূপতি শ্রদ্ধায় এবং স্নেহে চারুর ললাট চুম্বন করিয়া কহিল, "এ নিয়ে আর কোনো গোল করবার দরকার হবে না। উমাপদ ময়মনসিংহে প্র্যাক্‌টিস্‌ করতে যাচ্ছে, মন্দাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।"

অবশেষে নিজের দুশ্চিন্তা এবং এই-সকল অপ্রীতিকর আলোচনা দূর করিয়া দিবার জন্য ভূপতি টেবিল হইতে একটা খাতা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তোমার লেখা আমাকে শোনাও না, চারু।"

চারু খাতা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "এ তোমার ভালো লাগবে না, তুমি ঠাট্টা করবে।"

ভূপতি এই কথায় কিছু ব্যথা পাইল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি ঠাট্টা করব না, এমনি স্থির হয়ে শুনব যে তোমার ভ্রম হবে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।"

কিন্তু ভূপতি আমল পাইল না—দেখিতে দেখিতে খাতাপত্র নানা আবরণ-আচ্ছাদনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সকল কথা ভূপতি চারুকে বলিতে পারে নাই। উমাপদ ভূপতির কাগজখানির কর্মাধ্যক্ষ ছিল। চাঁদা-আদায়, ছাপাখানা ও বাজারের দেনা শোধ, চাকরদের বেতন দেওয়া, এ-সমস্তই উমাপদর উপর ভার ছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাগজওয়ালার নিকট হইতে উকিলের চিঠি পাইয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভূপতির নিকট হইতে তাহাদের ২৭০০৲ টাকা পাওনা জানাইয়াছে। ভূপতি উমাপদকে ডাকিয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার। এ টাকা তো আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। কাগজের দেনা চার-পাঁচশোর বেশি তো হবার কথা নয়।"

উমাপদ কহিল, "নিশ্চয় এরা ভুল করেছে।"

কিন্তু, আর চাপা রহিল না। কিছুকাল হইতে উমাপদ এইরূপ ফাঁকি দিয়া আসিতেছে। কেবল কাগজ সম্বন্ধে নহে, ভূপতির নামে উমাপদ বাজারে অনেক দেনা করিয়াছে। গ্রামে সে যে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিতেছে তাহার মালমসলার কতক ভূপতির নামে লিখাইয়াছে, অধিকাংশই কাগজের টাকা হইতে শোধ করিয়াছে।

যখন নিতান্তই ধরা পড়িল তখন সে রুক্ষ স্বরে কহিল, "আমি তো আর নিরুদ্দেশ হচ্ছি নে। কাজ করে আমি ক্রমে ক্রমে শোধ দেব— তোমার সিকি-পয়সার দেনা যদি বাকি থাকে তবে আমার নাম উমাপদ নয়।"

তাহার নামের ব্যত্যয়ে ভূপতির কোনো সান্ত্বনা ছিল না। অর্থের ক্ষতিতে ভূপতি তত ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতায় সে যেন ঘর হইতে শূন্যের মধ্যে পা ফেলিল।

সেইদিন সে অকালে অন্তঃপুরে গিয়াছিল। পৃথিবীতে একটা যে নিশ্চয় বিশ্বাসের স্থান আছে সেইটে ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া আসিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। চারু তখন নিজের দুঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া ছিল।

উমাপদ পরদিনেই ময়মনসিংহে যাইতে প্রস্তুত। বাজারের পাওনাদাররা খবর পাইবার পূর্বেই সে সরিয়া পড়িতে চায়। ভূপতি ঘৃণাপূর্বক উমাপদর সহিত কথা কহিল না— ভূপতির সেই মৌনাবস্থা উমাপদ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিল।

অমল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দা বোঠান, এ কী ব্যাপার। জিনিসপত্র গোছাবার ধুম যে?"

মন্দা। আর ভাই, যেতে তো হবেই। চিরকাল কি থাকব।

অমল। যাচ্ছ কোথায়।

মন্দা। দেশে।

অমল। কেন। এখানে অসুবিধাটা কী হল।

মন্দা। অসুবিধে আমার কী বল। তোমাদের পাঁচজনের সঙ্গে ছিলুম, সুখেই ছিলুম। কিন্তু অন্যের অসুবিধে হতে লাগল যে।— বলিয়া চারুর ঘরের দিকে কটাক্ষ করিল।

অমল গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মন্দা কহিল, "ছি ছি, কী লজ্জা। বাবু কী মনে করলেন।"

অমল এ কথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করিল না। এটুকু স্থির করিল, চারু তাহাদের সম্বন্ধে দাদার কাছে এমন কথা বলিয়াছে যাহা বলিবার নহে।

অমল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল এ বাড়িতে আর ফিরিয়া না আসে। দাদা যদি বোঠানের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অপরাধী মনে করিয়া থাকেন তবে মন্দা যে পথে গিয়াছে তাহাকেও সেই পথে যাইতে হয়। মন্দাকে বিদায় এক হিসাবে অমলের প্রতিও নির্বাসনের আদেশ— সেটা কেবল মুখ ফুটিয়া বলা হয় নাই মাত্র। ইহার পরে কর্তব্য খুব সুস্পষ্ট— আর একদণ্ডও এখানে থাকা নয়। কিন্তু দাদা যে তাহার সম্বন্ধে কোনোপ্রকার অন্যায় ধারণা মনে মনে পোষণ করিয়া রাখিবেন সে হইতেই পারে না। এতদিন তিনি অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসে তাহাকে ঘরে স্থান দিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে বিশ্বাসে যে অমল কোনো অংশে আঘাত দেয় নাই সে কথা দাদাকে না বুঝাইয়া সে কেমন করিয়া যাইবে।

ভূপতি তখন আত্মীয়ের কৃতঘ্নতা, পাওনাদারের তাড়না, উচ্ছৃঙ্খল হিসাবপত্র এবং শূন্য তহবিল লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিল। তাহার এই শুষ্ক মনোদুঃখের কেহ দোসর ছিল না— চিত্তবেদনা এবং ঋণের সঙ্গে একলা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার

জন্য ভূপতি প্রস্তুত হইতেছিল।

এমন সময় অমল ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভূপতি নিজের অগাধ চিন্তার মধ্য হইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চাহিল। কহিল, "খবর কী অমল।"

অকস্মাৎ মনে হইল, অমল বুঝি আর-একটা কী গুরুতর দুঃসংবাদ লইয়া আসিল।

অমল কহিল, "দাদা, আমার উপরে তোমার কি কোনোরকম সন্দেহের কারণ হয়েছে।"

ভূপতি আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তোমার উপরে সন্দেহ!" মনে মনে ভাবিল, 'সংসার যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কোন্‌দিন অমলকেও সন্দেহ করিব আশ্চর্য নাই।'

অমল। বোঠান কি আমার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কাছে কোনোরকম দোষারোপ করেছেন।

ভূপতি ভাবিল, ওঃ এই ব্যাপার! বাঁচা গেল। স্নেহের অভিমান। সে মনে করিয়াছিল, সর্বনাশের উপর বুঝি আর-একটা কিছু সর্বনাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু গুরুতর সংকটের সময়েও এই-সকল তুচ্ছ বিষয়ে কর্ণপাত করিতে হয়। সংসার এ দিকে সাঁকোও নাড়াইবে অথচ সেই সাঁকোর উপর দিয়া তাহার শাকের আঁটিগুলো পার করিবার জন্য তাগিদ করিতেও ছাড়িবে না।

অন্য সময় হইলে ভূপতি অমলকে পরিহাস করিত, কিন্তু আজ তাহার সে প্রফুল্লতা ছিল না। সে বলিল, "পাগল হয়েছ নাকি।"

অমল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান কিছু বলেন নি?"

ভূপতি। তোমাকে ভালোবাসেন বলে যদি কিছু বলে থাকেন তাতে রাগ করবার কোনো কারণ নেই।

অমল। কাজকর্মের চেষ্টায় এখন আমার অন্যত্র যাওয়া উচিত।

ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, "অমল, তুমি কী ছেলেমানুষি করছ তার ঠিক নেই। এখন পড়াশুনো করো, কাজকর্ম পরে হবে।"

অমল বিমর্ষমুখে চলিয়া আসিল, ভূপতি তাহার কাগজের গ্রাহকদের মূল্যপ্রাপ্তির তালিকার সহিত তিন বৎসরের জমাখরচের হিসাব মিলাইতে বসিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

অমল স্থির করিল, বউঠানের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে হইবে, এ কথাটার শেষ না করিয়া ছাড়া হইবে না। বোঠানকে যে-সকল শক্ত শক্ত কথা শুনাইবে মনে মনে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মন্দা চলিয়া গেলে চারু সংকল্প করিল, অমলকে সে নিজে হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার রোষশান্তি করিবে। কিন্তু একটা লেখার উপলক্ষ করিয়া ডাকিতে হইবে। অমলেরই একটা লেখার অনুকরণ করিয়া 'অমাবস্যার আলো' নামে সে একটা প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছে। চারু এটুকু বুঝিয়াছে যে, তাহার স্বাধীন ছাঁদের লেখা অমল পছন্দ করে না।

পূর্ণিমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিয়া ফেলে বলিয়া চারু তাহার নূতন রচনায় পূর্ণিমাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া লজ্জা দিতেছে। লিখিতেছে— অমাবস্যার

অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলোকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে স্তরে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার এক রশ্মিও হারাইয়া যায় নাই ; তাই পূর্ণিমার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অমাবস্যার কালিমা পরিপূর্ণতর— ইত্যাদি। অমল নিজের সকল লেখাই সকলের কাছে প্রকাশ করে এবং চারু তাহা করে না— পূর্ণিমা-অমাবস্যার তুলনার মধ্যে কি সেই কথাটার আভাস আছে।

এ দিকে এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি ভূপতি কোনো আসন্ন ঋণের তাগিদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহার পরম বন্ধু মতিলালের কাছে গিয়াছিল।

মতিলালকে সংকটের সময় ভূপতি কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়াছিল— সেদিন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সেই টাকাটা চাহিতে গিয়াছিল। মতিলাল স্নানের পর গা খুলিয়া পাখার হাওয়া লাগাইতেছিল এবং একটা কাঠের বাক্সর উপর কাগজ মেলিয়া অতি ছোটো অক্ষরে সহস্র দুর্গানাম লিখিতেছিল। ভূপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত হৃদ্যতার স্বরে কহিল, "এসো এসো— আজকাল তো তোমার দেখাই পাবার জো নেই।"

মতিলাল টাকার কথা শুনিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিয়া কহিল, "কোন্ টাকার কথা বলছ। এর মধ্যে তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছি নাকি।"

ভূপতি সাল-তারিখ স্মরণ করাইয়া দিলে মতিলাল কহিল, "ওঃ, সেটা তো অনেকদিন হল তামাদি হয়ে গেছে।"

ভূপতির চক্ষে তাহার চতুর্দিকের চেহারা সমস্ত যেন বদল হইয়া গেল। সংসারের যে অংশ হইতে মুখোশ খসিয়া পড়িল সে দিকটা দেখিয়া আতঙ্কে ভূপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বন্যা আসিয়া পড়িলে ভীত ব্যক্তি যেখানে সকলের চেয়ে উচ্চ চূড়া দেখে সেইখানে যেমন ছুটিয়া যায়, সংশয়াক্রান্ত বহিঃসংসার হইতে ভূপতি তেমনি বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ; মনে মনে কহিল, 'আর যাই হোক, চারু তো আমাকে বঞ্চনা করিবে না।'

চারু তখন খাটে বসিয়া কোলের উপর বালিশ এবং বালিশের উপর খাতা রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া একমনে লিখিতেছিল। ভূপতি যখন নিতান্ত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল তখনই তাহার চেতনা হইল, তাড়াতাড়ি তাহার খাতাটা পায়ের নীচে চাপিয়া বসিল।

মনে যখন বেদনা থাকে তখন অল্প আঘাতেই গুরুতর ব্যথা বোধ হয়। চারু এমন অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত তাহার লেখা গোপন করিল দেখিয়া ভূপতির মনে বাজিল।

ভূপতি ধীরে ধীরে খাটের উপর চারুর পাশে বসিল। চারু তাহার রচনাস্রোতে অনপেক্ষিত বাধা পাইয়া এবং ভূপতির কাছে হঠাৎ খাতা লুকাইবার ব্যস্ততায় অপ্রতিভ হইয়া কোনো কথাই জোগাইয়া উঠিতে পারিল না।

সেদিন ভূপতির নিজের কিছু দিবার বা কহিবার ছিল না। সে রিক্তহস্তে চারুর নিকটে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। চারুর কাছ হইতে আশঙ্কাধর্মী ভালোবাসার একটা-কোনো প্রশ্ন, একটা-কিছু আদর পাইলেই তাহার ক্ষত-যন্ত্রণায় ঔষধ পড়িত। কিন্তু 'হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া', এক মুহূর্তের প্রয়োজনে প্রীতিভাণ্ডারের চাবি চারু যেন কোনোখানে খুঁজিয়া পাইল না। উভয়ের সুকঠিন মৌনে ঘরের নীরবতা অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসিল।

খানিকক্ষণ নিতান্ত চুপচাপ থাকিয়া ভূপতি নিশ্বাস ফেলিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।

সেই সময় অমল বিস্তর শক্ত শক্ত কথা মনের মধ্যে বোঝাই করিয়া লইয়া চারুর ঘরে দ্রুতপদে আসিতেছিল, পথের মধ্যে অমল ভূপতির অত্যন্ত শুষ্ক বিবর্ণ মুখ দেখিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া থামিল, জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার অসুখ করেছে?"

অমলের স্নিগ্ধ স্বর শুনিবামাত্র হঠাৎ ভূপতির সমস্ত হৃদয় তাহার অশ্রুরাশি লইয়া বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বাহির হইল না। সবলে আত্মসম্বরণ করিয়া ভূপতি আর্দ্রস্বরে কহিল, "কিছু হয় নি, অমল। এবারে কাগজে তোমার কোনো লেখা বেরোচ্ছে কি।"

অমল শক্ত শক্ত কথা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা কোথায় গেল। তাড়াতাড়ি চারুর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বউঠান, দাদার কী হয়েছে বলো দেখি।"

চারু কহিল, "কই, তা তো কিছু বুঝতে পারলুম না। অন্য কাগজে বোধ হয় ওঁর কাগজকে গাল দিয়ে থাকবে।"

অমল মাথা নাড়িল।

না ডাকিতেই অমল আসিল এবং সহজভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া চারু অত্যন্ত আরাম পাইল। একেবারেই লেখার কথা পাড়িল— কহিল, "আজ আমি 'অমাবস্যার আলো' বলে একটা লেখা লিখছিলুম; আর-একটু হলেই তিনি সেটা দেখে ফেলেছিলেন।"

চারু নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল, তাহার নূতন লেখাটা দেখিবার জন্য অমল পীড়াপীড়ি করিবে। সেই অভিপ্রায়ে খাতাখানা একটু নাড়াচাড়াও করিল। কিন্তু, অমল একবার তীব্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে চাহিল— কী বুঝিল, কী ভাবিল, জানি না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বতপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল। অমল কোনো কথা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারু অমলের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারের কোনো তাৎপর্য বুঝিতে পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন ভূপতি আবার অসময়ে শয়নঘরে আসিয়া চারুকে ডাকাইয়া আনাইল। কহিল, "চারু, অমলের বেশ একটি ভালো বিবাহের প্রস্তাব এসেছে।"

চারু অন্যমনস্ক ছিল। কহিল, "ভালো কী এসেছে।"

ভূপতি। বিয়ের সম্বন্ধ।

চারু। কেন, আমাকে কি পছন্দ হল না।

ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তোমাকে পছন্দ হল কি না সে কথা এখনও অমলকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। যদিই-বা হয়ে থাকে, আমার তো একটা ছোটোখাটো দাবি আছে, সে আমি ফস্ করে ছাড়ছি নে।"

চারু। আঃ, কী বকছ তার ঠিক নেই। তুমি যে বললে, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ

এসেছে।—চারুর মুখ লাল হইয়া উঠিল।

ভূপতি। তা হলে কি ছুটে তোমাকে খবর দিতে আসতুম। বক্‌শিশ পাবার তো আশা ছিল না।

চারু। অমলের সম্বন্ধ এসেছে? বেশ তো। তা হলে আর দেরি কেন।

ভূপতি। বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে অমলকে বিলেত পাঠাতে চান।

চারু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিলেত?"

ভূপতি। হাঁ, বিলেত।

চারু। অমল বিলেত যাবে? বেশ মজা তো। বেশ হয়েছে, ভালোই হয়েছে। তা তুমি তাকে একবার বলে দেখো।

ভূপতি। আমি বলবার আগে তুমি তাকে একবার ডেকে বুঝিয়ে বললে ভালো হয় না?

চারু। আমি তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না। আমি তাকে বলতে পারব না।

ভূপতি। তোমার কি মনে হয়, সে করবে না?

চারু। আরও তো অনেকবার চেষ্টা দেখা গেছে, কোনোমতে তো রাজি হয় নি।

ভূপতি। কিন্তু এবারকার এ প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না। আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে আমি তো আর সেরকম করে আশ্রয় দিতে পারব না।

ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল। অমল আসিলে তাহাকে বলিল, "বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাঁর ইচ্ছে, বিবাহ দিয়ে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। তোমার কী মত।"

অমল কহিল, "তোমার যদি অনুমতি থাকে, আমার এতে কোনো অমত নেই।"

অমলের কথা শুনিয়া উভয়ে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে যে বলিবামাত্রই রাজি হইবে, এ কেহ মনে করে নাই।

চারু তীব্রস্বরে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "দাদার অনুমতি থাকিলেই উনি মত দেবেন! কী আমার কথার বাধ্য ছোটো ভাই! দাদার 'পরে ভক্তি এতদিন কোথায় ছিল, ঠাকুরপো।"

অমল উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

অমলের নিরুত্তরে চারু যেন তাহাকে চেতাইয়া তুলিবার জন্য দ্বিগুণতর ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, "তার চেয়ে বলো-না কেন, নিজের ইচ্ছে গেছে। এতদিন ভাণ করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না। পেটে খিদে মুখে লাজ!"

ভূপতি উপহাস করিয়া কহিল, "অমল তোমার খাতিরেই এতদিন খিদে চেপে রেখেছিল, পাছে ভাজের কথা শুনে তোমার হিংসে হয়।"

চারু এই কথায় লাল হইয়া উঠিয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল, "হিংসে! তা বই-কি! কখ্‌খনো আমার হিংসে হয় না। ওরকম ক'রে বলা তোমার ভারি অন্যায়।"

ভূপতি। ঐ দেখো। নিজের স্ত্রীকে ঠাট্টাও করতে পারব না!

চারু। না, ওরকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

ভূপতি। আচ্ছা, গুরুতর অপরাধ করেছি। মাপ করো। যা হোক, বিয়ের প্রস্তাবটা

তা হলে স্থির?

অমল কহিল, "হাঁ।"

চারু। মেয়েটি ভালো কি মন্দ তাও বুঝি একবার দেখতে যাবারও তর সইল না। তোমার যে এমন দশা হয়ে এসেছে তা তো একটু আভাসেও প্রকাশ কর নি।

ভূপতি। অমল, মেয়ে দেখতে চাও তো তার বন্দোবস্ত করি। খবর নিয়েছি, মেয়েটি সুন্দরী।

অমল। না, দেখবার দরকার দেখি নে।

চারু। ওর কথা শোন কেন। সে কি হয়। কনে না দেখে বিয়ে হবে? ও না দেখতে চায় আমরা তো দেখে নেব।

অমল। না দাদা, ঐ নিয়ে মিথ্যে দেরি করবার দরকার দেখি নে।

চারু। কাজ নেই বাপু—দেরি হলে বুক ফেটে যাবে। তুমি টোপর মাথায় দিয়ে এখনি বেরিয়ে পড়ো। কী জানি, তোমার সাত রাজার ধন মানিকটিকে যদি আর কেউ কেড়ে নিয়ে যায়!

অমলকে চারু কোনো ঠাট্টাতেই কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না।

চারু। বিলেত পালাবার জন্যে তোমার মনটা বুঝি দৌড়চ্ছে? কেন, এখানে আমরা তোমাকে মারছিলুম না ধরছিলুম? হ্যাট কোট প'রে সাহেব না সাজলে এখনকার ছেলেদের মন ওঠে না। ঠাকুরপো, বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের মতো কালা আদমিদের চিনতে পারবে তো?

অমল কহিল, "তা হলে আর বিলেত যাওয়া কী করতে।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "কালো রূপ ভোলবার জন্যেই তো সাত সমুদ্র পেরোনো। তা ভয় কী চারু, আমরা রইলুম, কালোর ভক্তের অভাব হবে না।"

ভূপতি খুশি হইয়া তখনই বর্ধমানে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলিয়া দিতে হইল। ভূপতি খরচ আর জোগাইয়া উঠিতে পারিল না। লোকসাধারণ-নামক একটা বিপুল নির্মম পদার্থের যে সাধনায় ভূপতি দীর্ঘকাল দিনরাত্রি একান্তমনে নিযুক্ত ছিল সেটা একমুহূর্তে বিসর্জন দিতে হইল। ভূপতির জীবনের সমস্ত চেষ্টা যে অভ্যস্ত পথে গত বারো বৎসর অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে সেটা হঠাৎ এক জায়গায় যেন জলের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। ইহার জন্য ভূপতি কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ-বাধাপ্রাপ্ত তাহার এতদিনকার সমস্ত উদ্যমকে সে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। তাহারা যেন উপবাসী অনাথ শিশুসন্তানদের মতো ভূপতির মুখের দিকে চাহিল, ভূপতি তাহাদিগকে আপন অন্তঃপুরে করুণাময়ী শুশ্রূষাপরায়ণা নারীর কাছে আনিয়া দাঁড় করাইল।

নারী তখন কী ভাবিতেছিল। সে মনে মনে বলিতেছিল, 'এ কী আশ্চর্য, অমলের বিবাহ হইবে সে তো খুব ভালোই। কিন্তু এতকাল পরে আমাদের ছাড়িয়া পরের ঘরে বিবাহ করিয়া বিলাত চলিয়া যাইবে, ইহাতে তাহার মনে একবারও একটুখানির

জন্য দ্বিধাও জন্মিল না? এতদিন ধরিয়া তাহাকে যে আমরা এত যত্ন করিয়া রাখিলাম, আর যেমনি বিদায় লইবার একটুখানি ফাঁক পাইল অমনি কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল, যেন এতদিন সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। অথচ মুখে কতই মিষ্ট, কতই ভালোবাসা। মানুষকে চিনিবার জো নাই। কে জানিত, যে লোক এত লিখিতে পারে তাহার হৃদয় কিছুমাত্র নাই।'

নিজের হৃদয়প্রাচুর্যের সহিত তুলনা করিয়া চারু অমলের শূন্য হৃদয়কে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্‌বেগ তপ্ত শূলের মতো তাহার অভিমানকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল, 'অমল আজ বাদে কাল চলিয়া যাইবে, তবু এ কয়দিন তাহার দেখা নাই। আমাদের মধ্যে যে পরস্পর একটা মনান্তর হইয়াছে সেটা মিটাইয়া লইবার আর অবসরও হইল না।' চারু প্রতিক্ষণে মনে করে, অমল আপনি আসিবে—তাহাদের এতদিনকার খেলাধুলা এমন করিয়া ভাঙিবে না, কিন্তু অমল আর আসেই না। অবশেষে যখন যাত্রার দিন অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিল তখন চারু নিজেই অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অমল বলিল, "আর-একটু পরে যাচ্ছি।" চারু তাহাদের সেই বারান্দার চৌকিটাতে গিয়া বসিল। সকালবেলা হইতে ঘন মেঘ করিয়া গুমট হইয়া আছে—চারু তাহার খোলা চুল এলো করিয়া মাথায় জড়াইয়া একটা হাতপাখা লইয়া ক্লান্ত দেহে অল্প অল্প বাতাস করিতে লাগিল।

অত্যন্ত দেরি হইল। ক্রমে তাহার হাতপাখা আর চলিল না। রাগ দুঃখ অধৈর্য তাহার বুকের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, 'নাই আসিল অমল, তাতেই বা কী।' কিন্তু তবু পদশব্দ মাত্রেই তাহার মন দ্বারের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

দূরে গির্জায় এগারোটা বাজিয়া গেল। স্নানান্তে এখনি ভূপতি খাইতে আসিবে। এখনও আধ ঘণ্টা সময় আছে, এখনও অমল যদি আসে। যেমন করিয়া হোক, তাহাদের কয়দিনকার নীরব ঝগড়া আজ মিটাইয়া ফেলিতেই হইবে—অমলকে এমনভাবে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে না। এই সমবয়সি দেওর-ভাজের মধ্যে যে চিরন্তন মধুর সম্বন্ধটুকু আছে—অনেক ভাব, আড়ি, অনেক স্নেহের দৌরাত্ম্য, অনেক বিশ্রব্ধ সুখালোচনায় বিজড়িত একটি চিরচ্ছায়াময় লতাবিতান—অমল সে কি আজ ধুলায় লুটাইয়া দিয়া বহুদিনের জন্য বহুদূরে চলিয়া যাইবে। একটু পরিতাপ হইবে না? তাহার তলে কি শেষ জলও সিঞ্চন করিয়া যাইবে না—তাহাদের অনেকদিনের দেওর-ভাজ-সম্বন্ধের শেষ অশ্রুজল!

আধঘণ্টা প্রায় অতীত হয়। এলো খোঁপা খুলিয়া খানিকটা চুলের গুচ্ছ চারু দ্রুতবেগে আঙুলে জড়াইতে এবং খুলিতে লাগিল। অশ্রু সম্বরণ করা আর যায় না। চাকর আসিয়া কহিল, "মাঠাকরুন, বাবুর জন্যে ডাব বের করে দিতে হবে।"

চারু আঁচল হইতে ভাঁড়ারের চাবি খুলিয়া ঝন্‌ করিয়া চাকরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল—সে আশ্চর্য হইয়া চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

চারুর বুকের কাছ হইতে কী-একটা ঠেলিয়া কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

যথাসময়ে ভূপতি সহাস্যমুখে খাইতে আসিল। চারু পাখা-হাতে আহারস্থানে

উপস্থিত হইয়া দেখিল, অমল ভূপতির সঙ্গে আসিয়াছে। চারু তাহার মুখের দিকে চাহিল না।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান, আমাকে ডাকছ?"

চারু কহিল, "না, এখন আর দরকার নেই।"

অমল। তা হলে আমি যাই, আমার আবার অনেক গোছাবার আছে।

চারু তখন দীপ্তচক্ষে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিল; কহিল, "যাও।"

অমল চারুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে ভূপতি কিছুক্ষণ চারুর কাছে বসিয়া থাকে। আজ দেনাপাওনা-হিসাবপত্রের হাঙ্গামে ভূপতি অত্যন্ত ব্যস্ত, তাই আজ অন্তঃপুরে বেশিক্ষণ থাকিতে পারিবে না বলিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "আজ আর আমি বেশিক্ষণ বসতে পারছি নে— আজ অনেক ঝঞ্ঝাট।"

চারু বলিল, "তা যাও-না।"

ভূপতি ভাবিল, চারু অভিমান করিল। বলিল, "তাই ব'লে যে এখনই যেতে হবে তা নয়; একটু জিরিয়ে যেতে হবে।" বলিয়া বসিল। দেখিল চারু বিমর্ষ হইয়া আছে। ভূপতি অনুতপ্ত চিত্তে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, কিন্তু কোনোমতেই কথা জমাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ কথোপকথনের বৃথা চেষ্টা করিয়া ভূপতি কহিল, "অমল তো কাল চলে যাচ্ছে, কিছুদিন তোমার বোধ হয় খুব একলা বোধ হবে।"

চারু তাহার কোনো উত্তর না দিয়া যেন কী-একটা আনিতে চট্‌ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভূপতি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

চারু আজ অমলের মুখের দিকে চাহিয়া লক্ষ করিয়াছিল, অমল এই কয়দিনেই অত্যন্ত রোগা হইয়া গেছে— তাহার মুখে তরুণতার সেই স্ফূর্তি একেবারেই নাই। ইহাতে চারু সুখও পাইল বেদনাও বোধ করিল। আসন্ন বিচ্ছেদই যে অমলকে ক্লিষ্ট করিতেছে, চারুর তাহাতে সন্দেহ রহিল না; কিন্তু তবু অমলের এমন ব্যবহার কেন। কেন সে দূরে দূরে পালাইয়া বেড়াইতেছে। বিদায়কালকে কেন সে ইচ্ছাপূর্বক এমন বিরোধতিক্ত করিয়া তুলিতেছে।

বিছানায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। যদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভালোবাসে। মন্দা চলিয়া গেছে বলিয়াই যদি অমল এমন করিয়া— ছি! অমলের মন কি এমন হইবে। এত ক্ষুদ্র? এমন কলুষিত? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন যাইবে? অসম্ভব। সন্দেহকে একান্ত চেষ্টায় দূর করিয়া দিতে চাহিল কিন্তু সন্দেহ তাহাকে সবলে দংশন করিয়া রহিল।

এমনি করিয়া বিদায়কাল আসিল। মেঘ পরিষ্কার হইল না। অমল আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "বোঠান, আমার যাবার সময় হয়েছে। তুমি এখন থেকে দাদাকে দেখো। তাঁর বড়ো সংকটের অবস্থা— তুমি ছাড়া তাঁর আর সান্ত্বনার কোনো পথ নেই।"

অমল ভূপতির বিমর্ষ ম্লান ভাব দেখিয়া সন্ধান দ্বারা তাহার দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল। ভূপতি যে কিরূপ নিঃশব্দে আপন দুঃখদুর্দশার সহিত একলা লড়াই করিতেছে, কাহারও কাছে সাহায্য বা সান্ত্বনা পায় নাই, অথচ আপন আশ্রিত

পালিত আত্মীয়স্বজনদিগকে এই প্রলয়সংকটে বিচলিত হইতে দেয় নাই, ইহা সে চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে চারুর কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল, কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল, সবেগে বলিল, 'চুলোয় যাক আষাঢ়ের চাঁদ আর অমাবস্যার আলো। আমি ব্যারিস্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য করতে পারি তবেই আমি পুরুষমানুষ।'

গত রাত্রি সমস্ত রাত জাগিয়া চারু ভাবিয়া রাখিয়াছিল, অমলকে বিদায়কালে কী কথা বলিবে—সহাস্য অভিমান এবং প্রফুল্ল ঔদাসীন্যের দ্বারা মাজিয়া মাজিয়া সেই কথাগুলিকে সে মনে মনে উজ্জ্বল ও শাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিদায় দিবার সময় চারুর মুখে কোনো কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল, "চিঠি লিখবে তো, অমল?"

অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, চারু ছুটিয়া শয়নঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি বর্ধমানে গিয়া অমলের বিবাহ-অন্তে তাহাকে বিলাতে রওনা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

নানা দিক হইতে ঘা খাইয়া বিশ্বাসপরায়ণ ভূপতির মনে বহিঃসংসারের প্রতি একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। সভাসমিতি মেলামেশা কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। মনে হইল, "এই-সব লইয়া আমি এতদিন কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম—জীবনের সুখের দিন বৃথা বহিয়া গেল এবং সারভাগ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলিলাম।"

ভূপতি মনে মনে কহিল, 'যাক, কাগজটা গেল, ভালোই হইল। মুক্তিলাভ করিলাম।' সন্ধ্যার সময় আঁধারের সূত্রপাত দেখিলেই পাখি যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি সেইরূপ তাহার দীর্ঘদিনের সঞ্চরণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চারুর কাছে চলিয়া আসিল। মনে মনে স্থির করিল, 'বাস্‌, এখন আর কোথাও নয়; এইখানেই আমার স্থিতি। যে কাগজের জাহাজটা লইয়া সমস্ত দিন খেলা করিতাম সেটা ডুবিল, এখন ঘরে চলি।'

বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল—স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে—হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপুরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

ভূপতি সন্ধ্যার সময় বর্ধমান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া সকাল-সকাল খাইল। অমলের বিবাহ ও বিলাতযাত্রার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিবার জন্য স্বভাবতই চারু একান্ত উৎসুক হইয়া আছে স্থির করিয়া ভূপতি আজ কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। ভূপতি শোবার ঘরে বিছানায় গিয়া শুইয়া গুড়গুড়ির সুদীর্ঘ নল টানিতে লাগিল। চারু এখনও অনুপস্থিত, বোধ করি গৃহকার্য করিতেছে।

তামাক পুড়িয়া শ্রান্ত ভূপতির ঘুম আসিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ঘুমের ঘোর ভাঙিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখনও চারু আসিতেছে না কেন। অবশেষে ভূপতি থাকিতে না পারিয়া চারুকে ডাকিয়া পাঠাইল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, আজ যে এত দেরি করলে?"

চারু তাহার জবাবদিহি না করিয়া কহিল, "হাঁ, আজ দেরি হয়ে গেল।"

চারুর আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নের জন্য ভূপতি অপেক্ষা করিয়া রহিল; চারু কোনো প্রশ্ন করিল না। ইহাতে ভূপতি কিছু ক্ষুন্ন হইল। তবে কি চারু অমলকে ভালোবাসে না। অমল যতদিন উপস্থিত ছিল ততদিন চারু তাহাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিল, আর যেই চলিয়া গেল অমনি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন! এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে ভূপতির মনে খটকা লাগিল; সে ভাবিতে লাগিল, তবে কী চারুর হৃদয়ের গভীরতা নাই। কেবল সে আমোদ করিতেই জানে, ভালোবাসিতে পারে না? মেয়েমানুষের পক্ষে এরূপ নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নয়।

চারু ও অমলের সখিত্বে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দুজনের ছেলেমানুষি আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল; অমলকে চারু সর্বদা যে যত্ন-আদর করিত তাহাতে চারুর সুকোমল হৃদয়ালুতার পরিচয় পাইয়া ভূপতি মনে মনে খুশি হইত। আজ আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, সে সমস্তই কি ভাসা-ভাসা, হৃদয়ের মধ্যে তাহার কোনো ভিত্তি ছিল না? ভূপতি ভাবিল, চারুর হৃদয় যদি না থাকে তবে কোথায় ভূপতি আশ্রয় পাইবে।

অল্পে অল্পে পরীক্ষা করিবার জন্য ভূপতি কথা পাড়িল, "চারু, তুমি ভালো ছিলে তো? তোমার শরীর খারাপ নেই?"

চারু সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ভালোই আছি।"

ভূপতি। অমলের তো বিয়ে চুকে গেল।

এই বলিয়া ভূপতি চুপ করিল। চারু তৎকালোচিত একটা-কোনো সংগত কথা বলিতে অনেক চেষ্টা করিল, কোনো কথাই বাহির হইল না; সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

ভূপতি স্বভাবতই কখনও কিছু লক্ষ্য করিয়া দেখে না, কিন্তু অমলের বিদায়শোক তাহার নিজের মনে লাগিয়া আছে বলিয়াই চারুর ঔদাসীন্য তাহাকে আঘাত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সমবেদনায় ব্যথিত চারুর সঙ্গে অমলের কথা আলোচনা করিয়া সে হৃদয়ভার লাঘব করিবে।

ভূপতি। মেয়েটিকে দেখতে বেশ।—চারু, ঘুমোচ্ছ?

চারু কহিল, "না।"

ভূপতি। বেচারা অমল একলা চলে গেল। যখন তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলুম, সে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগল—দেখে এই বুড়োবয়সে আমি আর চোখের জল রাখতে পারলুম না। গাড়িতে দুজন সাহেব ছিল, পুরুষমানুষের কান্না দেখে তাদের ভারি আমোদ বোধ হল।

নির্বাণদীপ শয়নঘরে বিছানার অন্ধকারের মধ্যে চারু প্রথমে পাশ ফিরিয়া শুইল, তাহার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ভূপতি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, অসুখ করেছে?"

কোনো উত্তর না পাইয়া সেও উঠিল। পাশের বারান্দা হইতে চাপা কান্নার শব্দ

শুনিতে পাইয়া ত্রস্তপদে গিয়া দেখিল, চারু মাটিতে পড়িয়া উপুড় হইয়া কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এরূপ দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভাবিল, চারুকে কী ভুল বুঝিয়াছিলাম। চারুর স্বভাব এতই চাপা যে, আমার কাছেও হৃদয়ের কোনো বেদনা প্রকাশ করিতে চাহে না। যাহাদের প্রকৃতি এইরূপ তাহাদের ভালোবাসা সুগভীর এবং তাহাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশি। চারুর প্রেম সাধারণ স্ত্রীলোকদের ন্যায় বাহির হইতে তেমন পরিদৃশ্যমান নহে, ভূপতি তাহা মনে মনে ঠাহর করিয়া দেখিল। ভূপতি চারুর ভালোবাসার উচ্ছ্বাস কখনও দেখে নাই ; আজ বিশেষ করিয়া বুঝিল, তাহার কারণ অন্তরের দিকেই চারুর ভালোবাসার গোপন প্রসার। ভূপতি নিজেও বাহিরে প্রকাশ করিতে অপটু; চারুর প্রকৃতিতেও হৃদয়াবেগের সুগভীর অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া সে একটা তৃপ্তি অনুভব করিল।

ভূপতি তখন চারুর পাশে বসিয়া কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কী করিয়া সান্ত্বনা করিতে হয় ভূপতির তাহা জানা ছিল না—ইহা সে বুঝিল না, শোককে যখন কেহ অন্ধকারে কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতে চাহে তখন সাক্ষী বসিয়া থাকিলে ভালো লাগে না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষ্যতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কোনোপ্রকার দুরাশা-দুশ্চেষ্টায় যাইবে না, চারুকে লইয়া পড়াশুনা ভালোবাসা এবং প্রতিদিনের ছোটোখাটো গার্হস্থ্য কর্তব্য পালন করিয়া চলিবে। মনে করিয়াছিল, যে-সকল ঘোরো সুখ সবচেয়ে সুলভ অথচ সুন্দর, সর্বদাই নাড়াচাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্মল, সেই সহজলভ্য সুখগুলির দ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোণটিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া নিভৃত শান্তির অবতারণা করিবে। হাসি গল্প পরিহাস, পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটোখাটো আয়োজন, ইহাতে অধিক চেষ্টা আবশ্যক হয় না অথচ সুখ অপর্যাপ্ত হইয়া উঠে।

কার্যকালে দেখিল, সহজ সুখ সহজ নহে। যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা যদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আর কোনোমতেই কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় থাকে না।

ভূপতি কোনোমতেই চারুর সঙ্গে বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না। ইহাতে সে নিজেকেই দোষ দিল। ভাবিল, 'বারো বৎসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া, স্ত্রীর সঙ্গে কী করিয়া গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছি।' সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে যায়—সে দুই-একটা কথা বলে, চারু দুই-একটা কথা বলে, তার পরে কী বলিবে ভূপতি কোনোমতেই ভাবিয়া পায় না। নিজের এই অক্ষমতায় স্ত্রীর কাছে সে লজ্জা বোধ করিতে থাকে। স্ত্রীকে লইয়া গল্প করা সে এতই সহজ মনে করিয়াছিল অথচ মূঢ়ের নিকট ইহা এতই শক্ত। সভাস্থলে বক্তৃতা করা ইহার চেয়ে সহজ।

যে সন্ধ্যাবেলাকে ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণয়ে আদরে রমণীয় করিয়া তুলিবে কল্পনা করিয়াছিল সেই সন্ধ্যাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বরূপ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চেষ্টাপূর্ণ মৌনের পর ভূপতি মনে করে 'উঠিয়া যাই'—কিন্তু উঠিয়া গেলে চারু কী মনে করিবে এই ভাবিয়া উঠিতেও পারে না। বলে, "চারু, তাস খেলবে?" চারু অন্য কোনো গতি না দেখিয়া বলে, "আচ্ছা।" বলিয়া অনিচ্ছাক্রমে তাস পাড়িয়া আনে, নিতান্ত ভুল করিয়া অনায়াসেই হারিয়া যায়—সে খেলায় কোনো সুখ থাকে না।

ভূপতি অনেক ভাবিয়া একদিন চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, মন্দাকে আনিয়া নিলে হয় না? তুমি নিতান্ত একলা পড়েছ।"

চারু মন্দার নাম শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "না, মন্দাকে আমার দরকার নেই।"

ভূপতি হাসিল। মনে মনে খুশি হইল। সাধ্বীরা যেখানে সতীধর্মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্য রাখিতে পারে না।

বিদ্বেষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া চারু ভাবিল, মন্দা থাকিলে সে হয়তো ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে। ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সুখ চায় সে তাহা কোনোমতে দিতে পারিতেছে না, ইহা চারু অনুভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর-সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র চারুর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে, এই একাগ্র চেষ্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া চারু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন করিয়া কতদিন কিরূপে চলিবে। ভূপতি আর-কিছু অবলম্বন করে না কেন। আর-একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন। ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্যন্ত চারুকে কখনও করিতে হয় নাই; ভূপতি তাহার কাছে কোনো সেবা দাবি করে নাই, কোনো সুখ প্রার্থনা করে নাই, চারুকে সে সর্বতোভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে নাই; আজ হঠাৎ তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন চারুর নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছু যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। ভূপতির কী চাই, কী হইলে সে তৃপ্ত হয়, তাহা চারু ঠিকমত জানে না এবং জানিলেও তাহা চারুর পক্ষে সহজে আয়ত্তগম্য নহে।

ভূপতি যদি অল্পে অল্পে অগ্রসর হইত তবে চারুর পক্ষে হয়তো এত কঠিন হইত না; কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রে দেউলিয়া হইয়া রিক্ত ভিক্ষাপাত্র পাতিয়া বসাতে সে যেন বিব্রত হইয়াছে।

চারু কহিল, "আচ্ছা, মন্দাকে আনিয়ে নাও, সে থাকলে তোমার দেখাশুনোর অনেক সুবিধে হতে পারবে।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "আমার দেখাশুনো! কিছু দরকার নেই।"

ভূপতি ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল, 'আমি বড়ো নীরস লোক, চারুকে কিছুতেই আমি সুখী করিতে পারিতেছি না।'

এই ভাবিয়া সে সাহিত্য লইয়া পড়িল। বন্ধুরা কখনও বাড়ি আসিলে বিস্মিত হইয়া দেখিত, ভূপতি টেনিসন, বাইরন, বঙ্কিমের গল্প, এই-সমস্ত লইয়া আছে। ভূপতির এই অকাল-কাব্যানুরাগ দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে

লাগিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ভাই, বাঁশের ফুলও ধরে, কিন্তু কখন ধরে তার ঠিক নেই।"

একদিন সন্ধ্যাবেলায় শোবার ঘরে বড়ো বাতি জ্বালাইয়া ভূপতি প্রথমে লজ্জায় একটু ইতস্তত করিল ; পরে কহিল, "একটা কিছু প'ড়ে শোনাব?"

চারু কহিল, "শোনাও-না।"

ভূপতি। কী শোনাব।

চারু। তোমার যা ইচ্ছে।

ভূপতি চারুর অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একটু দমিল। তবু সাহস করিয়া কহিল, "টেনিসন থেকে একটা-কিছু তর্জমা করে তোমাকে শোনাই।"

চারু কহিল, "শোনাও।"

সমস্তই মাটি হইল। সংকোচ ও নিরুৎসাহে ভূপতির পড়া বাধিয়া যাইতে লাগিল, ঠিকমত বাংলা প্রতিশব্দ জোগাইল না। চারুর শূন্য দৃষ্টি দেখিয়া বোঝা গেল, সে মন দিতেছে না। সেই দীপালোকিত ছোটো ঘরটি, সেই সন্ধ্যাবেলাকার নিভৃত অবকাশটুকু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না।

ভূপতি আরও দুই-একবার এই ভ্রম করিয়া অবশেষে স্ত্রীর সহিত সাহিত্যচর্চার চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যেমন গুরুতর আঘাতে স্নায়ু অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা বেদনা টের পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব চারু ভালো করিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। নিকুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন্ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে— দিনের পর দিন যাইতেছে, মরুপ্রান্তর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না।

ঘুম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে— মনে পড়ে, অমল নাই। সকালে যখন সে বারান্দায় পান সাজিতে বসে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই মনে হয়, অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক-এক সময় অন্যমনস্ক হইয়া বেশি পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে, বেশি পান খাইবার লোক নাই। যখনই ভাঁড়ারঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয়, অমলের জন্য জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অধৈর্যে অন্তঃপুরের সীমান্তে আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোনো-একটা নূতন বই, নূতন লেখা, নূতন খবর, নূতন কৌতুক প্রত্যাশা করিবার নাই ; কাহারও জন্য কোনো সেলাই করিবার, কোনো লেখা লিখিবার, কোনো শৌখিন জিনিস কিনিয়া রাখিবার নাই।

নিজের অসহ্য কষ্টে ও চাঞ্চল্যে চারু নিজে বিস্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম পীড়নে তাহার ভয় হইল। নিজে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, "কেন। এত কষ্ট

কেন হইতেছে। অমল আমার এতই কী যে তাহার জন্য এত দুঃখ ভোগ করিব। আমার কী হইল, এতদিন পরে আমার এ কী হইল। দাসী চাকর রাস্তার মুটে-মজুরগুলাও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেছে, আমার এমন হইল কেন। ভগবান হরি, আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে।'

কেবলই প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্য হয়, কিন্তু দুঃখের কোনো উপশম হয় না। অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর-বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত যে, কোথাও সে পালাইবার স্থান পায় না।

ভূপতি কোথায় অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদব্যথিত স্নেহশীল মূঢ় কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দেয়।

অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করায় ক্ষান্ত হইল ; হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।

গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত, 'অমল, অমল, অমল!' সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত, "বোঠান, কী বোঠান।" চারু সিক্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত, 'অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন। আমি তো কোনো দোষ করি নাই। তুমি যদি ভালোমুখে বিদায় লইয়া যাইতে তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না।' অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত, 'অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, একদণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।'

এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না, তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা-সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর-কাহারও কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এইরূপে মনের সহিত দ্বন্দ্ববিবাদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে

লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত চারু তখন ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের ধুলা সীমন্তে তুলিয়া লইত। সেবাশুশ্রূষায় গৃহকর্মে স্বামীর লেশমাত্র ইচ্ছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না। আশ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোনো-প্রকার অযত্নে ভূপতি দুঃখিত হইত জানিয়া চারু তাহাদের প্রতি আতিথ্যে তিলমাত্র ত্রুটি ঘটিতে দিত না। এইরূপে সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া ভূপতির উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাইয়া চারুর দিন শেষ হইয়া যাইত।

এই সেবা যত্নে ভগ্নশ্রী ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল। স্ত্রীর সহিত পূর্বে যেন তাহার নববিবাহ হয় নাই, এতদিন পরে যেন হইল। সাজসজ্জায় হাস্যে পরিহাসে বিকশিত হইয়া সংসারের সমস্ত দুর্ভাবনাকে ভূপতি মনের এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। রোগ-আরামের পর যেমন ক্ষুধা বাড়িয়া উঠে, শরীরে ভোগ-শক্তির বিকাশকে সচেতনভাবে অনুভব করা যায়, ভূপতির মনে এতকাল পরে সেইরূপ একটা অপূর্ব এবং প্রবল ভাবাবেশের সঞ্চার হইল। বন্ধুদিগকে, এমন-কি, চারুকে লুকাইয়া ভূপতি কেবল কবিতা পড়িতে লাগিল। মনে মনে কহিল, 'কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দুঃখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি।'

ভূপতি চারুকে বলিল, "চারু, তুমি আজকাল লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ কেন।"

চারু বলিল, "ভারি তো আমার লেখা!"

ভূপতি। সত্যি কথা বলছি, তোমার মতো অমন বাংলা এখনকার লেখকদের মধ্যে আমি তো আর কারও দেখি নি। 'বিশ্ববন্ধু'তে যা লিখেছিল আমারও ঠিক তাই মত।

চারু। আঃ, থামো।

ভূপতি "এই দেখো-না" বলিয়া একখণ্ড 'সরোরুহ' বাহির করিয়া চারু ও অমলের ভাষার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। চারু আরক্তমুখে ভূপতির হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া অঞ্চলের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।

ভূপতি মনে মনে ভাবিল, 'লেখার সঙ্গী একজন না থাকিলে লেখা বাহির হয় না; রোসো, আমাকে লেখাটা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে চারুরও লেখার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিব।'

ভূপতি অত্যন্ত গোপনে খাতা লইয়া লেখা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। অভিধান দেখিয়া পুনঃপুনঃ কাটিয়া, বারবার কাপি করিয়া ভূপতির বেকার অবস্থার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। এত কষ্টে, এত চেষ্টায় তাহাকে লিখিতে হইতেছে যে, সেই বহুদুঃখের রচনাগুলির প্রতি ক্রমে তাহার বিশ্বাস ও মমতা জন্মিল।

অবশেষে একদিন তাহার লেখা আর-একজনকে দিয়া নকল করাইয়া ভূপতি স্ত্রীকে লইয়া দিল। কহিল, "আমার এক বন্ধু নতুন লিখতে আরম্ভ করেছে। আমি তো কিছু বুঝি নে, তুমি একবার পড়ে দেখো দেখি তোমার কেমন লাগে।"

খাতাখানা চারুর হাতে দিয়া সাধ্বসে ভূপতি বাহিরে চলিয়া গেল। সরল ভূপতির এই ছলনাটুকু চারুর বুঝিতে বাকি রহিল না।

পড়িল; লেখার ছাঁদ এবং বিষয় দেখিয়া একটুখানি হাসিল। হায়! চারু তাহার স্বামীকে ভক্তি করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছে, সে কেন এমন ছেলেমানুষি করিয়া পূজার অর্ঘ্য ছড়াইয়া ফেলিতেছে। চারুর কাছে বাহবা আদায় করিবার জন্য

তাহার এত চেষ্টা কেন। সে যদি কিছুই না করিত, চারুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সর্বদাই তাহার যদি প্রয়াস না থাকিত, তবে স্বামীর পূজা চারুর পক্ষে সহজসাধ্য হইত। চারুর একান্ত ইচ্ছা, ভূপতি কোনো অংশেই নিজেকে চারুর অপেক্ষা ছোটো না করিয়া ফেলে।

চারু খাতাখানা মুড়িয়া বালিশে হেলান দিয়া দূরের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। অমলও তাহাকে নূতন লেখা পড়িবার জন্য আনিয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলায় উৎসুক ভূপতি শয়নগৃহের সম্মুখবর্তী বারান্দায় ফুলের টব-পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

চারু আপনি বলিল, "এ কি তোমার বন্ধুর প্রথম লেখা।"

ভূপতি কহিল, "হাঁ।"

চারু। এত চমৎকার হয়েছে—প্রথম লেখা ব'লে মনেই হয় না।

ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেনামি লেখাটায় নিজের নামজারি করা যায় কী উপায়ে।

ভূপতির খাতা ভয়ংকর দ্রুতগতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। নাম প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিলাত হইতে চিঠি আসিবার দিন কবে, এ খবর চারু সর্বদাই রাখিত। প্রথমে এডেন হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল, তাহাতে অমল বউঠানকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে; সুয়েজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল, বউঠান তাহার মধ্যেও প্রণাম পাইল। মাল্টা হইতে চিঠি পাওয়া গেল, তাহাতেও পুনশ্চ-নিবেদনে বউঠানের প্রণাম আসিল।

চারু অমলের একখানা চিঠিও পাইল না। ভূপতির চিঠিগুলি চাহিয়া লইয়া উলটিয়া পালটিয়া বারবার করিয়া পড়িয়া দেখিল—প্রণামজ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও তাহার সম্বন্ধে আভাসমাত্রও নাই।

চারু এই কয়দিন যে-একটি শান্ত বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছায়ার আশ্রয় লইয়াছিল অমলের এই উপেক্ষায় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে তাহার হৃৎপিণ্ডটা লইয়া আবার যেন ছেঁড়াছেঁড়ি আরম্ভ হইল। তাহার সংসারের কর্তব্যস্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকম্পের আন্দোলন জাগিয়া উঠিল।

এখন ভূপতি এক-একদিন অর্ধরাত্রে উঠিয়া দেখে, চারু বিছানায় নাই। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখে, চারু দক্ষিণের ঘরের জানালায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলে, "ঘরে আজ যে গরম, তাই একটু বাতাসে এসেছি।"

ভূপতি উদ্‌বিগ্ন হইয়া বিছানায় পাখা-টানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, এবং চারুর স্বাস্থ্যভঙ্গ আশঙ্কা করিয়া সর্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল। চারু হাসিয়া বলিত, "আমি বেশ আছি, তুমি কেন মিছামিছি ব্যস্ত হও।" এই হাসিটুকু ফুটাইয়া তুলিতে তাহার বক্ষের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত।

অমল বিলাতে পৌঁছিল। চারু স্থির করিয়াছিল, পথে তাহাকে স্বতন্ত্র চিঠি

লিখিবার যথেষ্ট সুযোগ হয়তো ছিল না, বিলাতে পৌঁছিয়া অমল লম্বা চিঠি লিখিবে। কিন্তু সে লম্বা চিঠি আসিল না।

প্রত্যেক মেল আসিবার দিনে চারু তাহার সমস্ত কাজকর্ম-কথাবার্তার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ছটফট করিতে থাকিত। পাছে ভূপতি বলে "তোমার নামে চিঠি নাই" এইজন্য সাহস করিয়া ভূপতিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

এমন অবস্থায় একদিন চিঠি আসিবার দিনে ভূপতি মন্দগমনে আসিয়া মৃদুহাস্যে কহিল, "একটা জিনিস আছে, দেখবে?"

চারু ব্যস্তসমস্ত চমকিত হইয়া কহিল, "কই, দেখাও।"

ভূপতি পরিহাসপূর্বক দেখাইতে চাহিল না।

চারু অধীর হইয়া উঠিয়া ভূপতির চাদরের মধ্য হইতে বাঞ্ছিত পদার্থ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। সে মনে মনে ভাবিল, 'সকাল হইতেই আমার মন বলিতেছে, আজ আমার চিঠি আসিবেই—এ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।'

ভূপতির পরিহাসস্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল; সে চারুকে এড়াইয়া খাটের চারি দিকে ফিরিতে লাগিল।

তখন চারু একান্ত বিরক্তির সহিত খাটের উপর বসিয়া চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া তুলিল।

চারুর একান্ত আগ্রহে ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া চাদরের ভিতর হইতে নিজের রচনার খাতাখানা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চারুর কোলে দিয়া কহিল, "রাগ কোরো না। এই নাও।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অমল যদিও ভূপতিকে জানাইয়াছিল যে, পড়াশুনার তাড়ায় সে দীর্ঘকাল পত্র লিখিতে সময় পাইবে না, তবু দুই-এক মেল তাহার পত্র না আসাতে সমস্ত সংসার চারুর পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ কথার মধ্যে চারু অত্যন্ত উদাসীনভাবে শান্তস্বরে তাহার স্বামীকে কহিল, "আচ্ছা দেখো, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ ক'রে জানলে হয় না, অমল কেমন আছে?"

ভূপতি কহিল, "দুই হপ্তা আগে তার চিঠি পাওয়া গেছে, সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।"

চারু। ওঃ, তবে কাজ নেই। আমি ভাবছিলুম, বিদেশে আছে, যদি ব্যামোস্যামো হয়— বলা তো যায় না।

ভূপতি। নাঃ, তেমন কোনো ব্যামো হলে খবর পাওয়া যেত। টেলিগ্রাফ করাও তো কম খরচা নয়।

চারু। তাই নাকি। আমি ভেবেছিলুম, বড়োজোর এক টাকা কি দু টাকা লাগবে।

ভূপতি। বল কী, প্রায় একশো টাকার ধাক্কা।

চারু। তা হলে তো কথাই নেই!

দিন-দুয়েক পরে চারু ভূপতিকে বলিল, "আমার বোন এখন চুঁচড়োয় আছে,

আজ একবার তার খবর নিয়ে আসতে পার?"

ভূপতি। কেন। কোনো অসুখ করেছে নাকি।

চারু। না, অসুখ না, জানই তো তুমি গেলে তারা কত খুশি হয়।

ভূপতি চারুর অনুরোধে গাড়ি চড়িয়া হাবড়া-স্টেশন-অভিমুখে ছুটিল। পথে এক সার গোরুর গাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।

এমন সময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিয়া তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাফ লইয়া দিল। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখিয়া ভূপতি ভারি ভয় পাইল। ভাবিল, অমলের হয়তো অসুখ করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে খুলিয়া দেখিল টেলিগ্রামে লেখা আছে, "আমি ভালো আছি।"

ইহার অর্থ কী। পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রী-পেড টেলিগ্রামের উত্তর।

হাওড়া যাওয়া হইল না। গাড়ি ফিরাইয়া ভূপতি বাড়ি আসিয়া স্ত্রীর হাতে টেলিগ্রাম দিল। ভূপতির হাতে টেলিগ্রাম দেখিয়া চারুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

ভূপতি কহিল, "আমি এর মানে কিছুই বুঝতে পারছি নে।" অনুসন্ধানে ভূপতি মানে বুঝিল। চারু নিজের গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিল।

ভূপতি ভাবিল, এত করিবার তো দরকার ছিল না। আমাকে একটু অনুরোধ করিয়া ধরিলেই তো আমি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতাম, চাকরকে দিয়া গোপনে বাজারে গহনা বন্ধক দিতে পাঠানো— এ তো ভালো হয় নাই।

থাকিয়া থাকিয়া ভূপতির মনে কেবলই এই প্রশ্ন হইতে লাগিল, চারু কেন এত বাড়াবাড়ি করিল। একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্যভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বেদনা কোনোমতে ছাড়িল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অমলের শরীর ভালো আছে, তবু সে চিঠি লেখে না! একেবারে এমন নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কী করিয়া। একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মধ্যে সমুদ্র— পার হইবার কোনো পথ নাই। নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ, নিরুপায় বিচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন সকল প্রতিকারের অতীত বিচ্ছেদ।

চারু আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম পড়িয়া থাকে, সকল বিষয়েই ভুল হয়, চাকরবাকর চুরি করে; লোকে তাহার দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানা-প্রকার কানাকানি করিতে থাকে, কিছুতেই তার চেতনামাত্র নাই।

এমনি হইল, হঠাৎ চারু চমকিয়া উঠিত, কথা কহিতে কহিতে তাহাকে কাঁদিবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইত, অমলের নাম শুনিবামাত্র তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত।

অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল— সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।

মাঝে যে কয়দিন আনন্দের উন্মেষে ভূপতি অন্ধ হইয়াছিল সেই কয়দিনের স্মৃতি তাহাকে লজ্জা দিতে লাগিল। যে অনভিজ্ঞ বানর জহর চেনে না তাহাকে ঝুটা

পাথর দিয়া কি এমনি করিয়াই ঠকাইতে হয়।

চারুর যে-সকল কথায় আদরে ব্যবহারে ভূপতি ভুলিয়াছিল সেগুলো মনে আসিয়া তাহাকে 'মূঢ়, মূঢ়, মূঢ়' বলিয়া বেত মারিতে লাগিল।

অবশেষে তাহার বহু কষ্টের, বহু যত্নের রচনাগুলির কথা যখন মনে উদয় হইল তখন ভূপতি ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিল। অঙ্কুশতাড়িতের মতো চারুর কাছে দ্রুতপদে গিয়া ভূপতি কহিল, "আমার সেই লেখাগুলো কোথায়।"

চারু কহিল, "আমার কাছেই আছে।"

ভূপতি কহিল, "সেগুলো দাও।"

চারু তখন ভূপতির জন্য ডিমের কচুরি ভাজিতেছিল; কহিল, "তোমার কি এখনই চাই।"

ভূপতি কহিল, "হাঁ, এখনই চাই।"

চারু কড়া নামাইয়া রাখিয়া আলমারি হইতে খাতা ও কাগজগুলি বাহির করিয়া আনিল।

ভূপতি অধীরভাবে তাহার হাত হইতে সমস্ত টানিয়া লইয়া খাতাপত্র একেবারে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চারু ব্যস্ত হইয়া সেগুলো বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এ কী করলে।"

ভূপতি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গর্জন করিয়া বলিল, "থাক্।"

চারু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত লেখা নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।

চারু বুঝিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কচুরি ভাজা অসমাপ্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

চারুর সম্মুখে খাতা নষ্ট করিবার সংকল্প ভূপতির ছিল না। কিন্তু ঠিক সামনেই আগুনটা জ্বলিতেছিল, দেখিয়া কেমন যেন তাহার খুন চাপিয়া উঠিল। ভূপতি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবঞ্চিত নির্বোধের সমস্ত চেষ্টা বঞ্চনাকারিণীর সম্মুখেই আগুনে ফেলিয়া দিল।

সমস্ত ছাই হইয়া গেলে ভূপতির আকস্মিক উন্মাদমতা যখন শান্ত হইয়া আসিল তখন চারু আপন অপরাধের বোঝা বহন করিয়া যেরূপ গভীর বিষাদে নীরব নতমুখে চলিয়া গেল তাহা ভূপতির মনে জাগিয়া উঠিল— সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ভূপতি বিশেষ করিয়া ভালোবাসে বলিয়াই চারু স্বহস্তে যত্ন করিয়া খাবার তৈরি করিতেছিল।

ভূপতি বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল তাহার জন্য চারুর এই যে-সকল অশ্রান্ত চেষ্টা, এই যে-সমস্ত প্রাণপণ বঞ্চনা, ইহা অপেক্ষা সকরুণ ব্যাপার জগৎসংসারে আর কী আছে। এই-সমস্ত বঞ্চনা এ তো ছলনাকারিণীর হেয় ছলনামাত্র নহে; এই ছলনাগুলির জন্য ক্ষতহৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা চতুর্গুণ বাড়াইয়া অভাগিনীকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ভূপতি মনে মনে কহিল, 'হায় অবলা, হায় দুঃখিনী! দরকার ছিল না, আমার এ-সব কিছুই দরকার ছিল না। এতকাল আমি তো ভালোবাসা না পাইয়াও 'পাই নাই' বলিয়া জানিতেও পারি নাই— আমার তো কেবল প্রুফ দেখিয়া কাগজ লিখিয়াই চলিয়া গিয়াছিল; আমার জন্য এত করিবার কোনো দরকার ছিল না।'

তখন আপনার জীবনকে চারুর জীবন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া— ডাক্তার যেমন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখে, ভূপতি তেমনি করিয়া নিঃসম্পর্ক লোকের মতো চারুকে দূর হইতে দেখিল। ঐ একটি ক্ষীণশক্তি নারীর হৃদয় কী প্রবল সংসারের দ্বারা চারি দিকে আক্রান্ত হইয়াছে। এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে— অথচ এই অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধেয় প্রত্যহপুঞ্জীভূত দুঃখভার বহন করিয়া নিতান্ত সহজ লোকের মতো, তাহার সুস্থচিত্ত প্রতিবেশিনীদের মতো, তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

ভূপতি তাহার শয়নগৃহে গিয়া দেখিল, জানালার গরাদে ধরিয়া অশ্রুহীন অনিমেষ দৃষ্টিতে চারু বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। ভূপতি আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল— কিছু বলিল না, তাহার মাথার উপরে হাত রাখিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুরা ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কী। এত ব্যস্ত কেন।"

ভূপতি কহিল, "খবরের কাগজ—"

বন্ধু। আবার খবরের কাগজ? ভিটেমাটি খবরের কাগজে মুড়ে গঙ্গার জলে ফেলতে হবে নাকি।

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করছি নে।

বন্ধু। তবে?

ভূপতি। মৈশুরে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তার সম্পাদক করেছে।

বন্ধু। বাড়িঘর ছেড়ে একেবারে মৈশুরে যাবে? চারুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ?

ভূপতি। না, মামারা এখানে এসে থাকবেন।

বন্ধু। সম্পাদকি নেশা তোমার আর কিছুতেই ছুটল না!

ভূপতি। মানুষের যা-হোক-একটা-কিছু নেশা চাই।

বিদায়কালে চারু জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসবে।"

ভূপতি কহিল, "তোমার যদি একলা বোধ হয়, আমাকে লিখো, আমি চলে আসব।"

বলিয়া বিদায় লইয়া ভূপতি যখন দ্বারের কাছ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল তখন হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না।"

ভূপতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুষ্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চারুর হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চারুর নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি বুঝিল, অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে, চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়।— 'কিন্তু, আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পালাইব। যে স্ত্রী হৃদয়ের

মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা, সে আমি কতদিন পারিব। আরও কত বৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ইঁটকাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?'

ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল, "না, সে আমি পারিব না।"

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মতো শুষ্ক সাদা হইয়া গেল, চারু মুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, "চলো, চারু, আমার সঙ্গেই চলো!"

চারু বলিল, "না, থাক্।"

বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮

দর্পহরণ

কী করিয়া গল্প লিখিতে হয় তাহা সম্প্রতি শিখিয়াছি। বঙ্কিমবাবু এবং সার ওয়াল্‌টার স্কট পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই। ফল কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল, আমার এই প্রথম গল্পেই সেই কথাটা লিখিতে বসিলাম।

আমার পিতার মতামত অনেকরকম ছিল ; কিন্তু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোনো মত তিনি কেতাব বা স্বাধীনবুদ্ধি হইতে গড়িয়া তোলেন নাই। আমার বিবাহ যখন হয় তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছি ; তখন আমি কলেজে থার্ড্‌ ইয়ারে পড়ি— এবং তখন আমার চিত্তক্ষেত্রে যৌবনের প্রথম দক্ষিণবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়া কত অলক্ষ্য দিক হইতে কত অনির্বচনীয় গীতে এবং গন্ধে, কম্পনে এবং মর্মরে আমার তরুণ জীবনকে উৎসুক করিয়া তুলিতেছিল, তাহা এখনও মনে হইলে বুকের ভিতরে দীর্ঘনিশ্বাস ভরিয়া উঠে।

তখন আমার মা ছিলেন না— আমাদের শূন্য সংসারের মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপন করিবার জন্য আমার পড়াশুনা শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়াই, বাবা বারো বৎসরের বালিকা নির্ঝরিণীকে আমাদের ঘরে আনিলেন।

নির্ঝরিণী নামটি হঠাৎ পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সংকোচবোধ করিতেছি। কারণ, তাঁহাদের অনেকেরই বয়স হইয়াছে— অনেকে ইস্কুলমাস্টারি মুন্‌সেফি এবং কেহ কেহ বা সম্পাদকিও করেন— তাঁহারা আমার শ্বশুরমহাশয়ের নামনির্বাচনরুচির অতিমাত্র লালিত্য এবং নূতনত্বে হাঁসিবেন, এমন আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমি তখন অর্বাচীন ছিলাম, বিচারশক্তির কোনো উপদ্রব ছিল না, তাই নামটি বিবাহের সম্বন্ধ হইবার সময়েই যেমনি শুনিলাম অমনি—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

এখন বয়স হইয়াছে এবং ওকালতি ছাড়িয়া মুন্‌সেফি-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তবু হৃদয়ের মধ্যে ঐ নামটি পুরাতন বেহালার আওয়াজের মতো আরও বেশি মোলায়েম হইয়া বাজিতেছে।

প্রথম বয়সের প্রথম প্রেম অনেকগুলি ছোটোখাটো বাধার দ্বারা মধুর। লজ্জার বাধা, ঘরের লোকের বাধা, অনভিজ্ঞতার বাধা, এইগুলির অন্তরাল হইতে প্রথম পরিচয়ের যে আভাস দিতে থাকে তাহা ভোরের আলোর মতো রঙিন ; তাহা মধ্যাহ্নের মতো সুস্পষ্ট, অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে।

আমাদের সেই নবীন পরিচয়ের মাঝখানে বাবা বিন্ধ্যাগিরির মতো দাঁড়াইলেন। তিনি আমাকে হস্টেলে নির্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার বউমাকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার এই গল্পের শুরু হইল সেইখানে।

শ্বশুরমশায় কেবল তাঁহার কন্যার নামকরণ করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনি তাহাকে শিক্ষাদানেরও প্রভূত আয়োজন করিয়াছিলেন। এমন-কি, উপক্রমণিকা তাহার মুখস্থ শেষ হইয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে হেমবাবুর টীকা তাহার প্রয়োজন হইত না।

হস্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতে নানা উপায়ে বাবাকে লুকাইয়া নববিরহতাপে অত্যন্ত উত্তপ্ত একখানা চিঠি তাহাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে কোটেশন-মার্কা না দিয়া আমাদের নব্য কবিদের কাব্য ছাঁকিয়া অনেক কবিতা ঢালিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম— প্রণয়িনীর কেবল প্রেম আকর্ষণ করাই যথেষ্ট নহে, শ্রদ্ধাও চাই। শ্রদ্ধা পাইতে হইলে বাংলা ভাষায় যেরূপ রচনাপ্রণালীর আশ্রয় লওয়া উচিত সেটা আমার স্বভাবত আসিত না, সেইজন্য মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ। অর্থাৎ, অন্য জহরিরা যে-সকল মণি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার চিঠি তাহা সূত্রের মতো গাঁথিয়া পাঠাইত। কিন্তু, ইহার মধ্যে মণিগুলি অন্যের, কেবলমাত্র সূত্রটুকুই আমার, এ বিনয়টুকু স্পষ্ট করিয়া প্রচার করা আমি ঠিক সংগত মনে করি নাই— কালিদাসও করিতেন না, যদি সত্যই তাঁহার মণিগুলি চোরাই মাল হইত।

চিঠির উত্তর যখন পাইলাম তাহার পর হইতে যথাস্থানে কোটেশন-মার্কা দিতে আর কার্পণ্য করি নাই। এটুকু বেশ বোঝা গেল, নববধূ বাংলা ভাষাটি বেশ জানেন। তাঁহার চিঠিতে বানান-ভুল ছিল কি না তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই, কিন্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা যায় না, সেটুকু আন্দাজে বুঝিতে পারি।

স্ত্রীর বিদ্যা দেখিয়া সৎস্বামীর যতটুকু গর্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত তাহা আমার হয় নাই এমন কথা বলিলে আমাকে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে, কিন্তু তারই সঙ্গে একটু অন্য ভাবও ছিল। সে ভাবটুকু উচ্চদরের না হইতে পারে; কিন্তু স্বাভাবিক। মুশকিল এই যে, যে উপায়ে আমার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিতাম সেটা বালিকার পক্ষে দুর্গম। সে যেটুকু ইংরাজি জানে তাহাতে বার্ক্‌-মেকলের ছাঁদের চিঠি তাহার উপরে চালাইতে হইলে মশা মারিতে কামান দাগা হইত— মশার কিছুই হইত না, কেবল ধোঁওয়া এবং আওয়াজই সার হইত।

আমার যে তিনটি প্রাণের বন্ধু ছিল তাহাদিগকে আমার স্ত্রীর চিঠি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহারা আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এমন স্ত্রী পাইয়াছ, ইহা তোমার ভাগ্য।" অর্থাৎ, ভাষান্তরে বলিতে গেলে এমন স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামী আমি নই।

নির্ঝরিণীর নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইবার পূর্বেই যে ক'খানি চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম তাহাতে হৃদয়োচ্ছ্বাস যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বানান-ভুলও নিতান্ত অল্প ছিল না। সতর্ক হইয়া লেখা যে দরকার তাহা তখন মনেও করি নাই। সতর্ক হইয়া লিখিলে বানান-ভুল হয়তো কিছু কম পড়িত, কিন্তু হৃদয়োচ্ছ্বাসটাও মারা যাইত।

এমন অবস্থায় চিঠির মধ্যস্থতা ছাড়িয়া মোকাবিলায় প্রেমালাপই নিরাপদ। সুতরাং, বাবা আপিসে গেলেই আমাকে কালেজ পালাইতে হইত। ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই পাঠচর্চায় যে ক্ষতি হইত আলাপচর্চায় তাহা সুদসুদ্ধ পোষণ করিয়া লইতাম। বিশ্বজগতে যে কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না, এক আকারে যাহা ক্ষতি অন্য আকারে তাহা লাভ— বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রেমের পরীক্ষাশালায় বারম্বার যাচাই করিয়া লইয়া একেবারে নিঃসংশয় হইয়াছি।

এমন সময়ে আমার স্ত্রীর জাঠতুত বোনের বিবাহকাল উপস্থিত— আমরা তো যথানিয়মে আইবুড়োভাত দিয়া খালাস, কিন্তু আমার স্ত্রী স্নেহের আবেগে এক

কবিতা রচনা করিয়া লাল কাগজে লাল কালি দিয়া লিখিয়া তাহার ভগিনীকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না। সেই রচনাটি কেমন করিয়া বাবার হস্তগত হইল। বাবা তাঁহার বধূমাতার কবিতায় রচনানৈপুণ্য সম্ভাবসৌন্দর্য প্রসাদগুণ প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত নানা গুণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধুদিগকে দেখাইলেন, তাঁহারাও তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "খাসা হইয়াছে!" নববধূর যে রচনাশক্তি আছে, এ কথা কাহারও অগোচর রহিল না। হঠাৎ এইরূপ খ্যাতিবিকাশে রচয়িত্রীর কর্ণমূল এবং কপোলদ্বয় অরুণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; অভ্যাসক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, কোনো জিনিস একেবারে বিলুপ্ত হয় না— কী জানি, লজ্জার আভাটুকু তাহার কোমল কপোল ছাড়িয়া আমার কঠিন হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কোণে হয়তো আশ্রয় লইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর কর্তব্যে শৈথিল্য করি নাই। অপক্ষপাত সমালোচনার দ্বারা স্ত্রীর রচনার দোষ সংশোধনে আমি কখনোই আলস্য করি নাই। বাবা তাহাকে নির্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত ত্রুটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি। আমি ইংরাজি বড়ো বড়ো লেখকের লেখা দেখাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর একটা-কী লিখিয়াছিল, আমি শেলির স্কাইলার্ক্‌ ও কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল শুনাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জোরে আমিও যেন শেলি ও কীট্‌সের গৌরবের কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার স্ত্রীও ইংরাজি সাহিত্য হইতে ভালো ভালো জিনিস তাহাকে তর্জমা করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিত, আমি গর্বের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম। তখন ইংরাজি সাহিত্যের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমার স্ত্রীর প্রতিভাকে কি ম্লান করি নাই। স্ত্রীলোকের কমনীয়তার পক্ষে এই একটু ছায়ার আচ্ছাদন দরকার, বাবা এবং বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিতেন না— কাজেই আমাকে এই কঠোর কর্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল। নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো হইয়া উঠিলে দুই দণ্ড বাহবা দেওয়া চলে, কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া যায় কী উপায়ে।

আমার স্ত্রীর লেখা বাবা এবং অন্যান্য অনেকে কাগজে ছাপাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নির্ঝরিণী তাহাতে লজ্জাপ্রকাশ করিত— আমি তাহার সে লজ্জা রক্ষা করিয়াছি। কাগজে ছাপিতে দিই নাই, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিতে পারা গেল না।

ইহার কুফল যে কতদূর হইতে পারে, কিছুকাল পরে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তখন উকিল হইয়া আলিপুরে বাহির হই। একটা উইল-কেস লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে খুব জোরের সহিত লড়িতেছিলাম। উইলটি বাংলায় লেখা। স্বপক্ষের অনুকূলে তাহার অর্থ যে কিরূপ স্পষ্ট তাহা বিধিমতে প্রমাণ করিতেছিলাম, এমন সময় বিরোধী পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন, "আমার বিদ্বান বন্ধু যদি তাঁহার বিদুষী স্ত্রীর কাছে এই উইলটি বুঝিয়া লইয়া আসিতেন তবে এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা দ্বারা মাতৃভাষাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেন না।"

চুলায় আগুন ধরাইবার বেলা ফুঁ দিতে দিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হয়, কিন্তু গৃহদাহের আগুন নেবানোই দায়। লোকের ভালো কথা চাপা থাকে, আর

অনিষ্টকর কথাগুলো মুখে মুখে হুহু শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এ গল্পটিও সর্বত্র প্রচারিত হইল। ভয় হইয়াছিল, পাছে আমার স্ত্রীর কানে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে ওঠে নাই— অন্তত এ সম্বন্ধে তাহার কাছ হইতে কোনো আলোচনা কখনও শুনি নাই।

একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি শ্রীমতী নির্ঝরিণী দেবীর স্বামী।" আমি কহিলাম, "আমি তাঁহার স্বামী কি না, সে কথার জবাব দিতে চাহি না, তবে তিনিই আমার স্ত্রী বটেন।" বাহিরের লোকের কাছে স্ত্রীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি নাই।

সেটা যে গৌরবের বিষয় নহে, সে কথা আমাকে আর-এক ব্যক্তি অনাবশ্যক স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। পূর্বেই পাঠকগণ সংবাদ পাইয়াছেন, আমার স্ত্রীর জাঠতুত বোনের বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীটা অত্যন্ত বর্বর দুর্বৃত্ত। স্ত্রীর প্রতি তাহার অত্যাচার অসহ্য। আমি এই পাষণ্ডের নির্দয়াচরণ লইয়া আত্মীয়সমাজে আলোচনা করিয়াছিলাম, সে কথা অনেক বড়ো হইয়া তাহার কানে উঠিয়াছিল। সে তাহার পর হইতে আমার প্রতি লক্ষ করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, নিজের নামে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুরের নামে পর্যন্ত উত্তম-মধ্যম-অধম অনেক-রকম খ্যাতির বিবরণ শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কিন্তু নিজের স্ত্রীর খ্যাতিতে যশস্বী হওয়ার কল্পনা কবির মাথাতেও আসে নাই।

এমন-সব কথা লোকের মুখে মুখে চলিতে আরম্ভ করিলে স্ত্রীর মনে তো দম্ভ জন্মিতেই পারে। বিশেষত বাবার একটা বদ্‌ অভ্যাস ছিল, নির্ঝরিণীর সামনেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কৌতুক করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "হরিশ যে বাংলা চিঠিগুলো লেখে তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও-না কেন, বউমা। আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে 'জগদিন্দ্র' লিখিতে দীর্ঘ ঈ বসাইয়াছে।" শুনিয়া বাবার বউমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এরকম ঠাট্টা ভালো নয়।

স্ত্রীর দম্ভের পরিচয় পাইতে আমার দেরি হইল না। পাড়ার ছেলেদের এক ক্লাব আছে; সেখানে একদিন তাহারা এক বিখ্যাত বাংলা-লেখককে বক্তৃতা দিতে রাজি করিয়াছিল। অপর একটি বিখ্যাত লোককে সভাপতিও ঠিক করা হয়; তিনি বক্তৃতার পূর্বরাত্রে অস্বাস্থ্য জানাইয়া ছুটি লইলেন। ছেলেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। আমার প্রতি ছেলেদের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি কিছু প্রফুল্ল হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, "তা বেশ তো, বিষয়টা কী বলো তো।"

তাহারা কহিল, "প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য।"

আমি কহিলাম, "বেশ হইবে, দুটোই আমি ঠিক সমান জানি।"

পরদিন সভায় যাইবার পূর্বে জলখাবার এবং কাপড়চোপড়ের জন্য স্ত্রীকে কিছু তাড়া দিতে লাগিলাম। নির্ঝরিণী কহিল, "কেন গো, এত ব্যস্ত কেন— আবার কি পাত্রী দেখিতে যাইতেছ।"

আমি কহিলাম, "একবার দেখিয়াই নাকে-কানে খত দিয়াছি; আর নয়।"

"তবে এত সাজসজ্জার তাড়া যে?"

স্ত্রীকে সগর্বে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। শুনিয়া সে কিছুমাত্র উল্লাস প্রকাশ

না করিয়া ব্যাকুলভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? না না, সেখানে তুমি যাইতে পারিবে না।"

আমি কহিলাম, "রাজপুত-নারী যুদ্ধসাজ পরাইয়া স্বামীকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিত— আর বাঙালির মেয়ে কি বক্তৃতাসভাতেও পাঠাইতে পারে না।"

নির্ঝরিণী কহিল, "ইংরাজি বক্তৃতা হইলে আমি ভয় করিতাম না, কিন্তু— থাক্-না, অনেক লোক আসিবে, তোমার অভ্যাস নাই— শেষকালে—"

শেষকালের কথাটা আমিও কি মাঝে মাঝে ভাবি নাই। রামমোহন রায়ের গানটা মনে পড়িতেছিল—

মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

বক্তার বক্তৃতা-অন্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় সভাপতি যদি হঠাৎ 'দৃষ্টিহীন নাড়ী-ক্ষীণ হিমকলেবর' অবস্থায় একেবারে নিরুত্তর হইয়া পড়েন তবে কী গতি হইবে। এই-সকল কথা চিন্তা করিয়া পূর্বোক্ত পলাতক সভাপতিমহাশয়ের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য যে কোনো অংশে ভালো ছিল, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

বুক ফুলাইয়া স্ত্রীকে কহিলাম, "নিঝর, তুমি কি মনে কর—"

স্ত্রী কহিল, "আমি কিছুই মনে করি না, কিন্তু আমার আজ ভারি মাথা ধরিয়া আসিয়াছে, বোধ হয় জ্বর আসিবে, তুমি আজ আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।"

আমি কহিলাম, "সে আলাদা কথা। তোমার মুখটা একটু লাল দেখাইতেছে বটে।"

সেই লালটা সভাস্থলে আমার দুরবস্থা কল্পনা করিয়া লজ্জায়, অথবা আসন্ন জ্বরের আবেশে, সে কথা নিঃসংশয়ে পর্যালোচনা না করিয়াই আমি ক্লাবের সেক্রেটারিকে স্ত্রীর পীড়ার কথা জানাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলাম।

বলা বাহুল্য, স্ত্রীর জ্বরভাব অতি সত্বর ছাড়িয়া গেল। আমার অন্তরাত্মা কহিতে লাগিল, 'আর সব ভালো হইল, কিন্তু তোমার বাংলা বিদ্যা সম্বন্ধে তোমার স্ত্রীর মনে এই-যে সংস্কার, এটা ভালো নয়। তিনি নিজেকে মস্ত বিদুষী বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন— কোন্‌দিন-বা মশারির মধ্যে নাইট-স্কুল খুলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেষ্টা করিবেন।'

আমি কহিলাম, 'ঠিক কথা। এই বেলা দর্প চূর্ণ না করিলে ক্রমে আর তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।'

সেই রাত্রেই তাহার সঙ্গে একটু খিটিমিটি বাধাইলাম। অল্পশিক্ষা যে কিরূপ ভয়ংকর জিনিস, পোপের কাব্য হইতে তাহার উদাহরণ উদ্ধার করিয়া তাহাকে শুনাইলাম। ইহাও বুঝাইলাম, কোনোমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল তাহা নহে— আসল জিনিসটা হইতেছে আইডিয়া। কাশিয়া বলিলাম, 'সেটা উপক্রমণিকায় পাওয়া যায় না, সেটার জন্য মাথা চাই।' মাথা যে কোথায় আছে, সে কথা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু তবু বোধ হয়, কথাটা অস্পষ্ট ছিল না। আমি কহিলাম, "লিখিবার যোগ্য কোনো লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক লেখে নাই।"

শুনিয়া নির্ঝরিণীর মেয়েলি তার্কিকতা চড়িয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না। মেয়েরা এতই কি হীন।"

আমি কহিলাম, "রাগ করিয়া কী করিবে। দৃষ্টান্ত দেখাও-না।"

নির্ঝরিণী কহিল, "তোমার মতো যদি আমার ইতিহাস পড়া থাকিত তবে নিশ্চয়ই আমি ঢের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম।"

এ কথাটা শুনিয়া আমার মন একটু নরম হইয়াছিল, কিন্তু তর্ক এইখানেই শেষ হয় নাই। ইহার শেষ যেখানে সেটা পরে বর্ণনা করা যাইতেছে।

'উদ্দীপনা' বলিয়া মাসিক পত্রে ভালো গল্প লিখিবার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। কথা এই স্থির হইল, আমরা দুইজনেই সেই কাগজে দুটা গল্প লিখিয়া পাঠাইব, দেখি কাহার ভাগ্যে পুরস্কার জোটে।

রাত্রের ঘটনা তো এই। পরদিন প্রভাতের আলোকে বুদ্ধি যখন নির্মল হইয়া আসিল তখন দ্বিধা জন্মিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ অবসর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না; যেমন করিয়া হউক, জিতিতেই হইবে। হাতে তখনও দুই মাস সময় ছিল।

প্রকৃতিবাদ অভিধান কিনিলাম; বঙ্কিমের বইগুলাও সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু বঙ্কিমের লেখা আমার চেয়ে আমার অন্তঃপুরে অধিক পরিচিত, তাই সে মহদাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংরাজি গল্পের বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগুলা গল্প ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা প্লট দাঁড় করাইলাম। প্লটটা খুবই চমৎকার হইয়াছিল, কিন্তু মুশকিল এই হইল, বাংলা-সমাজে সে-সকল ঘটনা কোনো অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না। অতিপ্রাচীনকালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গল্পের ভিত্তি ফাঁদিলাম; সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত বিচার একেবারে নিরাকৃত হওয়াতে কলমের মুখে কোনো বাধা রহিল না। উদ্দাম প্রণয়, অসম্ভব বীরত্ব, নিদারুণ পরিণাম, সার্কাসের ঘোড়ার মতো আমার গল্প ঘিরিয়া অদ্ভুত গতিতে ঘুরিতে লাগিল।

রাত্রে আমার ঘুম হইত না; দিনে আহারকালে ভাতের থালা ছাড়িয়া মাছের ঝোলের বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া নির্ঝরিণী আমাকে অনুনয় করিয়া বলিল, "আমার মাথা খাও, তোমাকে আর গল্প লিখিতে হইবে না— আমি হার মানিতেছি।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কি মনে করিতেছ, আমি দিনরাত্রি কেবল গল্প ভাবিয়াই মরিতেছি। কিছুই না। আমাকে মক্কেলের কথা ভাবিতে হয়—তোমার মতো গল্প এবং কবিতা চিন্তা করিবার অবসর পড়িয়া থাকিলে আমার ভাবনা কী ছিল।"

যাহা হউক, ইংরাজি প্লট এবং সংস্কৃত অভিধানে মিলাইয়া একটা গল্প খাড়া করিলাম। মনের কোণে ধর্মবুদ্ধিতে একটু পীড়াবোধ করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম, বেচারা নিঝর ইংরাজি সাহিত্য পড়ে নাই, তাহার ভাব সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ; আমার সঙ্গে তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই।

উপসংহার

লেখা পাঠানো হইয়াছে। বৈশাখের সংখ্যায় পুরস্কারযোগ্য গল্পটি বাহির হইবে। যদিও আমার মনে কোনো আশঙ্কা ছিল না, তবু সময় যত নিকটবর্তী হইল মনটা তত

চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বৈশাখ মাসও আসিল। একদিন আদালত হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়া আসিয়া খবর পাইলাম, বৈশাখের 'উদ্দীপনা' আসিয়াছে, আমার স্ত্রী তাঁহা পাইয়াছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে অন্তঃপুরে গেলাম। শয়নঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী কড়ায় আগুন করিয়া একটা বই পুড়াইতেছে। দেয়ালের আয়নায় নির্ঝরিণীর মুখের যে প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল, কিছু পূর্বে সে অশ্রুবর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

মনে আনন্দ হইল, কিন্তু সেইসঙ্গে একটু দয়াও হইল। আহা, বেচারার গল্পটি 'উদ্দীপনা'য় বাহির হয় নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত দুঃখ! স্ত্রীলোকের অহংকারে এত অল্পেই ঘা পড়ে।

আবার আমি নিঃশব্দপদে ফিরিয়া গেলাম। উদ্দীপনা-আপিস হইতে নগদ দাম দিয়া একটা কাগজ কিনিয়া আনাইলাম। আমার লেখা বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য কাগজ খুলিলাম। সূচিপত্রে দেখিলাম, পুরস্কারযোগ্য গল্পটির নাম 'বিক্রমনারায়ণ' নহে, তাহার নাম 'ননদিনী', এবং তাহার রচয়িতার নাম—এ কী! এ যে নির্ঝরিণী দেবী!

বাংলাদেশে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাহারও নাম নির্ঝরিণী আছে কি। গল্পটি খুলিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নির্ঝরের সেই হতভাগিনী জাঠতুত বোনের বৃত্তান্তটিই ডালপালা দিয়া বর্ণিত। একেবারে ঘরের কথা—সাদা ভাষা, কিন্তু সমস্ত ছবির মতো চোখে পড়ে এবং চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। এ নির্ঝরিণী যে আমারই 'নিঝর' তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন আমার শয়নঘরের সেই দাহদৃশ্য এবং ব্যথিত রমণীর সেই ম্লান মুখ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রে শুইতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "নিঝর, যে খাতায় তোমার লেখাগুলি আছে সেটা কোথায়।"

নির্ঝরিণী কহিল, "কেন, সে লইয়া তুমি কী করিবে।"

আমি কহিলাম, "আমি ছাপিতে দিব।"

নির্ঝরিণী। আহা, আর ঠাট্টা করিতে হইবে না।

আমি। না, ঠাট্টা করিতেছি না। সত্যই ছাপিতে দিব।

নির্ঝরিণী। সে কোথায় গেছে, আমি জানি না।

আমি কিছু জেদের সঙ্গেই বলিলাম, "না নিঝর, সে কিছুতেই হইবে না। বলো, সেটা কোথায় আছে।"

নির্ঝরিণী কহিল, "সত্যই সেটা নাই।"

আমি। কেন, কী হইল।

নির্ঝরিণী। সে আমি পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, "অ্যাঁ, সে কী! কবে পুড়াইলে।"

নির্ঝরিণী। আজই পুড়াইয়াছি। আমি কি জানি না যে, আমার লেখা ছাই লেখা। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা করিয়া প্রশংসা করে।

ইহার পর হইতে এ পর্যন্ত নিঝরকে সাধ্যসাধনা করিয়াও একছত্র লিখাইতে পারি নাই। ইতি শ্রীহরিশ্চন্দ্র হালদার।

উপরে যে গল্পটি লেখা হইয়াছে উহার পনেরো-আনাই গল্প। আমার স্বামী যে বাংলা কত অল্প জানেন, তাহা তাঁহার রচীত উপন্যার্শটি পড়িলেই কাহারো বুঝিতে বাকি থাকিবে না। ছিছি নিজের স্ত্রিকে লইয়া এমনি করিয়া কি গল্প বানাইতে হয়? ইতি শ্রীনির্ঝরিনি দেবী।

স্ত্রীলোকের চাতুরী সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী শাস্ত্রে-অশাস্ত্রে অনেক কথা আছে— তাহাই স্মরণ করিয়া পাঠকেরা ঠকিবেন না। আমার রচনাটুকুর ভাষা ও বানান কে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে কথা আমি বলিব না—না বলিলেও বিজ্ঞ পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন। আমার স্ত্রী যে কয়-লাইন লিখিয়াছেন তাহার বানান-ভুলগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, সেগুলি ইচ্ছাকৃত; তাঁহার স্বামী যে বাংলায় পরমপণ্ডিত এবং গল্পটা যে আষাঢ়ে, ইহাই প্রমাণ করিবার এই অতি সহজ উপায় তিনি বাহির করিয়াছেন—এইজন্যই কালিদাস লিখিয়াছেন, স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম্। তিনি স্ত্রী-চরিত্র বুঝিতেন। আমিও সম্প্রতি চোখ-ফোটার পর হইতে বুঝিতে শুরু করিয়াছি। কালে হয়তো কালিদাস হইয়া উঠিতেও পারিব। কালিদাসের সঙ্গে আরও একটু সাদৃশ্য দেখিতেছি। শুনিয়াছি, কবিবর নববিবাহের পর তাঁহার বিদুষী স্ত্রীকে যে শ্লোক রচনা করিয়া শোনান তাহাতে উষ্ট্রশব্দ হইতে র-ফলাটা লোপ করিয়াছিলেন— শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ দুর্ঘটনা বর্তমান লেখকের দ্বারাও অনেক ঘটিয়াছে— অতএব, সমস্ত গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া আশা হইতেছে, কালিদাসের যেরূপ পরিণাম হইয়াছিল আমার পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে। ইতি শ্রীহঃ

এ গল্প যদি ছাপানো হয়, আমি বাপের বাড়ি চলিয়া যাইব। শ্রীমতী নিঃ

আমিও তৎক্ষণাৎ শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করিব। শ্রীহঃ

ফাল্গুন ১৩০৯

মাল্যদান

সকালবেলায় শীত-শীত ছিল। দুপুরবেলায় বাতাসটি অল্প একটু তাতিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যতীন যে বারান্দায় বসিয়া ছিল সেখান হইতে বাগানের এক কোণে এক দিকে একটি কাঁঠাল ও আর-এক দিকে একটি শিরীষগাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শূন্য মাঠ ফাল্গুনের রৌদ্রে ধুধু করিতেছিল। তাহারই এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে—সেই পথ বাহিয়া বোঝাই-খালাস গোরুর গাড়ি মন্দগমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে, গাড়োয়ান মাথায় গামছা ফেলিয়া অত্যন্ত বেকারভাবে গান গাহিতেছে।

এমন সময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "কী যতীন, পূর্ব-জন্মের কারও কথা ভাবিতেছ বুঝি?"

যতীন কহিল, "কেন পটল, আমি এমনিই কি হতভাগ্য যে, ভাবিতে হইলেই পূর্বজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়।"

আত্মীয়সমাজে 'পটল' নামে খ্যাত এই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, "আর মিথ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজন্মের সব খবরই তো রাখি, মশায়। ছি ছি, এত বয়স হইল তবু একটা সামান্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না! আমাদের ঐ-যে ধনা মালীটা, ওরও একটা বউ আছে—তার সঙ্গে দুই বেলা ঝগড়া করিয়া সে পাড়াসুদ্ধ লোককে জানাইয়া দেয় যে, বউ আছে বটে। আর তুমি যে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভাণ করিতেছ, যেন কার চাঁদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ, এ-সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝি না—ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মাত্র। দেখো যতীন, চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না। আমাদের ঐ ধনাটা তো কোনোদিন বিরহের ছুতা করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না; অতিবড়ো বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলায় নিড়ানি হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহার চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি, মশায়, সাত জন্ম বউয়ের মুখ দেখিলে না—কেবল হাঁসপাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া মুখস্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে, তুমি অমনতরো দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদগদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন। না, এ-সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভালো লাগে না। আমার গা জ্বালা করে।"

যতীন হাতজোড় করিয়া কহিল, "থাক্, থাক্, আর নয়। আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না। তোমাদের ধনা'ই ধন্য। উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেষ্টা করিব। আর কথা নয়, কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব তাহারই গলায় মালা দিব—ধিক্‌কার আমার আর সহ্য হইতেছে না।"

পটল। তবে এই কথা রহিল?

যতীন। হাঁ, রহিল।

পটল। তবে এসো।

যতীন। কোথায় যাইব।

পটল। এসোই-না।

যতীন। না না, একটা-কী দুষ্টুমি তোমার মাথায় আসিয়াছে। আমি এখন নড়িতেছি না।

পটল। আচ্ছা, তবে এইখানেই বোসো।— বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পরিচয় দেওয়া যাক। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিন মাত্র তারতম্য। পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড়ো বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খুড়তুত-জাঠতুত ভাইবোন। বরাবর একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে। 'দিদি' বলে না বলিয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খুড়ার কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিন্তু কোনো শাসনবিধির দ্বারা কোনো ফল পায় নাই— একটিমাত্র ছোটো ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘুচিল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল, প্রফুল্লতার রসে পরিপূর্ণ। তাহার কৌতুকহাস্য দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। শাশুড়ির কাছেও সে কোনোদিন গাম্ভীর্য অবলম্বন করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম তা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু, শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল— ওর ঐরকম। তার পরে এমন হইল যে, পটলের দুর্নিবার প্রফুল্লতার আঘাতে গুরুজনদের গাম্ভীর্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। পটল তাহার আশেপাশে কোনোখানে মন-ভার মুখ-ভার দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না— অজস্র গল্প-হাসি-ঠাট্টায় তাহার চারি দিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎশক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের স্বামী হরকুমারবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট— বেহার-অঞ্চল হইতে বদলি হইয়া কলিকাতায় আবকারি-বিভাগে স্থান পাইয়াছেন। প্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। আবকারি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাঁহাকে মফস্বলে ফিরিতে হইবে বলিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দুই-একজন আত্মীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ডাক্তারিতে নূতন-উত্তীর্ণ পসারপ্রতিপত্তিহীন যতীন বোনের নিমন্ত্রণে হপ্তাখানেকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথম দিন গাছপালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নির্জন বারান্দায় ফাল্গুনমধ্যাহ্নের রসালস্যে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময়ে পূর্বকথিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিয়া গেলে আবার খানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল— কাঠকুড়ানি মেয়ের প্রসঙ্গে ছেলেবেলাকার রূপকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় আবার পটলের হাসিমাখা কণ্ঠের কাকলিতে সে চমকিয়া উঠিল।

পটল আর-একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিয়া যতীনের সম্মুখে স্থাপন করিল; কহিল, "ও কুড়ানি!"

মেয়েটি কহিল, "কী, দিদি।"

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ্ দেখি।

মেয়েটি অসংকোচে যতীনকে দেখিতে লাগিল। পটল কহিল, "কেমন, ভালো দেখিতে না?"

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ, ভালো।"

যতীন লাল হইয়া চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "আঃ পটল, কী ছেলেমানুষি

করিতেছ।"

পটল। আমি ছেলেমানুষি করি, না তুমি বুড়োমানুষি কর! তোমার বুঝি বয়সের গাছপাথর নাই!

যতীন পলায়ন করিল। পটল তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল, "ও যতীন, তোমার ভয় নাই, তোমার ভয় নাই। এখনই তোমার মালা দিতে হইবে না— ফাল্গুন-চৈত্রে লগ্ন নাই— এখনও হাতে সময় আছে।"

পটল যাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে সেই মেয়েটি অবাক হইয়া রহিল। তাহার বয়স ষোলো হইবে, শরীর ছিপ্‌ছিপে— মুখশ্রী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মুখে এই একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষায় তাহাকে নির্বুদ্ধি বলা যাইতেও পারে, কিন্তু তাহা বোকামি নহে; তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অপরিস্ফুরণমাত্র, তাহাতে কুড়ানির মুখের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া বরঞ্চ একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় হরকুমারবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে দেখিয়া কহিলেন, "এই-যে, যতীন আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে। তোমাকে একটু ডাক্তারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মানুষ করিতেছি —পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছে একটি গাছতলায় পড়িয়া ছিল। যখন খবর পাইয়া গেলাম গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটির প্রাণটুকু আছে মাত্র। পটল তাহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না— তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, 'ও তো দ্বিজ; একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, উহার সাবেক জাত কোথায় ঘুচিয়া গেছে।' প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল; পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'খবরদার, আমাকে মা বলিস নে— আমাকে দিদি বলিস।' পটল বলে, 'অতবড়ো মেয়ে মা বলিলে নিজেকে বুড়ি বলিয়া মনে হইবে যে।' বোধ করি, সেই দুর্ভিক্ষের উপবাসে বা আর-কোনো কারণে উহার থাকিয়া থাকিয়া শূলবেদনার মতো হয়। ব্যাপারখানা কী, তোমাকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওরে তুল্‌সি, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন্‌ তো।"

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেণী পিঠের উপরে দুলাইয়া হরকুমার-বাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হরিণের মতো চোখদুটি দুজনের উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল।

যতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হরকুমার তাহাকে কহিলেন, "বৃথা সংকোচ করিতেছ, যতীন। উহাকে দেখিতে মস্ত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মতো উহার ভিতরে কেবল জল ছল্‌ছল্‌ করিতেছে— এখনও শাঁসের রেখামাত্র দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না— উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিয়ো না, ও বনের হরিণী।"

যতীন তাহার ডাক্তারি কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল— কুড়ানি কিছুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করিল না। যতীন কহিল, "শরীরযন্ত্রের কোনো বিকার তো বোঝা গেল না।"

পটল ফস্‌ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "হৃদয়যন্ত্রেরও কোনো বিকার ঘটে নাই। তার পরীক্ষা দেখিতে চাও?"

বলিয়া কুড়ানির কাছে গিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, "ও কুড়ানি,

আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?"

কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"

পটল কহিল, "আমার ভাইকে তুই বিয়ে করিবি?"

সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"

পটল এবং হরকুমারবাবু হাসিয়া উঠিলেন। কুড়ানি কৌতুকের মর্ম না বুঝিয়া তাঁহাদের অনুকরণে মুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীন লাল হইয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আঃ, পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ— ভারি অন্যায়। হরকুমারবাবু, আপনি পটলকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।"

হরকুমার কহিলেন, "নহিলে আমিও যে উহার কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু, যতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বলিয়াই অত ব্যস্ত হইতেছ। তুমি লজ্জা করিয়া কুড়ানিকে সুদ্ধ লজ্জা করিতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কৌতুক করিয়াছে— তুমি যদি মাঝের থেকে গাম্ভীর্য দেখাও তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসংগত ব্যাপার হইবে।"

পটল। ঐজন্যই তো যতীনের সঙ্গে আমার কোনোকালেই বনিল না, ছেলেবেলা থেকে কেবলই ঝগড়া চলিতেছে— ও বড়ো গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগড়া করাটা বুঝি এমনি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে— ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন—

পটল। ফের মিথ্যা কথা! তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সুখ নাই— আমি চেষ্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার মানিয়া যাই।

পটল। বড়ো কর্মই কর। গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খুশি হইতাম।

রাত্রে শোবার ঘরের জানলা-দরজা খুলিয়া দিয়া যতীন অনেক কথা ভাবিল। যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। এই নিদারুণ ব্যাপারে সে কতবড়ো হইয়া উঠিয়াছে— তাহাকে লইয়া কি কৌতুক করা যায়। বিধাতা দয়া করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন— এই আবরণ যদি উঠিয়া যায় তবে অদৃষ্টের রুদ্র-লীলার কী ভীষণ চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ মধ্যাহ্নে গাছের ফাঁক দিয়া যতীন যখন ফাল্গুনের আকাশ দেখিতেছিল, দূর হইতে কাঁঠালমুকুলের গন্ধ মৃদুতর হইয়া তাহার ঘ্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল, তখন তাহার মনটা মাধুর্যের কুহেলিকায় সমস্ত জগৎটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছিল : ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার হরিণের মতো চোখদুটি লইয়া সেই সোনালি কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে ; ফাল্গুনের এই কূজন-গুঞ্জন-মর্মরের পশ্চাতে যে সংসার ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখকঠিন দেহ লইয়া বিরাট মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, উদ্‌ঘাটিত যবনিকার শিল্পমাধুর্যের অন্তরালে সে দেখা দিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তাড়াতাড়ি যতীনকে ডাকিয়া পাঠাইল। যতীন আসিয়া দেখিল, কষ্টে কুড়ানির হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে,

শরীর আড়ষ্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া বোতলে করিয়া গরম জল আনিতে হুকুম করিল। পটল কহিল, "ভারি মস্ত ডাক্তার হইয়াছ, পায়ে একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দাও-না। দেখিতেছ না, পায়ের তেলো হিম হইয়া গেছে।"

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘষিয়া দিতে লাগিল। চিকিৎসা-ব্যাপারে রাত্রি অনেক হইল। হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারবার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। যতীন বুঝিল, সন্ধ্যাবেলায় কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে—ঘন ঘন কুড়ানির খবর লইবার তাৎপর্য তাই। যতীন কহিল, "হরকুমারবাবু ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন; তুমি যাও, পটল।"

পটল কহিল, "পরের দোহাই দিবে বই-কি। ছট্‌ফট্‌ কে করিতেছে তা বুঝিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচ। এ দিকে কথায় কথায় লজ্জায় মুখচোখ লাল হইয়া উঠে—তোমার পেটে যে এত ছিল তা কে বুঝিবে।"

যতীন। আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাকো। রক্ষা করো—তোমার মুখ বন্ধ হইলে বাঁচি। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম—হরকুমারবাবু বোধ হয় শান্তিতে আছেন, এরকম সুযোগ তাঁর সর্বদা ঘটে না।

কুড়ানি আরাম পাইয়া যখন চোখ খুলিল পটল কহিল, "তোর চোখ খোলাইবার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তোকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে—আজ তাই বুঝি এত দেরি করিলি। ছি ছি, ওঁর পায়ের ধুলা নে।"

কুড়ানি কর্তব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে যতীনের পায়ের ধুলা লইল। যতীন দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন হইতে যতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল। যতীন খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় কুড়ানি আসিয়া অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "থাক্‌ থাক্‌, কাজ নাই।" কুড়ানি এই নিষেধে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্‌বর্তী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—তাহার পরে আবার পুনশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। যতীন অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশে বলিয়া উঠিল, "পটল, তুমি যদি এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও তবে আমি খাইব না—আমি এই উঠিলাম।"

বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। যতীন বালিকার বুদ্ধিহীন মুখে তীব্র বেদনার রেখা দেখিতে পাইল; তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া সে পুনর্বার বসিয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লজ্জা পায় না, বেদনা বোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ চকিতের মধ্যে দেখিল, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে, এবং ব্যতিক্রম কখন হঠাৎ ঘটে আগে হইতে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যতীন বারান্দায় বসিয়া আছে, গাছপালার মধ্যে কোকিল অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে, আমের বোলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত—এমন সময় সে দেখিল, কুড়ানি চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া যেন একটু ইতস্তত করিতেছে। তাহার হরিণের মতো চক্ষে একটা সকরুণ ভয় ছিল—সে চা লইয়া গেলে যতীন বিরক্ত হইবে কি না, ইহা যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যতীন ব্যথিত হইয়া উঠিয়া

অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়। যতীন যেমনি পেয়ালা লইল অমনি দেখিল, বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবির্ভূত হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল ; ভাবটা এই যে, "কেমন ধরা পড়িয়াছ।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ডাক্তারি কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় ফুলের গন্ধে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে মনে কহিল, 'বড়োই বাড়াবাড়ি হইতেছে— পটলের এই নিষ্ঠুর আমোদে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না।'

কুড়ানিকে বলিল, "ছি ছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি বুঝিতে পার না!"

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি ত্রস্ত সংকুচিত ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। যতীন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "কুড়ানি, দেখি, তোমার মালা দেখি।" বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মুখে একটি আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল, অন্তরাল হইতে সেই মুহূর্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাস-ধ্বনি শুনা গেল।

পরদিন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল যতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে— "পালাইলাম। শ্রীযতীন।"

"ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল। তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!" বলিয়া কুড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকন্নার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা বুঝিতে কুড়ানির একটু সময় গেল। সে ছবির মতো দাঁড়াইয়া স্থির-দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে যতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খালি। তার পূর্বসন্ধ্যার উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিগ্ধসুন্দর ; রৌদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখার ভিতর দিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠবিড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা সুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর এই কোণটুকুতে, এই খানিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল ; তাহারই মাঝখানে ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারি দিকের সংগত কোনো অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা। কী হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা-কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন। যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল। জগতের এই সহজ-উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা-মৃগ-পক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে।

পটল ঘরকন্নার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, সে যতীনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুরা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে— শূন্য শয্যাটাকে যেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার বুকের ভিতরে যে-একটি সুধার পাত্র লুকানো ছিল সেইটে যেন শূন্যতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে—

ভূমিতলে পুঞ্জীভূত সেই স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী যেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে, "লও, লও, আমাকে লও। ওগো, আমাকে লও।"

পটল বিস্মিত হইয়া কহিল, "ও কী হইতেছে, কুড়ানি।"

কুড়ানি উঠিল না ; সে যেমন পড়িয়া ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। পটল কাছে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও পোড়ারমুখি, সর্বনাশ করিয়াছিস! মরিয়াছিস!"

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইয়া কহিল, "এ কী বিপদ ঘটিল। তুমি কী করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না।"

হরকুমার কহিল, "তোমাকে বারণ করা যে আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত।"

পটল। তুমি কেমন স্বামী। আমি যদি ভুল করি, তুমি আমাকে জোর করিয়া থামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ভূপাতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "লক্ষ্মী বোন আমার, তোর কী বলিবার আছে আমাকে খুলিয়া বল্।"

হায়, কুড়ানির এমন কী ভাষা আছে যে, আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে। সে একটি অনির্বচনীয় বেদনার উপর তাহার সমস্ত বুক দিয়া চাপিয়া পড়িয়া আছে—সে বেদনাটা কী, জগতে এমন আর কাহারও হয় কি না, তাহাকে লোকে কী বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছুই জানে না। সে কেবল কান্না দিয়া বলিতে পারে ; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোনো উপায় নাই।

পটল কহিল, "কুড়ানি, তোর দিদি বড়ো দুষ্টু ; কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনও মনেও করে নি। তার কথা কেহ কখনও বিশ্বাস করে না ; তুই এমন ভুল কেন করিলি। কুড়ানি, একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা ; তাকে মাপ কর্।"

কিন্তু কুড়ানির মন তখন বিমুখ হইয়া গিয়াছিল, সে কোনোমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না ; সে আরও জোর করিয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রহিল। সে ভালো করিয়া সমস্ত কথা না বুঝিয়াও একপ্রকার মূঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ করিয়াছিল। পটল তখন ধীরে ধীরে বাহুপাশ খুলিয়া লইয়া উঠিয়া গেল—এবং জানালার ধারে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের রৌদ্রচিক্কণ সুপারিগাছের পল্লবশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পরদিন কুড়ানির আর দেখা পাওয়া গেল না। পটল তাহাকে আদর করিয়া ভালো ভালো গহনা এবং কাপড় দিয়া সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল, নিজের সাজ সম্বন্ধে তাহার কোনো যত্ন ছিল না, কিন্তু সাজগোজের সমস্ত শখ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত। বহুকালসঞ্চিত সেই-সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লবঙ্গফুলটি পর্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাহার পটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে যেন গা

হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

হরকুমারবাবু কুড়ানির সন্ধানে পুলিসে খবর দিলেন। সেবারে প্লেগ-দমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই-সকল পলাতকদলের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া পুলিসের পক্ষে শক্ত হইল। হরকুমারবাবু দুই-চারিবার ভুল লোকের সন্ধানে অনেক দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

যতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার প্লেগ-হাঁসপাতালে ডাক্তারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাঁসপাতালে আসিয়া সে শুনিল, হাঁসপাতালের স্ত্রী-বিভাগে একটি নূতন রোগিণী আসিয়াছে। পুলিস তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

যতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। যতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিল। নাড়ীতে জ্বর অধিক নাই, কিন্তু দুর্বলতা অত্যন্ত। তখন পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে যতীন কুড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিয়াছিল। অব্যক্ত হৃদয়ভাবের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণচক্ষুদুটি কাজের অবকাশে যতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলই অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। আজ সেই রোগনিমীলিত চক্ষুর সুদীর্ঘ পল্লব কুড়ানির শীর্ণ কপোলের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে; দেখিবামাত্র যতীনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মতো সুকুমার করিয়া গড়িয়া দুর্ভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই-যে পেলব প্রাণটি ক্লিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া, ধরিল কোথায়। যতীনই-বা ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর-একটি সংকটের মতো কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল। রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস যতীনের বক্ষোদ্বারে আঘাত করিতে লাগিল— কিন্তু সেই আঘাতের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের তারে একটা সুখের মীড়ও বাজিয়া উঠিল। যে ভালোবাসা জগতে দুর্লভ, যতীন তাহা না চাহিতেই, ফাল্গুনের একটি মধ্যাহ্নে একটি পূর্ণবিকশিত মাধবীমঞ্জরির মতো অকস্মাৎ তার পায়ের কাছে আপনি আসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। যে ভালোবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে, পৃথিবীতে কোন্ লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদ্যলাভের অধিকারী।

যতীন কুড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল। যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সুদূর স্বপ্নের মতো যেন মনে করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। যতীন যখন তাহার কপালে হাত রাখিয়া একটুখানি নাড়া দিয়া কহিল "কুড়ানি" তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরটুকু হঠাৎ ভাঙিয়া গেল— যতীনকে সে চিনিল এবং তখনই তাহার চোখের উপরে বাষ্পকোমল আর-একটি মোহের আবরণ

পড়িল। প্রথম-মেঘ-সমাগমে সুগম্ভীর আষাঢ়ের আকাশের মতো কুড়ানির কালো চোখদুটির উপর একটি যেন সুদূরব্যাপী সজলস্নিগ্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

যতীন সকরুণ যত্নের সহিত কহিল, "কুড়ানি, এই দুধটুকু শেষ করিয়া ফেলো।"

কুড়ানি একটু উঠিয়া বসিয়া পেয়ালার উপর হইতে যতীনের মুখে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই দুধটুকু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল।

হাঁসপাতালের ডাক্তার একটিমাত্র রোগীর পাশে সমস্ত ক্ষণ বসিয়া থাকিলে কাজও চলে না, দেখিতেও ভালো হয় না। অন্যত্র কর্তব্য সারিবার জন্য যতীন যখন উঠিল তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখদুটি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যতীন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "আমি আবার এখনই আসিব, কুড়ানি, তোমার কোনো ভয় নাই।"

যতীন কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইল যে, এই নূতন-আনীত রোগিণীর প্লেগ হয় নাই, সে না খাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অন্য প্লেগরোগীর সঙ্গে থাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ ঘটিতে পারে।

বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতীন কুড়ানিকে অন্যত্র লইয়া যাইবার অনুমতি লাভ করিল এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল। পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিয়া দিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রোগী এবং চিকিৎসক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না। শিয়রের কাছে রঙিন কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন-ল্যাম্প্‌ ছায়াচ্ছন্ন মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, ব্র্যাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিক্‌টিক্‌ শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।

যতীন কুড়ানির কপালে হাত দিয়া কহিল, "তুমি কেমন বোধ করিতেছ, কুড়ানি।"

কুড়ানি তাহার কোনো উত্তর না করিয়া যতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিয়া রাখিয়া দিল।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভালো বোধ হইতেছে?"

কুড়ানি একটুখানি চোখ বুজিয়া কহিল, "হাঁ।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গলায় এটা কী কুড়ানি।"

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিল। যতীন দেখিল, সে একগাছি শুকনো বকুলের মালা। তখন তাহার মনে পড়িল, সে মালাটা কী। ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দের মধ্যে যতীন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কুড়ানির এই প্রথম লুকাইবার চেষ্টা, নিজের হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াস। কুড়ানি মৃগশিশু ছিল, সে কখন হৃদয়ভারাতুর যুবতী নারী হইয়া উঠিল। কোন্‌ রৌদ্রের আলোকে, কোন্‌ রৌদ্রের উত্তাপে তাহার বুদ্ধির উপরকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

রাত্রি দুটা-আড়াইটার সময় যতীন চৌকিতে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, পটল এবং হরকুমারবাবু এক বড়ো ব্যাগ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরকুমার কহিলেন, "তোমার চিঠি পাইয়া কাল সকালে আসিব বলিয়া বিছানায়

শুইলাম। অর্ধেক রাত্রে পটল কহিল, 'ওগো, কাল সকালে গেলে কুড়ানিকে দেখিতে পাইব না— আমাকে এখনই যাইতে হইবে।' পটলকে কিছুতেই বুঝাইয়া রাখা গেল না— তখনই একটা গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।"

পটল হরকুমারকে কহিল, "চলো, তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চলো।"

হরকুমার ঈষৎ আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, তাঁহার নিদ্রা যাইতেও দেরি হইল না।

পটল ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আশা আছে?"

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া তাহার নাড়ী দেখিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, আশা নাই।

পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া যতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল, "যতীন, সত্য বলো, তুমি কি কুড়ানিকে ভালোবাস না।"

যতীন পটলকে কোনো উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "কুড়ানি, কুড়ানি।"

কুড়ানি চোখ মেলিয়া মুখে একটি শান্ত মধুর হাসির আভাসমাত্র আনিয়া কহিল, "কী, দাদাবাবু।"

যতীন কহিল, "কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও।"

কুড়ানি অনিমেষ অবুঝ চোখে যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন কহিল, "তোমার মালা আমাকে দিবে না?"

যতীনের এই আদরের প্রশ্রয়টুকু পাইয়া কুড়ানির মনে পূর্বকৃত অনাদরের একটু-খানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল, "কী হবে, দাদাবাবু।"

যতীন দুই হাতে তাহার হাত লইয়া কহিল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, কুড়ানি।"

শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য কুড়ানি স্তব্ধ রহিল; তাহার পরে তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল। যতীন বিছানার পাশে নামিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল, কুড়ানির হাতের কাছে মাথা নত করিয়া রাখিল। কুড়ানি গলা হইতে মালা খুলিয়া যতীনের গলায় পরাইয়া দিল।

তখন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, "কুড়ানি।"

কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, "কী, দিদি।"

পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আমার উপর তোর আর কোনো রাগ নাই, বোন?"

কুড়ানি স্নিগ্ধকোমল দৃষ্টিতে কহিল, "না দিদি।"

পটল কহিল, "যতীন, একবার তুমি ও ঘরে যাও।"

যতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ খুলিয়া কুড়ানির সমস্ত কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল। রোগিণীকে অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া একখানি লাল বেনারসি শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল। পরে একে একে এক-একগাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে দুই বালা পরাইয়া দিল। তার পরে ডাকিল, "যতীন।"

যতীন আসিতেই তাহাকে বিছানায় বসাইয়া পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়া

সোনার হার দিল। যতীন সেই হারছড়াটি লইয়া আস্তে আস্তে কুড়ানির মাথা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল।

ভোরের আলো যখন কুড়ানির মুখের উপর আসিয়া পড়িল তখন সে আলো সে আর দেখিল না। তাহার অম্লান মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইল, সে মরে নাই— কিন্তু সে যেন একটি অতলস্পর্শ সুখস্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেছে।

যখন মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় হইল তখন পটল কুড়ানির বুকের উপরে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বোন, তোর ভাগ্য ভালো। জীবনের চেয়ে তোর মরণ সুখের।"

যতীন কুড়ানির সেই শান্তস্নিগ্ধ মৃত্যুচ্ছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, যাঁহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।'

চৈত্র ১৩০৯